রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

সাবিত্রী।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

অর্থাৎ

বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে
পঠিত-প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে
পুরস্কার-প্রাপ্ত নারী-রচনা।

সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পিপেল্‌স লাইব্রেরী,
৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

আশ্বিন, ১২৯৩ সাল।

কলিকাতা, ৭৮, কলেজ ষ্ট্রীট
পিপেল্‌স্ প্রেসে
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত
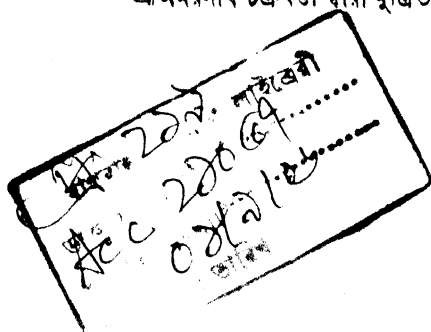
শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৩	জনন্নাথ	জগন্নাথ
"	৪	জানে	জানেন
"	২৫	আরাজক	অরাজক
"	২৭	স্থষ্টি	স্থষ্ট
৯	১৪	কৃষ্টচন্দ্র	কৃষ্ণচন্দ্র
১৯	৪	বীরাঙ্গণা	বীরাঙ্গনা
৩৩	১৬	করা একের	করা। একের
৪৬	১৪	তাহাদিগের	তাঁহাদিগের
৯০	২১	করিতেও	করিতে
১০৭	২৭	শেল্টদিগের	কেল্টদিগের
১২৪	৮	স্বকার	স্বীকার
১২৬	১	আমারে	আমাদের
"	২২	ধনবাদ	ধন্যবাদ
১৩০	৭	দর্শনের	দংশনের
১৩২	৩	ভাল-বাসো	ভালবাসো
১৪৩	১৩	ভাষাইয়া	ভাসাইয়া
১৫৩	৩	ষোলা	ষোলো
১৫৪	২৮	ived	revived

১৩৮	১০	পালনীয়া	পালনীয়
"	১৫	দেয়াযায়	দেখা যায়
"	১৬	বলা বাইতে পারে	বলা যাইতে পারে
১৮০	৬	দেইাইয়া	দেখাইয়া
"	১০	বন্দ	বন্ধ
১৮৩	১৭	আয়ত্তি	আয়ত্ত
১৮৬	১৫	স্বজাতিয়	স্বজাতীয়
১৯৬	২২	ইংরেজ-স্বামসীতে	ইংরেজ-স্বামী স্ত্রীতে
২০৫	৯	পুনর্ব্বিাহ	পুনর্ব্বিবাহ
২১২	২৭	আগ	আগত
২১৯	২৫	চরিত্ররে	চরিত্রের
২২২	৬	যুবকগণ	যুবকগণকে
"	৯	তাদের	তাহাদের
২২৮	১০	ভাবান্তরিত	ভাষান্তরিত
২৩৮	২৮	শস্ত্রানুশীলন	শাস্ত্রানুশীলন
২৪৪	২২	কোটোয়ুর্দ্ধ	কোটোর্দ্ধ
২৫২	৯	পরমেশ্বরাধনায়	পরমেশ্বরারাধনায়

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যাপতির পদাবলী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রায় দশ বৎসরকাল রবীন্দ্র বাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দ্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইতি-পূর্ব্বে মুদ্রিত কয়েকটী সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন, শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে—এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে—রবীন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর, মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।

১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

পিপেল্‌স্‌ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

ভারতকুসুম।

বিখ্যাত "কবিতাহার"-রচয়িত্রী-প্রণীত। ভারতী, সাধারণী, Indian Nation, Indian Mirror প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক ও সংবাদপত্রে বিশেষ রূপে প্রশংসিত। মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র। পিপেল্‌স্ লাইব্রেরী, ক্যানিং লাইব্রেরী, এবং ১, নং অক্রুর দত্তের গলি "বী" প্রেসে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য জগতে সুপরিচিত 'কল্পনার' সম্পাদক প্রণীত, বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে উৎকৃষ্টরূপে সমালোচিত, নিম্ন লিখিত উপন্যাসগুলি ও নাটকখানি পিপেল্‌স্ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

প্রায়শ্চিত্ত	(তৃতীয় সংস্করণ)	...	৶৹
দুটিভাই	(তৃতীয় সংস্করণ)	...	।৹
কুলীন কাহিনী	(উপন্যাস)	...	৶৹
সুহাসিনী	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	...	১৲
পাঞ্চালীবরণ	(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	...	৸৹

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত

প্রদীপ।

গীতিকবিতাবলী—মূল্য আট আনা।

কনকাঞ্জলি।

গীতিকাব্য—মূল্য আট আনা।

বাঙ্গালীর গৌরব—হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের লেখনীর তেজ, যে কারণেই হউক, দিন দিন নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। এ সময়ে যে কয়েক জন কবি বাঙ্গালা কবিতার সম্মান রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী। রবীন্দ্র বাবু গীতি কাব্যেই বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আর গীতিকাব্যে পারদর্শিতা দেখাইতেছেন—কনকাঞ্জলি-প্রণেতা, এই অক্ষয় বাবু। পুস্তক খানি মধুর ভাণ্ডার—কবিতার খনি।

নব্যভারত।

আমরা যতদূর শুনিতে পাই, আর যত দূর জানিতে পারি, তাহাতে ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে, এই হতভাগা বাঙ্গালির একটী বিষয়ে বিলক্ষণ গৌরব করিবার আছে। করুণ প্রীতি রসের গীতিকাব্যে, বোধ হয় বাঙ্গালি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জয়দেব বিদ্যাপতি হইতে হরু ঠাকুর, রাম বসু পর্য্যন্ত বাঙ্গালার একতান ছিল। এখনও সে তান থামে নাই। মধুসূদন বা হেমচন্দ্র অন্য তানে যতই কোন আলাপচারী করুন না, তবু বাঙ্গালির চিরপ্রচলিত তান ভুলিতে পারেন নাই। অলব্ধনামা অনেক কবিই এই তানে আপনারা মোহিত হইয়া আছেন এবং বঙ্গবাসীকে মোহিত করিয়াছেন। এই সকল কবিতা আবেশময়, মধুরতাময়, কোমল প্রাণে কোমল ধ্বনি করে; এবং কোমল-হৃদয় বাঙ্গালিকে মোহিত করে, মাতাইতে পারে না।

আমরা প্রদীপের শেষ কবিতাটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম; ইহাতেই গ্রন্থকারের বিষদ ভাষা, সরল গাঁথনি, মনের আবেগ এবং অন্তরের ইচ্ছা পাঠক সমীপে প্রকাশিত হইবে।

সাধারণী।

অনেক দিন পরে কবির মধুর সঙ্গীত আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, অনেক দিন পরে কবিতা পড়িয়া আমাদের প্রাণ তৃপ্ত হইল।

অনেকেই কবিতা লেখেন বটে, কিন্তু কি করিয়া কবিতার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন না—তাই তাঁহাদের শুষ্ক নির্জীব কবিতা পাঠকদিগের প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে না; অক্ষয়কুমার বড়াল কবিতার জীবন-সঞ্চারী সেই কৌশলটি জানিয়াছেন তাই তিনি কবি। তাঁহার কাব্য দুই খানি সাধারণ লয় তানে বাঁধা নহে, কবির প্রাণের সুরে বাঁধা, তাই পাঠকেরা ইহাতে মুগ্ধ। কিন্তু কেবল স্বর ভাল হইলেই যেমন গান ভাল হয় না, গানের রচনা ভাল হওয়া চাই, মূর্ত্তি জীবন্ত হইলেই যেমন চিত্র ভাল হয় না, তাহা সুন্দর হওয়া চাই, যেমন তেমন করিয়া অসাজন্ত অমানস্ত ভাবে কতকগুলা ভাব একত্র জড় করিলেও কবিতা হয় না, ভাবগুলি সুন্দর ছবির আকারে পরিস্ফুট করিয়া তোলা চাই। কবি হইতে গেলে চিত্রকরও হইতে হইবে। লেখক ভাবের চিত্রকর তাই ইনি কবি, ইহার অধিকাংশ কবিতাই ভাবের এক একটি ছবি।

এই ছবি আঁকিতে লেখকের যে আকুলি ব্যাকুলি, কবির মনের ভাব ভাষায় প্রকাশের যে আকুলতা, তাহাই এই কবিতার কবিত্ব, কবি ভাষায় যাহা না ফুটাইতে পারিয়াছেন, এই অকুলতায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কনকাঞ্জলিতে এই আকুলতা ফুলের সৌরভের ন্যায় অতি স্নিগ্ধ, বসন্তের বাতাসের মত ইহা পাঠকদিগকে উল্লসিত করিয়া চলিয়া যায়; প্রদীপের 'প্রেম গীত' 'পুনর্ম্মিলনে' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির যে আকুলতা তাহা মধুর অথচ জলন্ত, কোমল অথচ তেজোময়, পাঠকের হৃদয়ে ইহার ঝাঁজ যেন অনেকক্ষণ লাগিয়া থাকে।

ভারতী।

কনকাঞ্জলি—বাস্তবিকই কনক-অঞ্জলি। ইহাকে কি বলিব? ইহা মূর্ত্তিমান স্বপ্ন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য-জগতে কনকাঞ্জলি অথবা ইহার ভাবুক রচয়িতার কতদূর আদর জানি না। আদর হউক বা না হউক, আমরা পুস্তক পাঠ করিয়া মুগ্ধ। কবি কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পাখায় চাপিয়া ভাব-আকাশের প্রতি তারকায় প্রকৃতির নিভৃত সৌন্দর্য্য পাঠ করিয়াছেন। ইহা এক নূতন—নূতন জগৎ।

কনকাঞ্জলির কবি সৌন্দর্য্যের কবি। সৌন্দর্য্য তাঁহার একমাত্র উপাসনা। সৌন্দর্য্যের জন্য কবি পাগল। বাস্তবিক, কনকাঞ্জলির অক্ষরে অক্ষরে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত। বাঙ্গালায় এমন জিনিস আর নাই। ইহা পড়িয়া এক নূতন আনন্দ অনুভব করিলাম। এ পুস্তক যখনই পড়ি, তখনই আর সমস্ত কাজ ভুলিয়া যাই। ইহাতে কবির প্রাণের পরিচয় পাই! কবি ইহাতে তাঁহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন।

গীতি-কবিতার প্রথম গুণ, পদ-লালিত্য বা শব্দ-বিন্যাস-চাতুরী। সেই পদ-লালিত্যেই কনকাঞ্জলি প্রথমে মন কাড়িয়া লয়। তার পর যত পুস্তকের

মধ্যে প্রবেশ করি, ততই ইহার কবিত্বে—কল্পনায়—ভাবুকতায় এবং মৌলিকতায় আশ্চর্য্য বোধ করি। কবির ভাবোদ্রেক করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। নবীন কবির ইহা এক অসাধারণ গুণ। যখন আমরা অক্ষয়কুমারের কবিতা পড়ি তখন সেই বাসন্তী পৌর্ণমাসী-রজনীর সুশীতল সুমধুর কাননের জাগ্রত নিস্তব্ধতার রাজ্যে বসিয়া প্রেমিক হৃদয়ের কি-এক অজ্ঞাত নিশ্বাসের নীরব কবিতা-কথা মনে পড়ে।

কল্পনা।

অক্ষয় বাবুর সমস্ত কবিতাই গম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ, প্রতি পংক্তিতে কবির গাঢ় ভাবুকতা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজি ভাষায় বাইরণ শেলী যে ফুলের বনে গিয়া মালা গাঁথিয়াছেন, অক্ষয় বাবুও সে বনের রসজ্ঞ মালী, ইনিও বেশ বাছিয়া বাছিয়া ফুলগুলি তুলিয়াছেন ফুলগুলি তুলিয়া লোকের বেশ পছন্দমত মালায় বসাইয়াছেন। প্রদীপ ইহাঁর প্রথম উদ্যম, এই কুঁড়িতেই প্রকাশ পাইতেছে—যে কবির কবিত্বে ফুলবন পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহার সৌরভে আকাশ পর্য্যন্ত মাতিয়া উঠিবে, কালে কবি কাব্যজগতে উচ্চাসন লাভ করিবেন। মনুষ্যের রুচি ভিন্ন ভিন্ন সত্য, কিন্তু এ কাব্যখানি পাঠ করিয়া সকলেই সুখী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সোমপ্রকাশ।

আমরা হৃদয়ানুভূত আনন্দের সহিত এই গীতিকাব্যখানি পাঠ করিয়াছি। অনেক দিন হইল এরূপ প্রকৃত কবির লেখা পাঠ করার সুখ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। অক্ষয় বাবুর হৃদয়ে আবেগ আছে, কল্পনায় লীলা আছে, কবিত্বে সজীবতা আছে; তাই তাঁহার কবিতা পড়িতে বসিলে, কেমন একটা অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রিত স্বপ্ন যেন প্রাণে ভাসিয়া বেড়ায়। এই গীতিকাব্যখানির পরিচয় দিতে বসিয়াও যে, আমরা ইহার কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম না, তাহার কারণ এই যে, পাঠকবর্গকে আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পড়িতে অনুরোধ করি।

বঙ্গবাসী।

কনকাঞ্জলির সকল কবিতাই আমাদের সুন্দর লাগিয়াছে। অক্ষয় বাবু হৃদয়ের কবি, প্রকৃতির কবি এবং ভাষারও কবি।

সহচর।

অক্ষয় বাবুর কবিতা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রদীপে প্রকৃত কবিত্ব আছে—অক্ষয় বাবু কালে একজন প্রকৃত যশস্বী কবি হইবেন, প্রদীপে আমরা তাহার স্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি।

সঞ্জীবনী।

বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজে গ্রন্থকার নিতান্ত অপরিচিত নহেন। তাঁহা প্রদীপ অনেকের আদরের বস্তু হইয়াছে। কনকাঞ্জলির অনেক স্থলে প্রকৃ কবিত্ব আছে।

ভারতবাসী।

পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে। রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে। অনে নূতন ভাবের সন্নিবেশ দেখিলাম।

সময়।

ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ক কতকগুলি কবিতা আছে। কবিতাগুলি সরস ও মধুর হইয়াছে। স্বভাব বর্ণনাদিও পরিপাটী।

বামাবোধিনী।

ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অনেকগুলি কবিতা আছে। সকলগুলি সরস ও সুললিত হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট।

Of great merit, of a singularly graceful and elegan character.

THE INDIAN NATION.

"... Babu Burral may practice do something good in t poetical line."

Reis & Rayyet

Our readers know B. Akshaya Kumar Burral very favo ably as the author of a poetical work entilled *Prodip*, whi was noticed in this *Review* sometime ago. Babu A. K's ne poem fully sustains the reputation he has already acquired as writer of genuine lyrics in Bengali. In the pieces composin this volume, the sentiment principally described, or given ex pression to, is love in some form or other, and we are glad t be able to say that in none of the forms in which it enters in these poems does the sentiment appear unattractive or impure.

Babu A. K. possesses the true poetic vien and his wor contains much true poetry.

We feel proud of him as a young Bengali poet. His merit are already too well known and appreciated to require laudatio from us.

Calcutta Review.

ভূমিকা।

আমাদের বহুকালের সঙ্কল্প আজ কার্য্যে পরিণত হইল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর উৎসব উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধগুলি একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং গৌরবের কথা—আমাদের দ্বারা দেশের আর একটী হিতানুষ্ঠান হইতে চলিল, আজ আমরা আর একটী কীর্ত্তি স্থাপিত করিতে পারিলাম। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব দেশীয় সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ শিক্ষিতগণ বড়ই আদরের এবং আনন্দের অনুষ্ঠান মনে করেন। সকলেই জানেন, ইহার অধিবেশনে বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হয়। সকলেই জানেন, যাঁহাদিগকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবন-স্বরূপ বলিতে পারা যায়, এ সভায় সেই সকল জ্ঞানী, বহুদর্শী, চিন্তাশীল মহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই কারণে যে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব এইখানে উত্থাপিত হয়, সমস্ত বঙ্গদেশে সেই সব কথা বিশেষরূপে আন্দোলিত ও আলোচিত হইয়া থাকে।

সকল দেশে জাতীয় ভাষার সাহায্যেই জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে। ঘরের দোষ বুঝাইতে হইলে নিজের ভাষা ভিন্ন পরের ভাষাতে কি তাহা বুঝান যায়? যাহাতে সমস্ত জাতির মাতৃভাষায় অনুরাগ জন্মে, যাহাতে সকলেই বিশেষরূপে মাতৃভাষার অনুশীলন করেন, সেই উদ্দেশ্যে আমরা বিনাব্যয়ে সমস্ত দেশীয় পুস্তক পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছি। গুরুতর অভাবগুলির কথা জাতীয় ভাষায় আন্দোলন করাইতেছি। এবং আমাদের প[illegible] জীবনগঠনের ভার যাঁহাদের উপর নির্ভর করে সেই নারীজাতির প্র[illegible] শি[illegible] জন্যই প্রধানতঃ এই লাইব্রেরী স্থাপিত করিয়াছি, এবং প্রবন্ধ-রচনার জন্য কয়েকবার পারিতোষিক দিয়াছি।

প্রবন্ধগুলি কিরূপভাবে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইল, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। প্রত্যেক প্রবন্ধ বক্তৃতাকার হইতে পাঠ্যাকারে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

"উনবিংশ শতাব্দির বাঙ্গালা সাহিত্য" যে বৎসরে লিখিত হয়, তাহার পর এই কয় বৎসরের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত লেখক জন্মিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লেখক ও কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। ইঁহাদের পুস্তক-সমালোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। এবং বক্তৃতাকালে বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রধান নাটককার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু ও প্রথম শ্রেণীর কবি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর বিষয়ে উল্লেখ করিতে ভুল হওয়ায় এবারে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। আর, এই প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক সময়ে বঙ্গদর্শনের ডানহস্ত ছিলেন; ইহার লেখকগণের প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি যে নিজ প্রশংসায় বিরত হইয়াছেন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা যখন প্রবন্ধ পঠিত হয়, তখন ইহার নাম ছিল, "হিন্দুবিবাহ-প্রণালী"। কিন্তু, বিবাহপ্রণালী অপেক্ষা হিন্দু-পত্নী কি জিনিষ লেখক এ প্রবন্ধে তাহাই বুঝাইয়াছেন বলিয়া নামটি "হিন্দুপত্নী" করিয়া দিয়াছেন। "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য" প্রবন্ধটি লাইব্রেরীর কোনও অধিবেশনে পঠিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুপত্নী কি, তাহা সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য" প্রবন্ধ পাঠ করা আবশ্যক বলিয়া এই পুস্তকে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "সোণায় সোহাগা" নামক প্রবন্ধটি 'সোণার কাটি রূপার কাটি" প্রবন্ধের মূল কথার ব্যাখ্যা বলিয়া সেটিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে কৃত প্রবন্ধটির ও নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রবন্ধে তিনি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়ের আলোচনা করেন নাই; হিন্দুরীতিনীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ কি না তাহাই বিচার করিয়াছেন, এবং তদনুযায়ী নামও দেওয়া হইল। অন্যান্য পরিবর্ত্তন

ব্যতীত সভাস্থলে প্রধান প্রধান প্রতিবাদকারীদের প্রতিবাদের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উত্তরও ইহাতে প্রকাশিত হইল।

সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে, স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহ দিবার জন্য এবং তাঁহাদের চিন্তাশক্তি কতদূর জন্মিয়াছে জানিবার জন্য তিনটি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রতিবারেই বিভিন্ন লেখিকা সত্বেও ঢাকা নিবাসিনী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর রচনা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং তিনিই আমাদের প্রতিশ্রুত ২৫৲ করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়গণ প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা-ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।

পরিশেষে লেখকগণ ও লেখিকার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। তাঁহারা অতিশয় আনন্দের সহিত স্ব স্ব প্রবন্ধ এই পুস্তকে প্রকাশ করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহাদের অনুগ্রহ আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহারাই আমাদের গৌরবের, আমাদের কীর্ত্তির মূল।

কলিকাতা,
১৮, অক্রূর দত্তের গলি,
বহুবাজার।

প্রকাশকস্য।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

সাবিত্রী।

বাঙ্গালা সাহিত্য। *

(বর্ত্তমান শতাব্দীর।)

ইদানীং ইংরেজদিগের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে নিঃশব্দে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নূতন ধর্ম্মপ্রচার নাই, বলপ্রকাশ নাই, অথচ আমাদের মন ক্রমশঃ ফিরিয়া আর একরূপ হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র চলিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালায় সেই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এতদূর আর কোথাও হয় নাই। এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরেজি শিক্ষা, ইহার ফল—সমাজ-উন্নতি ও সাহিত্য-উৎপত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যেও বাঙ্গালার সমাজ অধিক উন্নত ও সাহিত্য-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আজি সেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাহিত্য আমাদের উপপাদ্য প্রস্তাব। বঙ্গীয় সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়, কিরূপে এই বিপ্লব ঘটিয়াছে. কিরূপে লোকের মন পূর্ব্বপথ হইতে ঘুরিয়া নূতন পথে দাঁড়াইয়াছে তাহা লিখিতে হয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল নেতার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্ত ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর ইতিহাস লিখিতে হয়, এবং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে সমাজে কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু তাহার সময় নাই। তবে যতদূর পারা যায় চেষ্টা করিব।

১৭৯৯ সালের শেষ দিন অতীত হইল। ১৮০০ সালের প্রথম দিন উপস্থিত। ভারতবর্ষের এমন অদিন বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। ভারতের কোথাও সুখ নাই, কোথাও শান্তি নাই, সর্ব্বত্র লুঠতরাজ, মারামারি,

* ৩০শে চৈত্র সন ১২৮৭ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

লাঠালাঠি, কাহাকেও বিশ্বাস নাই, যাহার গায়ে জোর সেই অন্যের উপর অবিবাদে অত্যাচার করিয়া যায়। সমস্ত দেশে রাজা নাই। যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা লুঠেড়ার সর্দ্দার। পরধন অপহরণ, পরপীড়ন, পরের প্রাণনাশ, তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। এই সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কিরূপ অবস্থা, হইয়াছিল তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

কাবুলের দুরাণীবংশ পতনোন্মুখ, সেখানে দুরাণী ও বেরুকজীদিগের পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মিতেছে, দুরাণীদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের অংশ, সকলে সুতরাং গোলযোগ চলিতেছে। ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর, পেশোর প্রভৃতি প্রদেশে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছে। পঞ্জাবে মুসলমান ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তথায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন শীখরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে; এই রাজগণ পরস্পরের উপর আপন প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটিতে ব্যতিব্যস্ত। সিন্ধুতে আমীরদিগের রাজ্য এখনও দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, সেখানেও মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ। সরহিন্দ প্রদেশে একজন ইংরেজ এই ঘোরতর অত্যাচারের সময় আপনার নামে এক রাজ্য করিয়া লইয়াছেন, এবং মুসলমানের ন্যায় বহুসংখ্যক মুসলমান উপপত্নীতে পরিবৃত হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছেন। রাজপুতগণের আর সে প্রতাপ নাই; যে প্রতাপে তাঁহারা একদিন সমবেত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সে প্রতাপ নাই; হিংসা দ্বেষ তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সিন্ধিয়া, হোলকার, যখন ইচ্ছা তাঁহাদের দেশ লুঠ করিতেছে ও যখন ইচ্ছা তাহাদের নিকট হইতে অগাধ টাকা লইতেছে। দিল্লীর বাদশাহের নামের মোহিনী আছে, সম্ভ্রম আছে; কিন্তু বাদশাহ নিজে বন্দী, শত্রুরা তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছে। তাঁহার দিনের অন্ন কে যোগায়—তাহারও ঠিক নাই। পেরোঁ নামক সিন্ধিয়ার একজন ফরাসিস সেনাপতি হিন্দুস্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারও শমরুর মত কিছু নিজ উদ্দেশ্য আছে কি না কে বলিতে পারে? অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড একজন নবাবের করতলগত কিন্তু তাহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি নিজ প্রাসাদে উপপত্নীপরিবৃত হইয়া

বাস করেন ; সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাসাদসম্মুখস্থ লাল বারদোয়ারী নামক অভিষেক স্থানও বিদ্রোহীদিগের করকবলিত থাকে, তাঁহার রাজ্য অপেক্ষা অরাজকতা শত গুণে শ্রেয়ঃ। তাঁহার রাজ্যে ওমরাগণ, করদরাজাগণ, জায়গীরদার ও তালুকদারগণ যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে ; বিনা যুদ্ধে কেহই খাজানা দেয় না। প্রতিবারই কর আদায়ের সময় আসিলে ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। অনেক টাকা না দিলে সে সাহায্যও প্রায় পাওয়া যায় না। ইংরেজেরা আরও কিছু অধিক আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে রাজ-উপাধি দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মধ্য-ভারতবর্ষে বুন্দেলখণ্ডে ক্ষুদ্র রাজগণ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহারও দক্ষিণে গোন্দয়ানায় বড় বড় ডাকাইতের দল তৈয়ারি হইতেছে। ইহারা এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ উলট পালট করিয়া দিবে। সিন্ধিয়া ও হোলকার বড় শান্তিপ্রিয় নহেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি নাই, করদলার যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা জয়ী ও যাঁহারা জিত হন, উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। নিজাম হারিয়া অবধি হৃদয়মধ্যে ইংরেজ ও মারহাট্টা-দিগের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষকে লালন পালন করিতেছেন। মারহাট্টারা করদলা হইতে সেই যে আপন আপন ভবনে গিয়াছে, তার পর আর একত্র হয় নাই, উহারা যে যাহার আপন আপন রাজ্যবৃদ্ধি ও শত্রুনিপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। মারহাট্টাদিগের মধ্যে বড় রাজা আছেন সত্য, কিন্তু শ্রীজিরাও যেখানকার ওমরাহগণের অগ্রগণ্য ও সর্ব্বময়কর্ত্তা, উন্মত্ত যশোবন্তরায় যেখানকার শাসনকর্ত্তা, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অবিমৃষ্যকারী বাজীরাও যেখানকার পেশোয়া, সে রাজ্যে কি সুখ সম্ভব ? সেখানে কি শান্তি থাকিতে পারে ? সেখানে কি লোকের সাহিত্যানুরাগ থাকিতে পারে ? মহারাষ্ট্র রাজ্যের দক্ষিণে ইংরেজরাজত্ব সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটীসরাজত্বের প্রথম অংশে যেরূপ সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই ; তাহাতে আবার যখন টীপু তৃতীয়বার হারিয়া মরিয়া হইয়াছিলেন, তখন তিনি যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মহীসুরে গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়া দেন, বিনাপরাধে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ করেন। দক্ষিণে অন্যান্য স্থানে ইংরেজদিগের প্রভুত্ব

ছিল সত্য, কিন্তু মান্দ্রাজে যে সকল ইংরেজ কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা দেশীয় জঘন্য রাজাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কর্ণাটের নবাবের দেনা লইয়া যে জঘন্য কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া ইংরেজ নাম কলঙ্কিত করা আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যে হিমালয় প্রদেশে, যে উত্তরাখণ্ডে, কখন মুসলমান যাইতে পারে নাই, গোর্খাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষায়, রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছায় সেখানেও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, পাহাড়মধ্যেও অরাজক। গ্রামবাসীরা লুঠের ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর।

এরূপ অরাজক সময়ে যখন কালি কি হইবে কেহই বলিতে পারে না, যখন পরের উপর অত্যাচারই রীতি ; যখন কাহার প্রাণ, মান, ধন, রক্ষা হয় না, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে পারে এরূপ ক্ষমতাশালী একজনও লোক সমস্ত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া মিলে না, তখন কি সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে? তখন কি লোকের চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে? যখন ভয়েই লোকে অভিভূত, তখন কে লেখাপড়া শিখিবে, কে লিখিতে বসিবে? বাস্তবিক তৎকালে ভারতবর্ষে সাহিত্যলোপ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন বাঙ্গলা সাহিত্যের কথায় ভারতবর্ষের কথা কেন তুলিলেন? বাঙ্গালায় ত তখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ত তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিউপভোগ করিতেছিল। এটী লোকের মহাভ্রম, ভারতবর্ষে এরূপ দারুণ গোলযোগ থাকিলে বাঙ্গালির মনে শান্তি সম্ভবিতে পারে না ; বিশেষ বাঙ্গালা সমাজে তখনও শান্তি হয় নাই। প্রথম ইংরেজ রাজত্ব যে স্থায়ী হইবে তাহাতে কাহারও বিশ্বাস হয় নাই, তাহার পর আমরা যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি তখন বাঙ্গালা বলিলে ইহা বুঝাইত না। বাঙ্গালার গবর্ণরের কর্তৃত্ব উড়িষ্যায় ছিল না। উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র-করকবলিত ছিল। উড়িষ্যায় করদ ও মিত্ররাজগণ নিরন্তর মেদিনীপুর অঞ্চলে লুঠপাঠ করিত। বীরভূম, বরাহভূম, সবেমাত্র ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছে। আসাম, কাছার তখনও ইংরেজদিগের নয়। অতি অল্প পরেই মানেরা (ব্রহ্মদেশীয়গণ) অরাজক আসাম দখল করিয়া

বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ভূটান শত শত বৎসর ধরিয়া নিরন্তর অরাজকতায় ভুগিতেছিল। ভূটানে স্থবেদারেরা, তংশো পেন্‌লো, পেরো পেনলো, প্রভৃতি সকলে আপন আপন ধর্ম্মরাজা ও দেবরাজা খাড়া করিয়া আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিত। সময়ে সময়ে তাহাদের যুদ্ধ গড়াইয়া রংপুর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িত। যদিও কেহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতেই আসে নাই তথাপি বাঙ্গালার সীমা প্রদেশে শান্তি সুখ একেবারে ছিল না। আর বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অরাজকতা নৃত্য করিত। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে বাঙ্গালা শ্মশানকালীর রঙ্গভূমি হইয়াছিল। যখন নবাব ও ইংরাজ উভয়ে মিলিয়া শাসন করিতেন, রণদুর্ম্মদ ইংরেজগণ কাহা-কেও মানিত না; তাহারা না করিয়াছে এমন কার্য্যই নাই। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, ক্ষমতা, কিছুতেই তাহাদের মন বিচলিত করিতে পারিত না। এই সময় যেমন ছিল, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল। ইংরাজেরা তিন চারিবৎসর থাকিয়া অনেক ধনসঞ্চয় করতঃ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন। আর তাঁহাদের বাঙ্গালি প্রিয়পাত্রগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় স্বজাতীয়-গণের মুণ্ডপাত করিয়া বড় লোক হইয়া উঠিতেন। ৫৬ হইতে ৯৩ পর্য্যন্ত যাহা ছিল, ৯৩ সালে তাহার চূড়ান্ত হইয়া গেল। দেশের যা কিছু ছিল কর্ণওয়ালিশপ্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীতে তাহাও গেল। বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বে তিন শক্তি ছিল, এই তিন শক্তির মূল তিন; মুসলমান গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় জমীদার, ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত। এই ৩৭ বৎসরে মুসলমান গবর্ণমেণ্টের ত শেষই হইয়াছিল। নবাব বহুলক্ষ টাকা পেন্সন পাইয়া উপপত্নীগণে বেষ্টিত হইয়া নিজ প্রাসাদে বাস করিতেন ও যতদূর তাঁহার সম্পর্কের গন্ধ থাকিত ততদূর দূষিত বায়ু চরিত্রদোষরূপ সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি করিয়া দিত। বড় বড় জমীদারগণ সাহেবের শোষণে অবসন্ন হইয়া আসিয়া-ছিলেন। মীরকাসিম অনেকগুলির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছিলেন। ইজারা বন্দোবস্তে অনেকগুলির উচ্ছেদ হয়। দেশের লোক যাহাদিগকে আপনাদের কর্ত্তা বলিয়া বহুকাল আদর ও ভক্তি, মান্য ও ভয় করিয়া আসিতেছিল, যাহারা প্রথম স্বাধীন, পরে মিত্র, তাহার পর করদ, শেষ অধীন রাজ্য ছিল, তাহাদিগের এইরূপ পরিণাম হইতে লাগিল। তার পর

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল, ইহার সঙ্গত নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নহে। ইহার আসল নাম চির অস্থায়ী বন্দোবস্ত, কারণ ইহাতে কেহই বলিতে পারেন না যে আমার জমীদারী স্থায়ী হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদার-গোষ্ঠীর শেষ হইল। বড় বড় রাজপরিবার ঠিক সময়ে টাকা দিতে না পারায় জমীদারীচ্যুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর, চাঁচড়া প্রভৃতি প্রদেশের জমীদারদিগের সম্পত্তি হুহুস্বরে নিলাম হইতে লাগিল। কিনিল কে? মাজিষ্ট্রেটের প্রিয়মুহুরী—জাতিতে নাপিত, Foreign Department এর নায়েব—জাতিতে সদ্গোপ, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী গোমস্তা ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও ক্রেতার সংখ্যা অধিক নহে। জমীদারের কর্ম্মচারীরাই এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ, তাঁহারা প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতেন। দূরস্থ জমীদার তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার পর জমীদারী খাজনার দায়ে নীলামে উঠাইয়া দিয়া আপনি ক্রয় করিয়া লইতেন। একস্থানে এমন হইয়াছে যে জমীদারের খাজানা লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ নৌকা ডুবি রটাইয়া দিয়া সেই টাকায় গোমস্তা আপনি জমীদারী কিনিয়া লইলেন। একস্থানে একজন ডাকাইতের সর্দার গবর্ণমেণ্টের খাজানা লুঠ করিয়া নগদ টাকার জোরে জমীদার হইলেন। অনেক স্থলে লাঠির জোরে জমীদার হইতে লাগিল। একজনের লাঠির জোর থাকিলে দশ পনর ক্রোশের মধ্যে কাহারও রক্ষা থাকিত না। যাহারা সাহিত্যসংসারের উন্নতি করিত, যাহারা পণ্ডিত প্রতিপালন করিত, যাহাদের কল্যাণে আমরা অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহাদের এই দশা হইল। যাঁহারা তাহাদের স্থান প্রাপ্ত হইলেন তাঁহারা আর একসম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন, তাঁহারা গুরু পুরোহিতের একান্ত ভক্ত হইতে লাগিলেন। শাস্ত্র কচকচি তাঁহাদের চক্ষুঃশূল।

মুসলমান গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার ভিন্ন বাঙ্গালার আর এক শক্তি ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এই অরাজকের সময়, ঘোরতর অত্যাচারের সময়, ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সময় যদি কেহ দেশের জন্য যথার্থ ভাবিত তবে সে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ। এই সময়ে তাঁহাদের দ্বারা যে কত উপকার হইয়াছে,

তাহা বর্ণনাতীত। অত্যাচারী ইংরাজগণও ধাৰ্ম্মিক ইষ্টনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে আদর করিত, লোকে তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের হিন্দুসমাজের আর্য্যজাতির চূড়া বলিয়া জানিত। তাঁহারা আজিকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় লোভী ক্ষমতাপ্রত্যাশী ও স্বার্থপর ছিলেন না। ধৰ্ম্মবলে তাঁহারা বলীয়ান্ ছিলেন. তাঁহাদের সাহস ও অকুতোভয় ছিল। তাঁহাদের এই সাহসের সূক্ষ্ম হেতুও ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই ৬০। ৭০ জন ছাত্র থাকিত। ছাত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ ও গুরুকার্য্যে আত্মসমর্পণেও কৃতসংকল্প। এই সময়ের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গোঁসাই ভট্টাচার্য্য "বলরামশ্চ শঙ্করঃ" মাণিক তর্কভূষণ প্রভৃতি লোকের নাম কাহার অবিদিত আছে? তাঁহারা এই গোলযোগের সময় ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, অধ্যাপক ও সময়ে সময়ে সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কত কত পরিবারকে যে তাঁহারা কত উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন, তাহায় ইয়ত্তা নাই। যে সকল ইংরেজ যথার্থ বিচার করিতে চাহিতেন, এই ভট্টাচার্য্যগণ যে তাঁহাদের কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি তাঁহাদের ব্যবসায় নহে। তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্য ব্যবসায়ী ছিলেন না। বিশেষ তাঁহাদের উপর এত কার্য্যভার পড়িয়াছিল যে তাঁহারা সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা থাকিলেও করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই কি পরিণাম হইল। ১৭৯৩ শালে হুকুম হইল, আইন হইল, যে ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। আবার ১৮২৮ ও ১৮৩৩ অব্দে বাজেয়াপ্ত আইন পুনরায় বিধিবদ্ধ হইল। তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইল। যে ব্রাহ্মণকুল নির্ব্বিবাদে স্বাধীন উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহাদের তেজে সাহসে ও নির্ভীকতায় অত্যাচারী সিরাজউদ্দৌলাও কাঁপিতেন, তাঁহারা এই অবধি বড়মানুষের আশ্রিত হইতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বড়মানুষের সভাশোভাবিধান করিতে লাগিলেন, ক্রমে এক্ষণে তোষামোদ ভট্টাচার্য্যদিগের ব্যবসায়ের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে, তাহাও এইরূপ ব্রহ্মোত্তরভোগীদিগের লিখিত, সুতরাং আর নূতন ব্রহ্মোত্তর হইবে না এবং অনেক পুরাতন ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইবে। আইন করায় বঙ্গীয় বিদ্যা ও বঙ্গীয়

সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে বহুদিন পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্যদিগের প্রাধান্য ছিল সত্য; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সে প্রাধান্য অধিক দিন থাকিবে না। জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননাদির পর যে সকল পণ্ডিত হইয়াছিলেন সকলেই জানে যে, তাঁহারা উক্ত মহাত্মাদিগের অপেক্ষায় অনেক অংশে নিকৃষ্ট; তাহার পর আরও নিকৃষ্ট, তাহার পর আরও নিকৃষ্ট, শেষ এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের ভূমিকায় খ্যাতনামা ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিলেন, যে, ভট্টাচার্য্যগণ চারি পাঁচখানি ব্যতীত পুস্তক পড়েন না, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতিমহাশয় বলেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ন্যায় শাস্ত্রের ৬৪ ভাগের একভাগমাত্র পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৯ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভট্টাচার্য্যাদিগের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার উচ্ছেদ হইতে লাগিল।

যে তিনশক্তিতে বঙ্গসমাজ চলিত, তিনেরই ধ্বংস হইতে লাগিল, অথচ নূতন সমাজ গঠিত হইল না। সাহিত্য একেবারে রহিল না; ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রাম প্রসাদ সেন এই সময়ে পরলোক গমন করেন, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদ ও তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হন। ৬৫ হইতে ৭২রের মধ্যেই প্রাচীন কবিগণ গত হন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করে এমন লোক একেবারে হইল না, যে দুই একজন রহিলেন, তাঁহাদেরও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকাশ হইল না। তাঁহারা অতি নীচশ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ করিতে লাগিলেন মাত্র। আপনারা কি নিধুবাবু, রামবসু প্রভৃতিকে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন? ইহাদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার অনেক উপাসক আজিও আছেন,তাঁহার নাম হরুঠাকুর, ইনি কবির দল সৃষ্টি করেন; কবির দল স্থায়ী কার্য্য কিছুই করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তৎকালীন হঠাৎ অবতার জমীদার ও বাবুদিগকে প্রীত করিবার জন্য উপস্থিতমত গান বাঁধিতেন, তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ঘোর অত্যাচার আরাজক ও বিশৃঙ্খলার সময় তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশ না হইয়া ঐরূপেই বাহিত হইয়া ছিল। কীর্ত্তন বাঙ্গালায় সৃষ্টি, বাঙ্গালির গৌরবের ধন, কিন্তু কীর্ত্তনরচয়িতা উনবিংশশতাব্দীর প্রথমে কেহই জীবিত ছিলেন না।

আমি অনেকক্ষণ আপনাদিগকে ভূমিকা লইয়া কষ্ট দিয়াছি; বোধ হয় আপনারা আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হইবে যে, প্রাচীন বঙ্গসমাজ ভাঙ্গিয়া গেল, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিদ্যা লোপ হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইল, এই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। কিন্তু সে সাহিত্য কে করিল? সে সূত্রপাত কে করিল? বঙ্গবাসী এইবার তোমার বড়ই লজ্জার কথা। বিদেশীয়দিগের উৎসাহে বিদেশীয়দিগের উপকারার্থ বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। সিবিলিয়ানদিগের শিক্ষার জন্য সিবিলিয়ানদিগের উপকারার্থ লর্ড ওয়েলস্লি দ্বারা বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল, তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেষ্টর ও কেরী। আর একজন—তিনি জাতিতে উড়িয়া, তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। উড়ে ও সাহেবে বাঙ্গালায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জার কথা এই যে, যে দুই একজন বাঙ্গালি এই সময় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুস্তক কদর্য্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্ররায়চরিত্র ও প্রতাপাদিত্যচরিত্র বাঙ্গালির লেখা। দুইখানিই অপাঠ্য।

এইরূপে বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সূত্রপাত হইল, সাহেবেরা নিজজাতিস্বভাবসুলভ অধ্যবসায় সহকারে বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালায় সাহিত্যের উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব রহিল। ১৮০১ অব্দ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কোনও গ্রন্থ লিখিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, যেরূপ শান্তিস্থাপন হইলে সাহিত্য উৎপত্তি হইতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও সেরূপ শান্তি রহিল না। যেরূপ অবস্থা হইলে লোকে কতকটা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর এমন স্থান রহিল না। বাঙ্গালায় অনেক রাজধানী ছিল, বিদ্যাশিক্ষার অনেক স্থান ছিল; ক্রমে সমস্ত আসিয়া কলিকাতায় মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতে সমস্ত বঙ্গদেশের লোক উঠিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, গঙ্গার দুই ধার ক্রমে সভ্যলোকে পূর্ণ হইতে লাগিল; বর্দ্ধমান, যশোহর, ফরিদপুর,

নদীয়া প্রভৃতি জেলার কত কত পরিবার যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গা-তীরস্থ স্থানে বাস করিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে এই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানেই সাহিত্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। এই স্থানে লোকে সর্ব্বদা ইংরেজদিগের সংসর্গে আসিত, সর্ব্বদা নানাদেশীয় লোকের সংসর্গে আসিত, তাহাদের ভাব সকল আত্মসাৎ করিত, ক্রমে এই সকল দেশে সভ্যতার আবির্ভাব হইতে লাগিল; ক্রমে ব্রিটিস-দিগের প্রতাপও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, আমরা এই সময়ের নাম Transition Period বা পরিবর্ত্তন সময় বলিব। যেদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন, সেই দিন হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল, এই পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তন সময়ের যে যে দোষ গুণ তাহা আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; এখন আর ঠিক পরিবর্ত্তনসময় নহে, এখন একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইংরেজেরা এই জন্য অধুনাতন সময়কে ইয়ং বেঙ্গলের সময় বলেন, আমরাও সংক্ষেপে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলি।

পরিবর্ত্তনসময়ে বহুসংখ্যক মহাক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেশে যাহাতে জ্ঞানজ্যোতিঃ, ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রকাশ হয়, যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হয়, যাহাতে সমাজ নূতন পথে নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে, তাহাই করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গুরুতর কার্য্যে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনসময়ে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইলেও লেখাপড়ার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালা ও ইংরেজি এই উভয় ভাষায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়, যে সকল মহাত্মা এই সময় আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া যান, তাঁহাদের জনকয়েকের নাম না করিয়া, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের নাম করিতে সকল বাঙ্গালিরই মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হওয়া উচিত। তাঁহারা আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতারূপ করলাভের বিলক্ষণ উপযুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, ইনি ইংরেজি ও বাঙ্গালায় শত শত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথমস্থাপনকর্ত্তা, ইনি সর্ব্বপ্রথম সমাজসংস্কারক, ইনি সর্ব্বপ্রথম ইয়ং বেঙ্গল, ইঁহার ক্ষমতা অপার, ইঁহার বিদ্যা অগাধ, ইঁহার মত দেশহিতৈষী তৎকালে আর কেহ ছিল না। ইনি, সমাজ যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন, সমাজ যে পথে যাইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, এবং প্রাণপণে সর্ব্বপ্রযত্নে সমাজকে সেই পথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইনি সর্ব্বপ্রথম উৎকৃষ্ট বাঙ্গালিলেখক, ইঁহা হইতে বাঙ্গালা গদ্য, বাঙ্গালির অভ্যস্থ হইতে আরম্ভ হয়। পদ্য ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে, ইনিই সর্ব্বপ্রথম লোককে বুঝাইয়া দেন।

দ্বিতীয়, গৌরিশঙ্কর—নৈহাটিস্থ ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর ছাত্র এবং বাঙ্গালায় রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙ্গালা গদ্যের একজন শিক্ষাগুরু, রামমোহন রায়ের—তাঁহার মতের এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের—ঘোরতর বিদ্বেষী, এবং হিন্দুসমাজের মহামান্য অগ্রণী। প্রথম নাই হউক, তখনকার একখানি প্রধান বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত, তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান সম্বাদপত্রের সম্পাদক, নানা রসপরিপূর্ণ কবিতালেখায় চমৎকারশক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু ইঁহার আর এক গুণ ছিল, লেখকবর্গের সে গুণ প্রায় থাকে না; এ জন্য লেখকদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কীর্ত্তিও প্রায় লোপ হয়। ইনি অল্পবয়স্ক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ভদ্রসন্তানগণকে লেখা শিখাইতে যত যত্ন করিতেন, এত বোধ হয়, কখন কোন কালে কোন লেখক করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অধিক কি বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না।

তাহার পর রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদিগের দেশের আজিকার সমাজের নেষ্টর। পরিবর্ত্তন সময়ের মূর্ত্তিমান ইতিহাস। এই প্রাচীন বয়সেও ইঁহার যেরূপ ক্ষমতা, আর কয়জনের তাহা আছে? ইনি যাহাতে ইংরেজিভাব দেশীয়লোকের মনে প্রবেশ করে, তাহার জন্য যে কত চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহার সঙ্কলিত, রচিত ও অনুবাদিত গ্রন্থাবলী একত্রিত করিলে একটি পুস্তকালয় হয়, ইঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম একখানি Cyclopedia; বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইংরেজিশিক্ষার উন্নতি ইঁহার জীবনের

মন্ত্র। ইনি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগের সহায়, উৎসাহদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ্।

তাহার পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ইঁহার "বিবিধার্থসংগ্রহ" বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বপ্রথম সাময়িকপত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে ইনি নিজে দক্ষাগ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরণেকুলার লিটরেচর সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু ইনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরেজি লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন, এত বড় লোক বাঙ্গালার লেখক হইলে বাঙ্গালার যে উপকার হইত তাহা হইল না, এ জন্য আমরা দুঃখিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা আর কোন একজন লোক বা একটি সোসাইটি দ্বারা হয় নাই।

পরিবর্ত্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক; ইঁহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা; যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না সেই সময়ে নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাঁটি বাঙ্গালায় কতদূর ভাব-প্রকাশক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার "নবনারী" আজিও বাঙ্গালা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।

টেকচাঁদ ঠাকুর। ইনি কে আমি জানি না, জানিবার বুঝি উপায়ও নাই; কিন্তু ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়া যে কত উপকারলাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পরিবর্ত্তন সময়ের ইনিও এক জন প্রধান লেখক ও সংস্কারক। ইঁহার সম্বন্ধে মহামতি বীমস্ বলিয়াছেন, "He has had many imitators and certainly stands very high as a novelist; his story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language for wit, spirit and clever touches of nature."

হুতোমপেঁচাও এই পরিবর্ত্তন সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমীয় ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।

ইঁহাদের পর সংস্কৃতকালেজের দল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর, বহুসংখ্যক উত্তম নাটকের প্রণেতা, অনুবাদক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি বহুসংখ্যক লেখক এই সময়ে সংস্কৃতকলেজ হইতে বহির্গত হন। ইঁহারা ইংরেজিভাব বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেন না। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা বাঙ্গালীকে উপহার দিতেন। ইঁহাদের কত লোকের নাম করিব? সকলেই পূজ্যপাদ, সকলেরই নিকট বাঙ্গালা নানাকারণে বাধ্য। ইঁহারাই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে ও সিংহ মহোদয়কে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। বাঙ্গালি পাঠককে অগাধ রত্নরাশির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের দলের সর্ব্বাগ্রণী এমন কি পরিবর্ত্তন সময়ের প্রধাননেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এখনও করা হয় নাই। ইনি একা একশত, ইনি যে বাঙ্গালিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গবর্ণমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালিকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইয়াছেন, ইঁহার কথামালা ও চরিতাবলীর ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্ব্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন। তাহার পর ইঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা, ইঁহার স্বভাবনির্ভীকতা, স্বাধীনভাব, দেশীয় সমস্ত যুবকবৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত। ইঁহার সীতার বনবাসের ন্যায় প্রকাণ্ড কাব্য আজিও বাঙ্গালা ভাষায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনেকে বলেন যে সীতার বনবাস মৌলিক গ্রন্থ নহে; কিন্তু মৌলিক হউক, আর নাই হউক, অনুবাদ ত নয়। তাঁহার বিধবাবিবাহবিচারের ন্যায় বিচারগ্রন্থ বাঙ্গালায় ত আর নাই। অন্য ভাষায়ও এরূপ গ্রন্থ ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করে।

পরিবর্ত্তন সময়ের লোকে যে, শুদ্ধ নিজে নিজে সকল কার্য্য করিতেন এমত নহে, তাঁহাদের সমবেত কার্য্যও ছিল। এই সমবেত কার্য্যের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রধান। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধের জন্য তত্ত্ববোধিনী নামক পত্রিকা প্রচারিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন,

ও দেশের বহুবিধ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা তখন এখনকার মত একটীমাত্র সভার কাগজ হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাঙ্গালায় ইয়ুরোপীয়ভাব প্রচারের মিসনরি ছিল, উহা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা তত্ত্ববোধিনীর আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। বাঙ্গালির ছেলেদের মধ্যে ইংরেজীভাব প্রবেশ করান সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমারদত্ত দ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালির সর্ব্বপ্রথম নীতিশিক্ষক; তাঁহার চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞলোকেও পাঠ করিয়া নীত্যাদিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বালকেরা এই সকল গ্রন্থ পাঠে কতদূর উপকৃত হয়, তাহা বলা যায় না।

এই সময় কবিওয়ালারা, যাত্রাওয়ালারা বিশেষ পাঁচালীওয়ালা দাশরথী রায়, বাঙ্গালাভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন সময়ের প্রধান প্রধান নেতৃগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও মহৎ, ইংরেজীভাব বাঙ্গালিকে বুঝান; ইংরেজীভাব বাঙ্গালির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করান। একালের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই কার্য্যে এত খেপিয়াছিলেন যে, একজন অতি সুশিক্ষিত যুবক—তাঁহার নাম আমার স্মরণ নাই, তিনি স্কুলের মাষ্টার ছিলেন, এবং ইংরেজি বিদ্যায় বৃহস্পতি ছিলেন—রাস্তায় চলিবার সময় মুটে, মজুর, মুদী, ভদ্রলোক, যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, "গোরু খাবি," "গোরু খাবি?" তাহারা গালাগালি দিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "ওরা ত খাবেনা জানিই, তবে রোজ রোজ শুনিতে শুনিতে শেষ idea টা আর অত shocking হইবে না।" এইরূপে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ ইউরোপীয় ভাব সকল দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিতেন। পরিবর্ত্তনসময়ের লোক আজিও অনেকে জীবিত আছেন, তাঁহারা যদি সেকালের লোকের মনের কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা তাঁহারা অনেক অধিক বলিতে পারিবেন।

তবে স্থূলতঃ পরিবর্ত্তন সময়ের কাজ এইগুলি:—ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, হিন্দুকালেজের ছাত্রগণকর্ত্তৃক ইংরেজী ভাবের প্রচার, ও সংস্কৃত কালে-

জের ছাত্রগণকর্তৃক সংস্কৃতঅনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন পথে চালান, বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ ও উন্নতি, বাঙ্গালা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তি। এখন দেখা যাউক, এই সকলের ফল কি হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে; পরিবর্ত্তন সময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময়, বড় বড় চিন্তাশীলগণের সময়, আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে, তাঁহাদেরই উচ্চকামনার ফলে। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবর্ত্তনসাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্ত্তন কি আর কখন হইয়াছিল, তাঁহারা যে সমাজ, যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এমন কি আর কখন হইবে? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এত কি আর কখন কোন দেশে কোন কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল? অদ্যকার যুবকগণ এই পরিবর্ত্তন সময়ের দরুণ যত উপকার পাইয়াছেন, এত কি কোন দেশে কোন কালে কোন যুবকদল পাইয়াছেন? এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ইউরোপে একবার হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সহিত তুলনা করিলে সে অতি সামান্য। যখন ১৪৫৪ সালে রণদুর্ম্মদ ওসমান্আলি মহম্মদ নূতন রোম দখল করিয়া কাইসারের উত্তরাধিকারিগণকে সাম্রাজ্যচ্যুত করিল, সেণ্ট সফির গির্জ্জাকে মসজীদ করিল, সেই সময়ে যখন নূতন রোমের পণ্ডিতবৃন্দ বিনিস-সাগরপারস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট নিজের বিদ্যা লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন একবার এইরূপ পরিবর্ত্তন ইউরোপে ঘটিয়াছিল, এইরূপ নূতনভাবে লোকে উন্মত্ত হইয়াছিল, লোকের মনে এইরূপ একটা ভীষণ গোলমাল হইয়াছিল, এইরূপ উৎসাহের সহিত লোকে নূতন বিদ্যা শিখিতে এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের এ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। তখন শুদ্ধ গ্রীকদিগের সাহিত্য পুনঃপ্রচার হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এখন বাঙ্গালায় কি হইয়াছে একবার দেখ দেখি! প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙ্গালির সম্মুখে আপনাদের গুপ্তভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। এখনকার ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে তখনকার গ্রীক সাহিত্য তুচ্ছ পদার্থ, তাহার উপর আবার সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রচার আছে, বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনরুদ্ধার

আছে। দেখ দেখি একবার কত অগাধ ভাণ্ডারের আমরা একেবারে অধিকারী হইয়াছি। এত সম্পদ কাহার ভাগ্যে ঘটে? একদেশে আর একদেশের সাহিত্য প্রচারে মহাবিপ্লব ঘটে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ফ্রান্সে গিয়া গতশতাব্দীতে এত কাণ্ড করাইয়াছে, আর আজি আমাদের দেশে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জর্ম্মনির, ইতালির, প্রাচীন হিন্দুদের ও প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সাহিত্য উপস্থিত। আমরা এক এক সময়ে এই অগাধ সাহিত্যরাশি চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। এই সকল সাহিত্যের সকল পুস্তক ভাল করিয়া পড়া অসম্ভব। অতএব প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের যদি চারি পাঁচ খানি করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা "মাষ্টার পিস" পড়ি, তাহা লইলে দশবৎসর কাটিয়া যায়। বাস্তবিক এত সাহিত্যও কখন একেবারে কোন অন্ধতমসাচ্ছন্ন দেশে উপস্থিত হয় নাই, আর এই সাহিত্য লইয়া স্বায়ত্ত করিতে পারে, ইয়ংবেঙ্গল ভিন্ন এমন জাতিও আর কখন হয় নাই। আর এই সকল নানাদেশীয় ভাব এক করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার বিষয়ে ইয়ংবেঙ্গলের যত সুবিধা, বোধ হয় আর কোন দেশের লোকের কখন এত হয় নাই। প্রধান সুবিধা, সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপিত আছে, কোথাও কোন গোলযোগ নাই, প্রাণ ও ধন সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমীদারের অত্যাচার নাই, কুসংস্কারাপন্ন গুরু পুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই। স্বাধীন দেশে, দেশশাসন, শান্তিরক্ষা, বিচার কার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকায় কত কত মহাপ্রতিভাশালী লোকের প্রতিভাবিকাশ হইতে পারে না। বাঙ্গালির অদৃষ্টে এ সকল কার্য্যের জন্য ইংরেজ আছেন। বাঙ্গালি ইচ্ছা করিলে নির্ব্বিবাদে নিরাপদে দেশের, সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিকশক্তি ব্যয় করিতে পারেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইংরেজী বিদ্যালয় হইয়াছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশমাত্র সভ্য ছিল। এই প্রদেশে মাত্র নূতন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই স্থানে মাত্র সাহিত্যের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল। এক্ষণে সে সভ্যতা, সে নূতন সমাজ, সে সাহিত্য সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে। অতি নিভৃত জঙ্গল মধ্যে নূতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, বাঙ্গালি ইয়ংবেঙ্গল এমন সুবিধার কি কার্য্য করিতেছেন।

তাঁহারা নূতন সাহিত্যগঠনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নূতন চিন্তাস্রোতঃ কতদূর চলিয়াছে, আর যাহা হইয়াছে তাহা হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে।

আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্ব্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। তিলোত্তমা ১৮৬০ সালে প্রচার হয়, তাহার পর বিশবৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে। এই কুড়ি বৎসরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। এই সাহিত্যের যেরূপ বৃদ্ধি, যেরূপ দ্রুত উন্নতি তাহাতে ইহার পরিণাম সম্বন্ধে অসীম উন্নতি আমাদিগের স্থির-নিশ্চয়। আমাদিগের এই বাল সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার ও ইহার ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে নানারূপ আশা করিবার বিশেষ কারণও আছে। এটি শুদ্ধ আমার নিজের কথা নহে, অন্ধবিশ্বাস নহে, বৃথা আশা নহে, যখন আটবৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তখন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার সময় হইয়াছে। তাহার আটবৎসর পরে কতই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা সেই সাহিত্যের আরও গর্ব্ব করিব আশ্চর্য্য কি? ভারতীয় আর্য্যভাষা সমূহের ঔপমিত ব্যাকরণকার মহামতি বীমস্ সাহেব দশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনান্তে বলিয়াছেন—"That the Bengalis possess the power, as well as, the will to establish a national literature of very sound and good character cannot be denied." আরও পুষ্পাঞ্জলিপ্রণেতা চিন্তাশীল, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ফল কথা সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইঁহাদিগেরই দেশে পূর্ব্বপিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

এই কয়বৎসর মধ্যে কত নূতন পুস্তক হইয়াছে, কত নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং এই সকল পুস্তক ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইতেছে, পরিবর্ত্তনে ক্রমেই দেশের অধিক মঙ্গল হইতেছে।

আমার বোধ হয় সকলে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের নিকট ধীরতা ভিক্ষা করি, আমি নিম্নে অনেক কথা ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি, যাঁহারা এই দশ বৎসর মধ্যে নানা সংস্কৃত ও ইংরেজি পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কথা বলিতে পারিব না। যাঁহারা নানাবিধ স্কুলবুক লিখিয়া তরলমতি বালকবৃন্দের মনে নানাবিধ ভাবের উদ্রেক করিতেছেন, তাঁহাদের কথা কিছু বলিতে পারিব না। যাঁহারা ইংরেজি বিজ্ঞান অনুবাদ করিয়া দেশের মহতী শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের কথাও বলিতে পারিব না। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা নূতন মত আবিষ্কার করিয়া, অনুবাদ করিয়া ও প্রচার করিয়া দেশীয়দিগকে নানাপ্রকার হিতকর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরনিরপেক্ষ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে পারিব না। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যে সকল মহোদয়গণ বঙ্গীয় সম্বাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদের নামও করিতে পারিব না। কিন্তু যেমন শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজার পূর্ব্বে "আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ" "ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যঃ" ফুলচন্দন দেওয়া হয়, সেইরূপ তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বক্তব্য বিষয়ে অবতীর্ণ হইব। এরূপ সংক্ষেপ করিবার আরও একটি কারণ আছে; আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও বিশেষরূপে অবগত নহি। অতএব তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার নিজ বক্তব্যপথে গমন করি।

আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইঁহার জীবনে ও ইঁহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গ, নরক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সব দেখাইয়াছেন; উন্মত্তকল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন, ইঁহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া

গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার তিলোত্তমা কি কাব্য, না মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য, না হয় বলি উহা উন্মাদের কাব্য? তাঁহার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অত্যুৎকৃষ্ট নাটক, তাঁহার বীরাঙ্গণা গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়, তাঁহার বীরাঙ্গণা বীরাঙ্গণাগণের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ দেশান্তরাহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগের কয়েকটিকে একত্র করিয়াছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ তিনি সমস্ত কাব্য সবে দুইবৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন, আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে, কতই যে তাঁহার অকালমৃত্যুহেতু বিকাশ পায় নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার জীবন শোকান্তমহাকাব্য. তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহমধ্যে মহামান্য হয়।

মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইজন কবি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। মাইকেল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও জীবিত আছেন। হেমচন্দ্র গীতিমালায় দেশীয় লোকের মধ্যে প্রথম উচ্চতর ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার কবিতাবলী অতুল্য পদার্থ; উহাতে সত্য সত্যই মন গলাইয়া কবির অভিলষিত পথে চালাইয়া দেয়। তাঁহার বৃত্রসংহার স্বদেশহিতৈষিতায় পরিপূর্ণ। তিনি মাইকেলের শিষ্য, বৃত্রসংহারে মাইকেল তাঁহার আদর্শস্থল। মাইকেলের মেঘনাদ অপেক্ষা তাঁহার বৃত্রসংহার কোন কোন অংশে নিকৃষ্ট হইলেও উহা বঙ্গবাসীর অধিকতর আদরের জিনিস; উহাতে মাইকেলের উদ্দামকল্পনা না থাকিলেও উহার আদ্যন্ত একভাবে সুন্দররূপে গ্রন্থিত। হেমচন্দ্রের বৃত্র ও কবিতাবলী বহুকাল বাঙ্গালার প্রধান পুস্তক মধ্যে গণ্য থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালা

ভাষা থাকিবে, ততদিন উহাদের মার নাই। হেমচন্দ্র ইংরেজি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যগুলির অনুকরণ বাঙ্গালায় করিতে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, বোধ হয় অনেক স্থলে তিনি কাব্যগুণে তাঁহার আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার গঙ্গার উৎপত্তি উদ্দাম অথচ সুগঠিত প্রতিভার সুন্দর বিকাশ।

মাইকেলের সমসাময়িক দ্বিতীয় কবি রঙ্গলাল, ইঁহার পদ্মিনী উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ। উহাতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুমহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ পবিত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার মোহিনীশক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইনি বহুকালাবধি পদ্যাদি আর লিখেন না; কিন্তু ইঁহার কবিত্বশক্তির ও কাব্যলিখনক্ষমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। ৩।৪ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে ইনি নীতিকুসুমাঞ্জলিনামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার মত পরিষ্কার, ইংরেজিতে যাহাকে smart বলে, তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার, টিকল অথচ সম্যক্ সম্পূর্ণ।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন বহুসংখ্যক কবিতা লিখিয়াছেন, ইঁহার পলাশীর যুদ্ধ বীররসপূর্ণ কবিতামালায় পরিপূর্ণ। তাঁহার রাণী ভবানীর চরিত্র আমাদিগের হৃদয়প্রস্তরে চির-অঙ্কিত থাকিবে।

ইঁহাদের পর দীনবন্ধু, ইনি ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্র। ঈশ্বরগুপ্তের হাতের তৈয়ারি। ইঁহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত আর কাহার উপর পারেন নাই। সমাজচিত্র অঙ্কনে ইনি অদ্বিতীয়, ইঁহার সধবার একাদশী ও জামাইবারিক সমাজের উৎকৃষ্ট চিত্র। সমাজের দোষ দেখাইয়া সেই দোষকে ব্যঙ্গ করিতে হইলে যতদূর সম্ভব, ইনি ততদূর অতিরঞ্জিত করিতে পারেন। ইঁহার লীলাবতী অপূর্ব্ব পদার্থ। ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজের উৎকৃষ্ট নিয়মাদি অনুকরণে অক্ষম হইয়া অথচ প্রাচীন সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎকালের যুবকগণ কিরূপে অধঃপাতে যাইতেন, দীনবন্ধু সে সকল বর্ণনায় অদ্বিতীয়। তাঁহার নদের চাঁদ ও হেমচাঁদ, তাঁহার অটল ও নিমেদত্ত কল্পনার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তাঁহার নীলদর্পণে সমাজের কত উপকার করিয়াছে, কিরূপে অত্যাচারী পাপাশয়

নীলকরগণের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইলে পুঁথি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

ইহার পর বঙ্কিমবাবু; ইঁহার দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর, এক একখানি এক এক অদ্ভুত পদার্থ। ইঁহার গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য যে বঙ্গীয়-পাঠকদিগের সম্মুখে এক একটি উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র দেখান এবং সৎপথভ্রষ্ট হইলে তাহার যে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত তাহারও চিত্র দেখান। তাঁহার প্রতাপ পুরুষশিরোমণি, যেমন বুদ্ধি, যেমন বিজ্ঞতা, যেমন কর্ম্মক্ষমতা, তেমনি উচ্চতর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, আবার তেমনি ধর্ম্মপথে মতিমান্। পূর্ব্বে রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গীয়যুবককে যে সকল শিক্ষা দিত, আজি এই পরাধীন দেশে বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি ঠিক সেই শিক্ষা দেয়; তাঁহার কমলাকান্ত আর কেহ নহে, একজন সুশিক্ষিত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বঙ্গবাসীর হৃদয়স্থ অনন্ত শোকসাগরের গভীর সমুদ্গারণমাত্র। তিনি "এস এস বঁধু এস," এই গীতের ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলাকান্তের মুখে যে নানা রসপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্যকলাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সূর্য্যমুখী, আয়েষা, ভ্রমরা, ললিত-লবঙ্গলতা, এমন কি তাঁহার রূপসী, হীরা, রোহিণী হইতেও আমরা উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা পাইয়া থাকি। নীতিশিক্ষা কাব্যে অতি অল্প প্রশংসা, কিন্তু উহার রুচি অতি চমৎকার, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে সুরুচিবিরুদ্ধ বর্ণনা অতি বিরল, নাই বলিলেও হয়। কিন্তু এই কয়খানি বই লইয়া বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা করিলে, তাঁহার উপর শুদ্ধ অবিচার করা হয় মাত্র। তিনি যেরূপ নিজদেশের জন্য দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কেহই করে নাই। তাঁহার বঙ্গদর্শন বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যত উন্নতিসাধন করিয়াছে, এত বোধ হয় আর কিছুরই দ্বারা কখন হয় নাই, ইহাতেও বঙ্কিমবাবুর সব বলা হইল না। ইনিও ঈশ্বরগুপ্তের অনুকরণকরতঃ সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বঙ্গভাষায় লিখাইবার জন্য বিহিত যত্ন করেন। এখনকার লেখকবৃন্দ বঙ্কিমবাবুর নিকট যত ঋণী এত বোধ হয় আর কাহারও নিকট

নহে। এই প্রাচীন বয়সে নানারূপ শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক যন্ত্রণার মধ্যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের গুরুতর পরিশ্রমের উপরও বঙ্গসাহিত্যের জন্য ইঁহার চিন্তা ও পরিশ্রমে বিরতি নাই। বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালি যে ইংরেজি-শিক্ষায় কি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালি যে চিন্তাশীলতায়, স্বরুচিশীলতায়, কাব্যপ্রসঙ্গে অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কথা লইয়া আর অধিক আন্দোলন করা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। বঙ্কিমবাবু দেশের উপকারার্থ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন ও ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দিলে যাহা করিবেন, তাহা অন্যে বলিলে যত সাজিবে, নানা কারণে আমার বলিলে তত সাজিবে না।

বঙ্গদর্শনের দেখাদেখি আমাদের দেশে আর চারি পাঁচখানি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আর্য্যদর্শন কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গালিদিগের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্যদর্শনে দেশের মনে পরনিরপেক্ষতাবৃত্তি উদ্দীপনের জন্য নানা প্রকার যত্ন করা হইয়াছিল। ইহার প্রধান লেখক সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নিজে এবং পূর্ণচন্দ্র বসু। সম্পাদক মিল ও ম্যাটসিনির জীবনচরিত লিখিয়া বঙ্গবাসীকে ইউরোপের দুইজন প্রধান নেতার মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বসু বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীচরিত্রগুলির চরিত্র পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া যথার্থ উচ্চতর সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় দ্বিতীয় সাময়িকপত্রিকা বান্ধব, ইহার প্রভাব আমাদের এ অঞ্চলে তত অধিক নাই, কিন্তু ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ইহার সম্পাদক মনীষাসম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিলক্ষণ দক্ষতাসহকারে পত্রিকাসম্পাদন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজিতে যাহাকে earnest man বলে, আমাদের এ অঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক, আর কালীপ্রসন্ন বাবু এই সকল earnest লোকের অগ্রণী। তাঁহার লেখার জীবন্ত ভাব, জলন্ত রচনা। তাঁহার সহযোগীগণকে আমরা বিশেষ জানি না; যাহা জানি, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে যে কালীপ্রসন্নবাবুর সহযোগী-গণের মধ্য হইতে অনেক উৎকৃষ্ট লেখক উৎপন্ন হইবেন। আর একখানি

সাময়িকপত্র ভারতী, এখানি যোড়াসাঁকস্থ ঠাকুর পরিবার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ইহার রুচি মার্জ্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্য্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখন বাকি পড়ে না, সকল কাগজ একবৎসর দুইবৎসর বাকি পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতীর বাকি নাই। এই পত্রের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইঁহার নিজের গ্রন্থাবলী অতি সুন্দর। স্বপ্নপ্রয়াণে ইঁহার কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সম্পাদকতা কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। যেখান হইতে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সরোজিনী, পুরুবিক্রম প্রভৃতি দশ বারোখানি সুরুচিসঙ্গত সুললিত পাঠ্য ও উপাদেয় গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অল্প ক্ষমতাশালী বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চারি বৎসর ধরিয়া ভারতীতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্য সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলী তুলনারহিত; তাঁহার য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র দেশ ভ্রমণ বিষয়ে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তাঁহার সকল প্রবন্ধ গুলিই সুপাঠ্য। তিনি অল্প বয়সে যেরূপ মানসিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে পরে তাঁহার দ্বারা যে সাহিত্যের স্থায়ী উপকার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয় দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই মোহিত হইয়াছিলাম।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহর্ষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা; তিনি অতিশয় সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না। তাঁহার স্বদেশানুরাগ তদীয় "দীপনির্ব্বাণ" গ্রন্থে সম্যক্ বিকসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে চিত্তের প্রসাদলাভ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্য এই শৈশবাবস্থাতেই যখন এইরূপ প্রতিভাশালিনী গ্রন্থকর্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছে তখন রমণীগণ যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন ও ইহার বিশেষ উন্নতিসাধন করিবেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ আশা করা যাইতে পারে। দেবী স্বর্ণকুমারী নিজেই বোধ হয় অনতিদূর ভবিষ্যৎকাল মধ্যে বঙ্গের প্রধান প্রধান গ্রন্থকারগণের মধ্যে মাননীয় আসন প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গদর্শনে যাঁহারা বঙ্কিমবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে

সকলেই উৎকৃষ্ট লেখকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান্ চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ। ইংরেজি, সংস্কৃতসাহিত্যে যাহা কিছু মহান; সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলীপরিপূর্ণ। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার তীক্ষ্নবুদ্ধিশালিনী সাধারণীর সম্পাদক; বঙ্গদর্শনে তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। দশমহাবিদ্যা, গ্রাবু প্রভৃতি যে প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিত, তাহার অনেকগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সময়ে সময়ে বঙ্কিম বাবুকে সহায়তা করিতেন. এক্ষণে তিনি বাঙ্গালার একটি মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা; তাঁহার লিখিত উদ্ভ্রান্তপ্রেম বহুকালাবধি বঙ্গীয় যুবকদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিবে। বঙ্গদর্শনের আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য লিখিয়াছেন, বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার ভ্রাতা বঙ্কিমবাবু, আর চন্দ্রনাথবাবু। চন্দ্রনাথবাবু চিন্তাশীল, তিনি বহুকাল কলিকাতা রিবিউয়ের সমালোচক ছিলেন, এক্ষণে ইংরেজি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান শকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। আমরা আর্য্যদর্শনের আর একজন লেখকের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইঁহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি এক্ষণে সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ইঁহার কল্পতরু ও ভারতউদ্ধার না পড়িয়াছে বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল। ইঁহার ভারতউদ্ধার নামক Mock Heroic কাব্য অতুল্য পদার্থ। ইনি এক্ষণে পঞ্চানন্দ নামক রহস্যপূর্ণ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক।

আমার প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আমি সকলের নিকট আবার একটু ধীরতা ভিক্ষা করি। এই সময়ে আমরা আর কয়েকটী লোকের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাটক দুইখানিতে ইয়ং বেঙ্গলের দোষ ও গুণের অতি সুচারু চিত্র দেওয়া আছে। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতেছেন, যতদূর আমরা পাইয়াছি,

তাহাতে বেশ অনুভব করিতে পারি, বইখানি সম্পূর্ণ হইলে, বাঙ্গালায় একখানি অপূর্ব্ব পাঠ্যগ্রন্থ হইবে। তাহার পর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া, নিজের অসাধারণ ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ও নিজ ভাষাকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা নাই। সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার অসীম মতলবের শেষ নাই, তাঁহার বয়স অল্প বোধ হয়, তিনি অনেক লিখিয়া যাইতে পারিবেন। আর সম্প্রতি কয়েকটি যুবক কল্পনানামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের যেরূপ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার আর বিশেষ সন্দেহ দেখিতেছি না।

বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তিন চারিখানি উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন; সম্প্রতি যোগেশ নামক অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালির কৃতজ্ঞতা লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মন্দা ও নর্ম্মদা স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর নির্ব্বাসিতের বিলাপ একখানি সুপাঠ্য বাঙ্গালা কাব্য। তাঁহার পুষ্পমালায় বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিতা আছে; যে কবিতায় তিনি স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার ন্যায় উচ্চতর ভাবপূর্ণ কবিতা আর দেখি নাই।

মিষ্টার আর, সি, দত্ত চারি পাঁচখানি সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট চিত্র লিখিয়া বঙ্গবাসীকে আমোদ ও শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে, আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র দেখিতে পাই, তাঁহার ভাষা সুললিত এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী সর্ব্বজনমনোরম।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর নাটকগুলিও অতি সুপাঠ্য। এই সকল নাটক পাঠে রুচি মার্জ্জিত হয়, সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং অন্তঃকরণে নির্ম্মল আনন্দের উদয় হয়।

আর দুইখানি গ্রন্থের কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক। দুইখানিতে গ্রন্থকার নাম দেন নাই, একখানি বঙ্গাধিপপরাজয় আর একখানি স্বর্ণলতা। বঙ্গাধিপপরাজয়ের গ্রন্থকার সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বর্ণনায় যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া-

ছেন, উঁহার নরনারীচরিত্রগুলিও উত্তম। স্বর্ণলতা ইংরেজিতে যাহাকে নবেল বলে, বাঙ্গালায় সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম নবেল। বাঙ্গালিসমাজের এরূপ সুন্দর চিত্র অতি বিরল।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্যগুলি অতি সুন্দর। এত মিষ্ট কবিতা আমি কখন পড়ি নাই। তাঁহার বঙ্গসুন্দরী প্রত্যেক শিক্ষিতা রমণীর পাঠ করা উচিত। উহা পাঠ করিলে পুরুষেরও মন গলিয়া যায়। রমণীর মন অতি রমণীয় হইয়া উঠিবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? তাঁহার সারদা-মঙ্গল রমণীয় সৌন্দর্য্যের উদ্দাম বিকাশ।

হরলাল রায়ের হেমলতা বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যে সকল গুণ থাকিলে নাটক হয়, তাহা উহাতে ভূরিপরিমাণে পাওয়া যায়।

উদাসিনী নামে বাঙ্গালায় একখানি মিষ্ট, সুরস, করুণরসপূর্ণ কাব্য আছে। গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা মিলনের সুখভোগে অকৃতকার্য্য হইয়া যোগী ও যোগিনী হইয়াছেন। গ্রন্থকার নাম দেন নাই, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছি।

আমরা এই বঙ্গীয়লেখক সমালোচনার সর্ব্বশেষে পুষ্পাঞ্জলির সমালোচনা করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিব। পুষ্পাঞ্জলি বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট মহাগ্রন্থ। ইহার ভাষা সংস্কৃতানুকরণ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ভাষা তাঁহার নিজের। রামগতি ন্যায়রত্নমহাশয়েরও ভাষা তাঁহার নিজের। কিন্তু ভূদেববাবুর ভাষা প্রাচীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কথকসমাজে যে ভাষা কথিত হইত, তন্মধ্যে যাহা কিছু মহীয়ান্ ছিল, সে সমুদয়ের সারসংগ্রহ, অনুকরণাতীত। ইহার ভাবাবলী বঙ্গবাসীর অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত থাকা উচিত। পুষ্পাঞ্জলি একখানি অদ্ভুত পদার্থ। ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালায় ইংরেজিওয়ালার লিখিত প্রথম উপন্যাস।

আমরা আর অধিক লোকের গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া সকলের অধীরতা বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে চিহ্নিত সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইতে সামান্য স্কুলমাষ্টার পর্য্যন্ত বাঙ্গালা লিখিতে

আরম্ভ করিয়াছেন। আগে লোকে ইংরেজি লিখিত, কিন্তু আধুনিক যুবকগণ ইংরেজি পড়িয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিতেছেন। অনেকে ইংরেজি লেখায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও বাঙ্গালা আরম্ভ করিতেছেন। ক্রমে লোকের সংস্কার দাঁড়াইতেছে যে নানা ভাষা শিখিব, নানা দেশ দেখিব, কিন্তু লিখিব নিজ ভাষায়। ইহার প্রমাণ ভারতীতে প্রকাশিত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্রখানি। তাঁহার পত্রাদি বাঙ্গালায় লিখিত, তাঁহার মন বাঙ্গালার জন্য আকুল। তিনি সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে যখন বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালির জন্য কাঁদিয়াছেন, তখন আর এ কথার বিশেষ প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। যখন সকল অবস্থাপন্ন, সকল ব্যবসায়ী, লোকের মধ্যেই সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ পাইতেছে, তখন সাহিত্যের যে মহতী শ্রীবৃদ্ধি অচিরাৎ সাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এখনও একটি কথা বাকি আছে। যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্য লিখিতেছেন, তাঁহারই অন্য ব্যবসায় আছে, কেহ চাকুরী করেন, কেহ জমীদার, কেহ উকীল, কেহ ব্যবসায় করেন অথচ পুস্তক লিখেন; অতএব সকলেই amateur; কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটী ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই; এখনও শুদ্ধ সাহিত্য ব্যবসায় করিয়া কেহ জীবননির্ব্বাহ করিতে পারেন না। যাহাতে সাহিত্য ব্যবসায় হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বোধ হয়, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধ সাহিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আজিও গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে লাভ আছে, আজিও একজন ভাল গ্রাজুয়েট গবর্ণমেণ্ট চাকুরীতে যাইবামাত্র অন্ততঃ ৭৫ কি ১০০ টাকা পাইতে পারেন। যত দিন সাহিত্য-ব্যবসায় প্রথম হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ না দেখাইতে পারে, ততদিন উৎকৃষ্ট শিক্ষিত লোক সাহিত্য-ব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিতে চাহিবে না। এই নূতন সমাজে সমস্ত ইউরোপীয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যরাশি উদ্ঘাটিত হইয়াও যে বঙ্গীয় সাহিত্যের আজিও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ স্বাধীন সাহিত্য ব্যবসায় না থাকা। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ যে কেন অনবরত

বাহির হয় না, যাহাও বাহির হয়, তাহাও দেরিতে দেরিতে হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, পুস্তকরচনা ব্যবসায়ান্তরাবলম্বী গ্রন্থকারদিগের খুসী ও অবসরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে, কিন্তু যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে, Profession না হইবে, ততদিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব। সাহিত্য ব্যবসায় করিতে হইলে, আমাদিগের কি করিতে হইবে? কোন ভাল নূতন পুস্তক বাহির হইলেই যদি সেগুলি কতক কতক বিক্রয় হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা থাকে; এবং সাহিত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারে. এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হয়; যদি গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য গ্রন্থকারগণকে অলস, মৎসর, ব্যঙ্গপ্রিয় সমালোচকের লেখনীর উপর নির্ভর না করিতে হয়, আর বহু-সংখ্যক লাইব্রেরী থাকে, যাহাতে সকল প্রকার গ্রন্থই ক্রীত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই সম্যক্ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আমরা এক পরিবারের গুণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; সে কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী। শোভাবাজারের রাজবাড়ী যেমন ভট্টাচার্য্যদিগের উৎসাহদাতা, ঠাকুরপরিবারও তেমনি এই নবাঙ্কুরিত সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। নূতন সাহিত্য প্রচারের সময় অন্যান্য প্রসিদ্ধ পরিবারগণ যদি উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বাধীন সাহিত্য ব্যবসায় অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ন্যায় লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়িয়া গেলে, লেখকগণ স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত হইলে, বঙ্গীয় সাহিত্যের যে অদ্ভুত উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের সাহিত্যের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার অচিরাৎ প্রস্তুত করিবার যেমন আশ্চর্য্য সুবিধা হইয়াছে এমন অল্প জাতির ভাগ্যে ঘটে। আমাদের দেশে যে কোন নবোৎসাহ জন্মাক, সকলেই সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে; ব্রাহ্মদিগের নবোৎসাহে সাহিত্যসংখ্যা যে কত বৃদ্ধি করিতেছে তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে সে সাহিত্যের বিষয় বড় কেহ অবগত নহেন। তাহার পর ইংরেজী আমাদের bread-winning language, আমাদের ইংরেজী পড়িতেই হইবে। সুতরাং ইংরেজি পড়ার দরুণ আমাদের সাহিত্যের যে উন্নতির সম্ভাবনা তাহা একপ্রকার চিরস্থায়ী বলিতে হয়। তাহার পর আমাদের এত বিদ্যানুরাগের সময় সংস্কৃত এখনও

অনেকে পড়িবে, প্রাচীন আর্য্যভাষা কোন বাঙ্গালি অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না; সুতরাং সংস্কৃত পাঠ হেতু সাহিত্যের যে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা সেও চিরস্থায়ী। এখন কেবল চিরস্থায়ী সাহিত্যমাত্র ব্যবসায়ী একদল লেখক চাই. তাহা হইলে আমরা অল্প দিনে পৃথিবীর আর সমস্ত সাহিত্যকে কাণা করিয়া দিতে পারিব। সকলকে হারাইয়া দিতে পারিব। যাহা এই বিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে, অন্য দেশে তাহা দুই শত বৎসরে হয় না। আরও বিশ বৎসরে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইবে, নিশ্চয়; কারণ, লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্ক, ইঁহাদের বয়োবৃদ্ধিসহকারে লেখার গুণও অধিক হইবে, আর সংখ্যাও অধিক হইবে। সাময়িকপত্রিকাগণ প্রতিবৎসরই দুই একটি করিয়া লেখক তৈয়ারি করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে; এই সকল লেখক যাহাতে গবর্ণমেণ্ট বা অন্য সর্ব্বিসে না গিয়া কেবল সাহিত্য লইয়া কাল কাটাইতে পারে, তাহার যোগাড় করিয়া দিলেই বাঙ্গালা সাহিত্যের জয়ধ্বনি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি পৃথিবীমধ্যে এক মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। অনেকে বলেন বঙ্গভাষার অবস্থা বড় হীন; কিন্তু এই বঙ্গীয় লেখকমণ্ডলী মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথায় সায় দিতে পারি না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। যখন প্রতি তিন মাসে পাঁচ ছয় শত নূতন পুস্তকের রেজিষ্টরি হয়; যখন এক কলিকাতায় পাঁচ শত প্রেস অনবরত চলিতেছে; যখন উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলেই বাঙ্গালা লিখিবার ও পড়িবার জন্য উৎসুক, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতি শুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত ভাবী লেখক, ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছেন; আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত মহাকাব্য বঙ্গবাসীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশ দেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আমার কর্ণে কত ভবিষ্যৎবাণীর ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে তাহা বলিতে পারি না। এই সকলের পশ্চাতে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, একটি গৌরবান্বিত মহাশক্তিমান্ মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের

ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে বর্ত্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়গণের গুণগান করিতেছে; আর মহা আনন্দভরে দেবনির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।

আমাদের অভাব। *

ভ্রাতৃগণ, আমি অনুরুদ্ধ হইয়া এই আসন পরিগ্রহ করাতে আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছি। কিন্তু এই আসন পরিগ্রহ করিয়া সদালাপে যে আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, এমত শক্তি আমার নাই। শুদ্ধ কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার্থ আমি আপনাদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান। কোন সামাজিক বিষয় লইয়া আপনাদিগের সহিত সদালাপ করা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে যে অল্প কাল অবসর পাইয়াছি, তাহাতে যে আমার এই প্রস্তাব অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভ্রাতৃগণ, আমরা বৎসরের মধ্যে একবার কি দুইবার কখন এইরূপ প্রকাশ্য সভায় একত্রে মিলিত হই। কিন্তু আমাদিগের এক্ষণে যেরূপ হীন অবস্থা, তাহাতে এরূপ নিস্তব্ধ ও শান্ত ভাব অবলম্বন করা আমাদিগের পক্ষে শোভা পায় না। মনে করুন. আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি ছিলেন, এক্ষণে আমরা কি হইয়াছি। আমরা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে। এক্ষণে সেই পূর্ব্বপুরুষগণের কোন ধর্ম্মই আমাদিগের শরীরে নাই। একে একে আমরা তাঁহাদিগের সকল মহৎগুণই হারাইয়াছি। আমরা যে দিকে চাই, সেই দিকেই আমাদিগের সহস্র সহস্র অভাব দেখিতে পাই। অথচ এত অসংখ্য অভাব মধ্যে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। কি জন্য বসিয়া আছি?--আমাদিগের এই সমস্ত অভাবের আজিও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। আমরা যতদিন না এই সমস্ত অভাব প্রকৃত পক্ষে উপলব্ধি করিতে পারিব, যতদিন না এই সমস্ত অভাব প্রকৃতপক্ষে অভাব বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকিবে, ততদিন আমাদিগের এই নিশ্চেষ্ট জড়ভাব অপনীত হইবে না। এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, এই অভাবনিচয়

* ১৮ই বৈশাখ সন ১২৮৯ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

আমরা সর্ব্বদা আলোচনা করি। আমাদিগের কর্ত্তব্য, এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ্য সভায় সর্ব্বদা মিলিত হইয়া আপনাদিগের হীনাবস্থা সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করি, সেই অবস্থা হইতে উন্নতি-সাধনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করি, জাতীয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হই, এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। পৃথিবীর আর কোন জাতি, এরূপ হীনাবস্থায়, আমাদিগের মত নিশ্চিন্ত ও নিরীহ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিত না। আমরা নিতান্ত অসার বলিয়াই এইরূপ জড়ভাব অবলম্বন করিয়া আছি।

আমাদিগের অভাব যে কতপ্রকার, ও কত সহস্র, তাহা আপনারা একটু পর্য্যালোচনা করিলেই মনে মনে বুঝিতে পারিবেন। আমি সে সমস্ত অভাব বলিতে আসি নাই। তন্মধ্যে গুটিকত প্রধান অভাব লইয়া অদ্য আপনাদিগের সহিত পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই অভাবকে আমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভাব। আমি এ প্রস্তাবে শুদ্ধ রাজনৈতিক অভাব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভাব এত অধিক যে, এখানে তাহা পর্য্যালোচিত হইতে পারে না।

আমাদিগের রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, আমরা একটী অধীন জাতি। আমরা এক্ষণে বৈদেশিক ইংরাজগণের প্রভুত্বে বাস করিতেছি। ভারতে ব্রিটিশসিংহের পরাক্রম এখন অনিবার্য্য। তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এমন সাধ্য ভারতবাসীর মধ্যে কাহারও নাই। ব্রিটিশ সিংহ অপ্রতিহত প্রভাবে এখন ভারতারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। সকলই তাঁহার কবলস্থ। যে দিকে যাও, ব্রিটিশসিংহের ভীষণমূর্ত্তি বিরাজমান। সুতরাং ব্রিটিশরাজত্ব এদেশে এক্ষণে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই নাই। ভারতবাসিগণ ইচ্ছা করুন, আর নাই করুন, তাঁহাদিগকে এক্ষণে ব্রিটিশরাজত্বের অধীনে থাকিতেই হইবে।

ব্রিটিশরাজত্ব যদি ভারতে অনিবার্য্য হইল, তবে যাহাতে সেই রাজত্বে সুখে থাকিতে পারি তাহার চেষ্টা দেখাই আমাদিগের উচিত। যে রাজশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতেই হইবে, এক্ষণে আমাদিগের এমত চেষ্টা করা উচিত কিসে সেই রাজশাসনের বশবর্ত্তিতা অসুখকর না হয়

—কিসে সেই রাজশাসনকে আপনাদিগের সুখসাধনোপযোগী করিয়া আনিতে পারি। প্রথমতঃ আমাদিগের দেখা উচিত যে, যে রাজশাসনপ্রণালী আমাদিগের সুখের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যে সমস্ত ব্যবস্থা ও বিধান যথার্থ ন্যায়পরতার অনুবর্ত্তী হইয়া বিধানিত হইয়াছে, সেই শাসনপ্রণালী ও ব্যবস্থাবলি রাজকর্ম্মচারিদিগের ভ্রম-প্রমাদ অথবা অত্যাচার জন্য, তাঁহাদিগের প্রকৃতি, মেজাজ, অথবা মূর্খতা জন্য, যেন প্রজামণ্ডলীর অসুখকর না হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের দেখা উচিত, কিসে আমাদিগের রাজশাসনপ্রণালীর ক্রমশঃ এমত শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা যাইতে পারে যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ ভারতবাসী প্রজামণ্ডলীর সুখ-ভাগের বৃদ্ধি করিতে পারে। এই দুইটি উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র;—একের বিষয় সুখসাধনোপযোগী ব্যবস্থা ও শাসনপ্রণালীর উদ্দেশ্য যাহাতে বিফল না হয়, যাহাতে তাহা হইতে অসুখের উৎপত্তি না হয়, যাহাতে রাজ্যের অত্যাচার ও অনিষ্টপাত নিবারিত হয়, এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করা;—অন্যতরের বিষয়, যাহাতে রাজ্যের ক্রমশঃই সুখের বৃদ্ধি হয়, সুখসাধনোপযোগী নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এবং রাজকার্য্যাদির সূত্রপাত ও অনুষ্ঠান হয়, এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করা একের বিষয়—দুঃখের নিবারণ; অন্যতরের বিষয়—সুখের বৃদ্ধিসাধন।

রাজার কর্ত্তব্য যাহা, তাহা রাজা করিতেছেন। বৈদেশিক ভূপতি হইয়া ইংরাজরাজ এদেশের পক্ষে যাহা করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগকে ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। আমরা যদি আপনাদিগের সুখপ্রার্থী হই, তবে সেই ইংরাজরাজ আমাদিগকে আহ্বান করুন, আর নাই করুন, আমরা আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বিনা আমন্ত্রণে ইংরাজগণের রাজকার্য্যপ্রণালীর সহিত, তাঁহাদিগের রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিব দশবার তাঁহাদিগের দ্বারে আঘাত করিলে যদি একবারও তাঁহারা আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করেন, তাহাতে আমাদিগেরই লাভ। শুনিলেন না বলিয়া এখন অভিমানে চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদিগেরই স্বার্থহানি ভিন্ন আর কিছু লাভের প্রত্যাশা নাই। ইংরাজেরা আপনাদিগের কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু আমাদিগের যাহা অভাব, তাহা আমাদিগকেই অবশ্য মোচন করিতে হইবে; নহিলে আপনারাই অসুখিত হইব।

আপাততঃ আমাদিগের যে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক অভাব তাহা বিবৃত করিয়াছি। এই দুইটি অভাব বর্ত্তমান। আর একটি অভাবের বিষয় যদিও অনেক দূরবর্ত্তী বটে, কিন্তু এই বর্ত্তমান অভাবদ্বয়ের মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সেই তৃতীয় অভাব-মোচনেরও উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ইংরাজগণ ভারতের বৈদেশিক ভূপতি। তাঁহারা ভূপতি বটে, কিন্তু এদেশের সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই রাজ্য-শাসনরজ্জু সেই দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডের হস্তে। তাঁহারা ভারতকে আপনাদিগের অধীনস্থ দেশ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন না। স্বদেশে যাইবার জন্য তাঁহাদিগের অর্ণবপোত রাত্রিদিন সজ্জিত আছে। তাঁহারা সকলেই এখানে দুইদিনের জন্য আসেন। তাঁহারা এখানে থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মন ও মায়া সেই স্বদেশের জন্য পড়িয়া আছে। তাঁহারা শুদ্ধ কর্ত্তব্য-সাধনানুরোধে যা ভারতবর্ষের জন্য দুই এক ঘণ্টাকাল চিন্তা করেন, নহিলে তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বদেশের জন্য ভাবিতেছেন। তাঁহারা এখানে—তাঁহাদিগের পরিবারবর্গ হয়ত বিলাতে। তাঁহারা সর্ব্বদাই বিলাতে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এখানকার সম্বন্ধ শুদ্ধ চাকরি, অথবা বাণিজ্য-ব্যবসা। তাঁহাদিগের এখানকার বন্দোবস্ত শুদ্ধ কাজ চালাইবার মত। তাঁহাদিগের ধনাগার বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক। তাঁহারা কাজ চালাইবার মত এখানে সৈন্য রাখিয়াছেন, কাজ চালাইবার মত রাজকর্ম্মচারিগণকে আনেন। তাঁহাদিগের সৈনিক ও রাজকার্য্যের পুরস্কার সেই ইংলণ্ডে প্রদত্ত হয়। ক্লাইব, স্যার কলিন ক্যাম্বেল, হার্ডিঞ্জ, গফ্, নেপিয়ার, লরেন্স ইংলণ্ডে গিয়া লর্ড হইলেন। ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজেরা এরূপ পৃথক হইয়া আছেন, যে এখনি প্রয়োজন হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজত্বের এই বিস্তৃত জাল গুটাইয়া লইতে পারেন। তাঁহারা আজিও আমাদিগের সঙ্গে মিশিলেন না। তাঁহারা শুদ্ধ আপনাদিগেরই সঙ্কীর্ণ ও গঠিত সমাজ মধ্যে বিচরণ করেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজগণ শুদ্ধ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য যেরূপ নিঃসম্পর্কীয়ভাবে ভারতবর্ষে থাকিতেন, আজি ভারতবর্ষের রাজা হইয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা প্রায় সমান নিঃসম্পর্কীয় ভাবে রহিয়াছেন। প্রভেদ এই, তাঁহাদিগের ব্যবসায়ের

প্রয়োজনের উপর আর একটী নূতন প্রয়োজন আসিয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে শুদ্ধ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন ছিল, এখন তৎসঙ্গে একটী রাজনৈতিক প্রয়োজন যোজিত হইয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যপ্রিয় স্বার্থপর ইংরাজগণ সেই রাজনৈতিক প্রয়োজনকেও অনেক দূর আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির দ্বার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। অনুমান হয়, যত দিন ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের স্বার্থসিদ্ধি করিবে, ততদিন ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ। সে দিনও একজন প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ রাখিয়া ইংরাজগণের ক্ষতি লাভ কি? তাঁহারা এখন ক্ষতিলাভ-তুলায় ভারতরাজত্বকে পরিমাণ করিতে যান। তাঁহাদিগের রাজকার্য্য প্রণালীতে যদিও এতদূর অনুদার ভাব না থাকুক, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শিতে পারে।

এই ইংরাজ-রাজত্বে আমরা বাস করিতেছি। যাহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া জ্ঞান করিব, দেশের রাজা বলিয়া যাহাদিগকে আপনাদিগের পতিত্বে বরণ করিব, যাহাদিগের উপর সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিশ্চিন্ত থাকিব, যাহাদিগের সহিত ক্রমশঃ আপনাদিগের ঘনিষ্টতা ও আত্মীয়তা ভাবের বৃদ্ধি করিব, আজি বলিতে বুক বিদীর্ণ হয়, সেই ভারতের সর্ব্বস্বের প্রভু ইংরাজরাজ ভারত হইতে সর্ব্বদাই বিচ্ছিন্ন রহিয়াছেন। আমরা এরূপ হৃদয়শূন্য জাতি নহি যে, শুদ্ধ রাজাকে রাজা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। রামরাজ্যে পৌরজনেরা রাজার ও রাজপরিবারবর্গের সুখ দুঃখে হাসিতেন ও কাঁদিতেন। কত পৌরজন পাণ্ডবদিগের সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন। কত পৌরজন রামের সহিত বনবাসে উদ্যত হইয়াছিলেন। রাম তাহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য কত কৌশল করিয়াছিলেন। রামকে দেখিবার জন্য রাজনগরের শত গবাক্ষ নয়নোন্মীলন করিয়াছিল। ইংরাজরাজ যে এত বিচ্ছিন্ন, তথাপি আমাদিগের হৃদয়দ্বার তাহাদিগের জন্য সমান উন্মুক্ত রহিয়াছে। সে দিনও আমরা কত আহ্লাদের সহিত যুবরাজকে ভারতে আহ্বান করিয়াছি, তাঁহাকে রাজোপহার প্রদান করিয়াছি, রাজভক্তি উৎসর্গ দিয়াছি, তাঁহাকে দেখিবার জন্য নগরের সহস্র নয়ন একেবারে উন্মীলন করিয়াছি। রামরাজ্যের পৌরজনগণ যেরূপ রাজভক্তিতে গদ্গদ থাকিতেন, আমরাও আজিও ইংরাজরাজকে সেইরূপ ভক্তি সহকারে হৃদয়া-

সনে অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি। দুঃখ এই, ইংরাজরাজ কেন আমাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। কেন তাঁহারা আমাদিগের এতদূর রাজভক্তির বিষয় হইয়া বিচ্ছিন্ন থাকিতে চাহেন! কেন তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়রাজ্য হইতে দূরে যাইতে চাহেন।

যাহা হউক, ইংরাজগণ যখন আমাদিগের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ এত দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমরা প্রার্থনা করি, ইংরাজগণের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হউক। কিন্তু তাঁহারা কই সে সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করিতে চাহেন? তাঁহারা কই ভারতে বসবাস ও উপনিবেশ স্থাপন করিলেন? বরং তাঁহারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাকে, তাঁহাদিগের রাজনৈতিক কৌশল বলিয়া পরিগণিত করেন। করুন, তৎসম্বন্ধে আমরা কোন বাক্যব্যয় করিলে তাঁহারা সেই কৌশলে আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া যাইবেন। কিন্তু ইংরাজগণ যখন এদেশের সহিত চিরসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে চাহেন না, তখন আমরা কি করিব? আমাদিগের উপায় কি? আমাদিগের তখন কি অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে? মনে করুন (যদিও আমরা এরূপ প্রার্থনা করি না) ইংরাজগণের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইল; মনে করুন, তাঁহারা ভারত পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইলেন; মনে করুন স্বদেশের কোন প্রয়োজন বশতঃ ইংরাজগণ ভারতের সম্বন্ধ ছেদন করিলেন; তখন আমাদের কি দুর্দ্দশা! এক কালে রোম রাজ্যের অধীনে পূর্ব্বতন ব্রিটনের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আমরাও তখন কি সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হইব না? দেশ মধ্যে তখন কি আবার অরাজকতা আসিয়া উপস্থিত হইবে না? আমরা কি শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যন্যবর্গের শিকারস্থানীয় হইব না? আমাদিগের তখন এমত বল থাকিবে না যে, আমরা তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি, এমত বল থাকিবে না যে, শত্রুবলের প্রতিরোধ করি। তখন বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। রাজার সহিত রাজার, এবং প্রজার সহিত প্রজার ঘোর বিবাদ ও বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠিবে। তখন আবার হয় ত কোথা হইতে এক জন রাজা আসিয়া আমাদিগকে অধীনস্থ করিবে। আমাদিগের কিছুতেই নিস্তার নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি এরূপ সময় ভারতে

উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা কি তজ্জন্য কিছু প্রস্তুত হইতেছি? তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? তদ্রূপ সময় ঘটিবে না, ইহা কি স্থির নিশ্চয়? আমরা প্রার্থনা করি না যে, সেরূপ সময় ঘটুক। কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ রাজ্য চিরস্থায়ী হইয়াছে? এখানে যখন মুসলমানেরা রাজত্ব করিতেন, তখন কে জানিত যে, ইংরাজগণ সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এখানে তাঁহাদিগের রাজত্ব উচ্ছেদ করিবেন? মুসলমানেরা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু দেখুন, কোথা হইতে কিরূপ ঘটিয়া উঠিল। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে কে বলিতে পারে? আমাদিগের ইচ্ছা ও প্রার্থনা যে, ইংরাজরাজত্ব চিরস্থায়ী হউক। জগৎ কি আমাদিগের ইচ্ছায় চালিত হইবে? পৃথিবীর অবস্থা তাহার বর্ত্তমান বলসমূহের ফল মাত্র। যখন মুসলমানেরা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, আর এক বল প্রবল হইয়া সেই বলকে পরাজয় করিল।

কিন্তু মনে করুন, আমাদিগেরই ইচ্ছানুযায়ী ইংরাজগণ চিরকাল সমপ্রবল রহিলেন। বরং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের বলবৃদ্ধি ঘটিল। তাহা হইলেও কে বলিতে পারে, পার্থিব অন্য বৈদেশিক বল এতদপেক্ষাও প্রবলতর হইবে না? যদি অন্য বল ইংরাজবল অপেক্ষা কখন প্রবলতর হয়, তখন কি আমাদিগের আর এক বিকল্প আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না? তখন কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় ইংরাজবলকে আরও বৰ্দ্ধিত করি? ইংরাজগণকে সাহায্য করিয়া বিপক্ষ বলকে পরাভূত করি? ইংরাজরাজত্ব আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অন্য রাজত্বে যে আমরা এতদপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব ইংরাজ রাজত্ব যাহাতে সুরক্ষিত হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেরূপ সাহায্য দানের জন্য আমরা কি প্রস্তুত আছি? আমরা কি সামাজিক ইষ্টের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি? আমাদিগের শরীরে কি কোন সারবান গুণ আছে? না আমরা পূর্ব্বেও যেমন অসার ছিলাম, আজিও তেমনি অসার হইয়া রহিয়াছি?

এই ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবিতে গেলে, আমরা আর একটী রাজনৈতিক অভাব দেখিতে পাই। সে অভাব এই যে, আমাদিগের শরীরে এমত কোন

উচ্চতর গুণ নাই, যে গুণবলে আমরা নিজে নিজে দাঁড়াইতে পারি। তেজ আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম নহে। কিন্তু আমাদের কি চিরকাল তেজোহীন থাকা উচিত? দৃঢ়তা, উদ্যোগিতা, ও সাহস প্রভৃতি উচ্চতর গুণ সকল আমাদিগের শরীরে নাই। সে সকল গুণের যাহাতে সমাবেশ হয়, আমরা কি কখন এমত চেষ্টা করিয়া থাকি? ইংরাজ-চরিত্রে আমরা যে উচ্চতর গুণ সমূহের সমাবেশ দেখি, সে সমস্ত গুণার্জ্জন করিতে কি আমাদিগের চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে? আমরা কি স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভর শিক্ষা করিয়াছি? যে অসমসাহসিকতা, উদ্যোগিতা এবং চরিত্রবলের জন্য ইংরাজগণ জগদ্বিখ্যাত, তাহার কতটুকু অংশ আমাদিগের শরীরে প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমাদিগের কি কিছু চরিত্রবল আছে? চরিত্রবল না থাকা আমাদিগের একটী জাতীয় অভাব। এই অভাব জন্য ইংরাজগণ আমাদিগকে উচ্চকার্য্যে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যখন আমরা চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইব, তখন কি উদার ইংরাজরাজ আমাদিগকে উচ্চ কার্য্যভার অর্পণ করিবেন না? যে সমস্ত কার্য্যে এখনও আমরা অধিকার পাই নাই, সে সমস্ত কার্য্যের জন্য আমরা উপযুক্ত হইলে যে, উদার ইংরাজগণ তাহা আমাদিগকে দিবেন এমত আশা, আমরা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে মনে ধারণা করিতে পারি। অতএব, যাহাতে আমরা জাতীয় চরিত্রবল অর্জ্জন করিতে পারি, তজ্জন্য এক্ষণে আমাদিগের চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। জাতীয় চরিত্রবলের অভাব এক্ষণে আমাদিগের একটী প্রধান রাজনৈতিক অভাব।

আমি আপনাদিগের নিকট এক্ষণে তিনটী মাত্র রাজনৈতিক অভাব প্রদর্শন করিয়াছি। অন্যান্য অভাব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু আমার জ্ঞানে এই তিনটী প্রধান অভাব অথবা প্রয়োজন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথম, ইংরাজ-রাজত্বের অত্যাচার নিবারণ করা, দ্বিতীয়, ইংরাজরাজত্বে সুখের ভাগ প্রবর্দ্ধিত করা, তৃতীয়, জাতীয় চরিত্রবল অর্জ্জন করা।

আপনাদিগের নিকট শুদ্ধ এই কয়েকটী অভাব নিবেদন করিয়াই আমার ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই অভাবমোচনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহারও পর্য্যালোচনা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বলি না, আমি যে উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব, তাহাই সদুপায়। আমি উপায়

নির্দ্ধারণে ভ্রান্ত হইতে পারি, প্রকৃত সৎপথ প্রদর্শনে অক্ষম হইতে পারি; কিন্তু তাহা হইলেও সদুপায় এবং সৎপথ নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতে পাই, ইংলণ্ডে যে রাজশাসন স্থাপিত আছে, তাহা প্রতিনিধিতন্ত্র। সেখানে যখন এক রাজমন্ত্রী দল প্রবল থাকে, তাহার প্রতিবাদী আর একদল তাহাদিগের রাজশাসনপ্রণালীর দোষাদোষ বিচার করিতে থাকে। দেশময় বড় বড় সম্বাদ পত্র ও সাময়িক পত্রে পরিপূর্ণ। এই সম্বাদ পত্রে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতিষ্ঠিত রাজমন্ত্রী দলের কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা হয়। তাহাদিগের কার্য্যাদির দোষ গুণের বিচার হইতে থাকে। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় রাজস্ব সম্পর্কীয় সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেই, রাজকার্য্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হইয়া থাকে। চারিদিকে প্রতিবাদ, বিচার ও তর্ক। সাধারণ লোকের প্রতিবাদধ্বনি এই সভায় বাগ্মীর বাক্যস্রোতে উত্থিত হয়। দেশ শুদ্ধ রাতদিন রাজকীয় বিষয় লইয়াই পর্য্যালোচনা করিতেছেন। এমত কি এই রাজকীয় দলাদলিতে মহা যুদ্ধ ঘটিয়া যায়। কখন কখন এই বিবাদ এত প্রবল হইয়া পড়ে যে, ইহার জন্য অনেক গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। রাজমন্ত্রীর বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত ভগ্ন হয়। লোকে উন্মত্ত হইয়া পড়ে। এই উন্মত্ততার কারণ, প্রতিবাদী দলের জ্ঞানধ্বনির প্রবলতা।

অতএব, আমরা দেখিতে পাই, ইংরাজজাতি, সাধারণ লোকের জ্ঞানধ্বনিতে প্রচালিত হন। তাঁহাদিগের দেশে দুই প্রকার প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত আছে। এক পার্লেমেণ্ট মহাসভার প্রতিনিধিত্ব, আর এক দেশীয় সম্বাদ ও সাময়িক পত্রের প্রতিনিধিত্ব। প্রথম প্রতিনিধিত্বের ধ্বনি সময়ে সময়ে প্রবলবেগে উত্থিত হয়, দ্বিতীয় প্রতিনিধিত্বের ধ্বনি প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে উত্থিত হইতেছে। দ্বিতীয় প্রতিনিধিত্ব পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াই পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রবলরূপে প্রকটিত হয়। কখন কখন ইহার বল দুর্নিবার হইয়া পড়ে। অতএব মূল ধরিতে গেলে এই সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিত্বই সর্ব্বপ্রধান। সমস্ত ইংলণ্ডের জ্ঞানধ্বনি এই প্রকার প্রতিনিধিত্বে প্রথম উত্থিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই প্রতিনিধিত্বের ধ্বনি হয় ত প্রবল

হইতে থাকে। তৎপরে মহাসভার অধিবেশনে ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হইয়া থাকে।

ইংরাজগণের জাতীয় প্রবণতা এই প্রতিনিধিত্বের দিকে। তাঁহারা সাধারণ জনগণের জ্ঞানধ্বনিকে অত্যন্ত সমাদর করেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, এই জ্ঞানধ্বনিতে তাঁহাদিগের সমস্ত রাজসম্পর্কীয় বিষয়ের দোষগুণ বাহির হইয়া পড়ে। সম্বাদপত্র ও সাময়িকপত্র তাঁহাদিগের রাজশাসনপ্রণালীর একটী মহাযন্ত্র। এই মহাযন্ত্র দ্বারা তাঁহারা অনেক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। ইংরাজগণ ইহা ব্যতীত থাকিতে পারেন না। ইহা দ্বারা তাঁহারা জীবিত আছেন। তাঁহারা ভারতে রাজত্ব স্থাপন করিয়াই এখানে সম্বাদপত্র স্থাপন করিয়াছেন। আমরা যেমন শুদ্ধ পৃথিবীর সম্বাদ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সম্বাদপত্র পড়ি, তাঁহারা শুদ্ধ সেরূপ কৌতূহল নিবারণের জন্য সম্বাদপত্র পড়েন না। তাঁহারা সম্বাদপত্র দ্বারা দ্বিবিধ রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেন। প্রথমতঃ, ইহা দ্বারা তাঁহারা রাজ্যের সমুদয় ঘটনাবলির সমাচার বিদিত হন। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা তাঁহারা রাজকার্য্যাদিরও পর্য্যালোচনা করেন। কোন জ্ঞানবান্ ইংরাজকে তুমি সম্বাদ ও সাময়িকপত্র বিহীন দেখিতে পাইবে না। ইহা তাঁহার জ্ঞান-ক্ষুধার অন্ন স্বরূপ; তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রাণস্বরূপ। আমরা ভারতেও এই চিত্র দেখিতে পাই। এখানে যে রাজশাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে এই সম্বাদ পত্রের জ্ঞানধ্বনি তত প্রবল নহে বটে, কিন্তু একেবারেও বলহীন নহে। ইহা দ্বারা যে কিছুই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এমত নহে।

ইংলণ্ডে যেমন সম্বাদপত্র রাজ্যের অন্যতম প্রধান বলস্বরূপ, ভারতে এই বল তত প্রবল না হউক, ইহা দ্বারা আমাদিগের একটী প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহা আমাদিগের রাজকর্ম্মচারিগণকে অনেক দূর শাসনে রাখে। ইংলণ্ডে এই সম্বাদ পত্র যতদূর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, এখানে ততদূর না করুক, তাহার কিয়ৎপরিমাণও করিয়া থাকে। এখানেও আমরা ইহাতে রাজকার্য্যাদির পর্য্যালোচনা করি। এই পর্য্যালোচনার যথেপ্সিত ফল না হউক, তাহার কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চয় ফল দর্শে। কিন্তু বাস্তবিক কি ইংরাজ-রাজ্যের প্রধান বল— সম্বাদ পত্র এবং পার্লে-

মেণ্টের মহা প্রতিনিধিসভা? এই পট উত্তোলন করিয়া আমরা কি দৃশ্য দেখিতে পাই? এই সম্বাদপত্র এবং পার্লেমেণ্টের মহাসভার ভিতরে কাহারা বসিয়া আছেন? কোন্ লোকমণ্ডলীর জ্ঞানধ্বনি এই মহাসভায় ও সম্বাদপত্রে উত্থিত হয়? যাঁহাদিগের জ্ঞানধ্বনি ইহাতে উত্থিত হয় তাঁহারাই কি বাস্তবিক ইংরাজরাজ্যের বল নহেন। এই আবরণদ্বয় ভেদ করিয়া আমরা দেখি, একটী বৃহৎ লোকমণ্ডলী দুর্দ্দান্তভাবে মহা রাজ-নৈতিক জীবনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহারা রাজ্যের মধ্যম শ্রেণীস্থ লোক। ইঁহারাই রাজ্যের প্রধান জ্ঞান-জীবন, বল ও যন্ত্রস্বরূপ। শুধু ইংলণ্ডে কেন, এই মধ্যম শ্রেণী ইয়োরোপীয় সকল সভ্য সমাজেরই প্রধান লোকমণ্ডলী। তাঁহারাই রাজ্যের সমস্ত শাসনরজ্জু ধরিয়া আছেন। তাঁহারা জ্ঞানে, বুদ্ধিবলে, কার্য্যদক্ষতায়, এবং বহু সংখ্যায় রাজ্যের প্রধান বলস্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বিপক্ষে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? নিজে রাজারও তাহা সাধ্য নাই। এই মধ্যম শ্রেণীই ইয়োরোপীয় রাজ্য সমূহের দুর্নিবার বল ও দুর্গস্বরূপ। ইয়োরোপের যে এত উন্নতি, সেই উন্নতির প্রধান কারণ, এই মধ্যম শ্রেণীস্থ লোকের জ্ঞান ও প্রভাব। তাঁহারাই ইয়োরোপীয় সভ্যতার জন্মদাতা। ইয়োরোপীয় সমাজের সহিত পৃথিবীর অপরাপর ভূখণ্ডের সামাজিক প্রভিন্নতা এই শ্রেণী লইয়াই ঘটিয়াছে। এসিয়ার সমস্ত প্রাচ্য রাজ্যে এই শ্রেণীর অভাব হেতু, এসিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতার সহিত সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নহিলে এসিয়াস্থ রাজ্যাদি এত প্রাচীন কাল হইতে অবস্থান করিতেছে যে, উহাদিগের উন্নতি অবশ্য ইয়োরোপীয় উন্নতি হইতে আজি অনেক গুণে অধিক হইত। কিন্তু আজি ইয়োরোপীয় উন্নতির কাছে এসিয়া দাঁড়াইতে পারে না। বরং এসিয়া উন্নতি ও সভ্যতায় ক্রমশঃ হীনতর হইয়া আসিতেছে। ইহার বিশেষ কারণ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, এই মধ্যম শ্রেণীর অভাবই এসিয়ার অবনতির নিদানভূত। এসিয়াতে মধ্যবিত্ত লোক আছে, কিন্তু আমি ইয়োরোপীয় সমাজের যে মধ্যশ্রেণীর কথা বলিলাম, এসিয়ার মধ্যবিত্ত লোকের সহিত তাঁহাদিগের কোন সাদৃশ্য নাই। এই দুই লোকবিভাগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও গুণের কিছুই সাদৃশ্য নাই।

এই মধ্য শ্রেণী কাহাকে বলে, বোধ হয়, আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। তবু আমি একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহি। প্রধান প্রধান ইয়োরোপীয় সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা প্রায় সকল সমাজকে তিন শ্রেণীস্থ লোকে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীস্থ জনগণ ঐশ্বর্য্যে, মান-মর্য্যাদায়, প্রভুত্বে এবং ধনবলে উচ্চ শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ জনগণ জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে, স্বাধীনতা-প্রিয়তায়, স্বদেশানুরাগে, স্বজাতিপ্রেমে, কার্য্যশীলতায়, উদ্যোগিতায়, এবং বহুবিধ জাতীয় গুণে, উপরস্থ এবং তন্নিম্নস্থ লোকমণ্ডলী হইতে প্রভিন্ন হইয়া মধ্য শ্রেণী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণী মধ্যে অপরাপর সামান্য জনগণ অবস্থিত; ইহাদিগকে সামান্য লোকমণ্ডল কহে; ইহারা মূর্খতায়, এবং সৎগুণের অভাবে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই মধ্য শ্রেণীস্থ জনগণ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। কেহ কেহ কার্য্যগুণে ও ঐশ্বর্য্যবলে মধ্যশ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উত্থিত হইতেছেন। আবার উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণ সেই শ্রেণীর ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা ও ধর্ম্মাদির অভাব বশতঃ মধ্যশ্রেণী মধ্যে নামিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু এই মধ্যশ্রেণী সর্ব্বদাই সামান্য লোক-মণ্ডল হইতে, ইহার লোকসংখ্যা আহরণ করিতেছেন। সামান্য জনগণ মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানে ও গুণাদিতে মধ্যশ্রেণীর উপযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিতেছেন। আবার জ্ঞানের ও গুণের অভাব বশতঃ অনেক মধ্যশ্রেণীস্থ লোক পতিত হইয়া সামান্য লোক-মণ্ডল মধ্যে মিশিয়া যাইতেছেন। এই মধ্য-শ্রেণীস্থ জনগণ সর্ব্বদাই উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণের সহিত প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সেই উচ্চ শ্রেণীকে আপনাদের পুরস্কার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তল্লাভ-প্রত্যাশায় অহরহঃ নিযুক্ত আছেন। দেশ মধ্যে এই উচ্চশ্রেণীস্থ জনগণের কিছু প্রভুতা আছে বলিয়া, মধ্য-শ্রেণীস্থ জনগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের প্রভুতার বিপক্ষে নিজপক্ষ কক্ষীকৃত করিতেছেন। এই নিজপক্ষ সমর্থন কালে তাঁহারা সাধারণ লোকের স্বত্ব ও অধিকার এবং স্বাধীনতার ভাব, স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিপ্রেমিকের উৎসাহবলে স্থাপন করিতেছেন। এই যুদ্ধে তাঁহারা সর্ব্বদাই অগ্নিময় হইয়া আছেন। এই যুদ্ধে তাঁহারা সমাজের

স্বার্থ, স্বদেশের ইষ্ট, তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন। বাস্তবিক এই যুদ্ধে তাঁহারা রাজ্যের সমস্ত কার্য্য ও বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধিবল, তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগের বিলক্ষণ পরিচয় হয়। তাঁহারা অতি দুর্দমনীয় সাহসে এই ব্যাপার, এই মহাসামাজিক যুদ্ধ, সমাধা করেন। স্বদেশের মঙ্গলের নাম ধরিয়া তাঁহারা কাহাকেও তৃণজ্ঞান করেন না। তাঁহাদিগের বাক্য ও কার্য্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। তখন তাহাদিগকে রাজ্যের এক দুর্দমনীয় বল বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে—যে বলের শাসন, উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণ;—যাহার সমর্থনকারী সামান্য লোকমণ্ডল।

এই মধ্য-শ্রেণীস্থ জনগণ ইয়োরোপীয় সমাজের গৌরব-স্বরূপ। তাঁহারাই বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত আছেন; বড় বড় অধ্যাপক তাঁহাদিগের মধ্য হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহারাই দেশ দেশান্তরে বড় বড় অবদান-পরম্পরায় নিযুক্ত আছেন; তাঁহারাই বাণিজ্যার্থ দেশ দেশান্তরে বিনির্গত হইতেছেন। তাঁহারাই দেশ দেশান্তরে নানাবিধ আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারাই দেশ দেশান্তরে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারাই সৈনিক ও রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়া দেশ দেশান্তরে স্বদেশের নাম গৌরবিত করিতেছেন। ইয়োরোপের যত ভুবনবিখ্যাত মহাজনগণ, সকলই প্রায় এই মধ্যম শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা এক এক জন কার্য্যগুণে আজি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহারা এক এক জন এক এক অগ্নিরাশি,—যেখানে সে অগ্নিরাশি পড়ে, সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া যায়, তাঁহারাই ইংলণ্ডে ম্যাগনাচার্টা ও পার্লেমেণ্টের সৃষ্টিকারী এবং আমেরিকার উপনিবেশ ও ভারতরাজ্যের স্থাপয়িতা।

ইংরাজ জাতির রাজনৈতিক প্রবণতা কিরূপ, তাঁহারা কোন্ বলের শাসনে স্বদেশ মধ্যে চালিত হয়েন, এবং তাঁহাদিগের রাজনৈতিক জীবনের সারত্ব কোথায়, এই সমস্ত বিষয়, বোধ হয়, এক্ষণে অনেক দূর প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সমস্ত বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করিবেন, ততই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমাদিগের রাজনৈতিক কৌশল কিরূপ হওয়া উচিত। এই কৌশল পাতিবার অগ্রে আমাদিগের ইংরাজজাতির সভ্যতা

পর্য্যালোচনা করা উচিত, এবং ইংরাজজাতির রুচি ও প্রবণতা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখা উচিত। এরূপ না বুঝিয়া যদি আমরা কার্য্য-কৌশল অব-ধারণ করি, তাহা হইলে আমাদিগের পদে পদে বিফল হইবার অনেক সম্ভাবনা।

ইংরাজ জাতি কতদূর সম্বাদপত্র-প্রিয়, তাঁহারা সাধারণ জ্ঞানধ্বনির (Public Opinion) কতদূর সমাদর করেন, সেই জ্ঞানধ্বনির শাসনে কতদূর চালিত হন, তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমাদিগের এই সম্বাদ পত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের সম্বাদপত্রের সমাদর আরও বৃদ্ধি করা উচিত। এই সমস্ত পত্র যাহাতে রীতিমত চলে, তদ্বিষয়ের বন্দোবস্ত করা উচিত। ইহাদিগের রাজ-নৈতিক মূল্য যত অধিক, এক্ষণে আমরা তত অধিক মূল্য বুঝিতে পারি নাই। এদেশীয় সম্বাদপত্রকে যতদূর উৎসাহ দান করা উচিত, আজিও আমরা ততদূর উৎসাহদান করি না। এই সম্বাদপত্র হইতে আমাদিগের আর একটী আনুষঙ্গিক উপকার লাভ হইতে পারে। আমাদের বিচ্ছিন্ন সমাজকে ইহা এক সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে। একতা-স্থাপন-পক্ষেও ইহা একটী মহৎ উপায় হইতে পারে। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ইহা বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ। ইংলণ্ডে সম্বাদপত্র-সম্পাদক রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু, এবং সমাজের শিক্ষক। এই গুরুতর কার্য্যভার আমরা কাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছি? ভারতে দেশীয় লোক দ্বারা চালিত ইংরাজী সম্বাদ পত্র কয়খানি আছে? তন্মধ্যে কয়খানিই বা উপযুক্ত লোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে? আমাদিগের দেশীয় ভাষালিখিত সম্বাদপত্রের অবস্থা কিরূপ? ভারতের প্রধান প্রধান সর্ব্বস্থানে কি সুচালিত সম্বাদপত্র আছে? এক্ষণে আমাদিগের এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত প্রশ্নের রাজনৈতিক মূল্য এক্ষণে অনেক অধিক দাঁড়াইয়াছে।

আমাদিগের প্রথম রাজনৈতিক অভাব বলিয়া আমি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, সম্বাদপত্র দ্বারা সেই অভাব-মোচন যে, অনেকদূর সম্ভবিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এদেশে এখনিই যে কতিপয় সম্বাদপত্র প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা এক্ষণে এই অভাব অনেকদূর মোচন হইতেছে।

কিন্তু সেই সংবাদপত্রের সংখ্যা অতি অল্প। তন্মধ্যে অনেক সংবাদপত্র উপযুক্ত হস্ত দ্বারা সম্পাদিত হয় না। কোন কোন পত্র দল-বিশেষের স্বার্থ-সমর্থনার্থ নিযুক্ত। কোন কোন সংবাদপত্র কেবল নীচতাব্যঞ্জক গালি দিতেই পটু; তাহাতে সারগর্ভ কথা অল্পই থাকে। এই সংবাদপত্রের সংখ্যা ও যোগ্যতার বৃদ্ধি করা উচিত। আমাদিগের সংবাদপত্রের উৎসাহ নাই। তাহাদিগের গ্রাহকসংখ্যা অতি অল্প। সংবাদপত্রের আয় এত অধিক হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা সম্পাদক কেবল তাহাতেই আবদ্ধ থাকিতে পারেন। তাঁহার কার্য্য যেরূপ গুরুতর, তাঁহার কার্য্যে যেরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন, যেরূপ বিদ্যালোচনার প্রয়োজন, যেরূপ বহুদর্শিতা, বিজ্ঞতা, বুদ্ধিচালনা ও চিন্তার প্রয়োজন, অন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে, এ সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে। এদেশীয় কয়খানি সংবাদপত্রের আয় এত অধিক যে, তাহাতে সম্পাদকগণ অন্য ব্যবসায়ে নিরপেক্ষ হইয়া চালাইতে পারেন? সুতরাং এদেশীয় অনেক সংবাদপত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাহাদিগের সমাদরও নাই।

শুধু সংবাদপত্র নহে, এদেশে সাময়িক পত্রেরও বিলক্ষণ অভাব। কয় খানি ম্যাগেজিন, রিভিউ প্রভৃতি উচ্চদরের রাজকার্য্য-সমালোচন-পত্র দৃষ্ট হয়? আজি কালি বাঙ্গালাতে যে কয়েকখানি সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে রাজ-সম্পর্কীয় প্রস্তাব কি কখন লিখিত হয়? তাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ের গন্ধমাত্রও থাকে না। তাহাদিগের সম্পাদকগণ কেবলই সাধারণ সাহিত্য, কবিতা ও উপন্যাস লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু এই সকল কাগজে কি রাজকার্য্যের সমালোচন, রাজনৈতিক কৌশলের পর্য্যালোচনা প্রভৃতি উচ্চদরের প্রস্তাব সকল এবং সাময়িক ঘটনা সকলের উপর পরিণত ও বিজ্ঞতম অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে? এদেশে যে সমস্ত সাময়িক পত্র প্রচলিত আছে, তাহাদিগের রাজনৈতিক মূল্য কিছুই নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। তদ্দ্বারা যে একটী মাত্র দূরবর্ত্তী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা আমি পরে বলিব। অনেকে বলেন, আমাদিগের রাজনৈতিক বিষয় গ্রহণ করা, এবং তৎসম্বন্ধে কোন উক্তি করা অরণ্যে রোদন করা মাত্র। কিন্তু এ কথা প্রকৃতপক্ষে খাটে না। আমাদিগের

সকল কথাই কি অরণ্যে রোদন হয়? সে দিনকার মুদ্রাযন্ত্রের নববিধান কেন উঠিয়া গেল? আর আমাদিগের সকল কথাই যে সারবান্, তাহা কে বলিল? আর মনে করুন, যদিই আমাদিগের কথা গ্রাহ্য না হয়, কিন্তু রাজকার্য্য বিষয় সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিলে যে, ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারিগণের পীড়ন ও ভ্রম অনেকদূর নিবারণ হইতে পারে, এবং তাহাদিগের রাজকার্য্যের উপর শাসন থাকে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

আমাদিগের প্রথম রাজনৈতিক অভাব মোচন জন্য আমি এই একটী মাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহা যে প্রধান উপায়, তাহা বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য উপায়ও অনেকের মনে উদ্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু আমি আর অন্যান্য উপায় ভাবিবার সময় পাই নাই।

আমাদিগের দ্বিতীয় রাজনৈতিক অভাব,—ইংরাজরাজত্বে সুখভাগের বৃদ্ধি করা। যে রাজত্বে থাকিতেই হইবে, সে রাজত্বে সুখে থাকিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আমরা স্বীকার করি, প্রজামণ্ডলীর সুখবৃদ্ধি জন্য ইংরাজগণ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহাদিগের অনেক ব্যবস্থা সামাজিক সুখের জন্য বিধানিত হইয়াছে। তাহাদিগের রাজশাসন শুদ্ধ সামাজিক উপদ্রব ও পাপাচার নিবারণার্থই নিয়োজিত নহে; সেই শাসনে যাহাতে সকলে সুখে থাকিতে পারে, এমত বিধান সকলও বিধিবদ্ধ এবং উপায় সকল অবলম্বিত হয়। তাহাদিগের পূর্ত্তবিভাগ, ও পবলিকওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, নিয়ত দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর আছে। কিন্তু যাহা রাজপুরুষেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং দয়াপূর্ব্বক করেন, তাহাই সুখের শেষ নহে। যাহাতে শুদ্ধ আমাদিগের মঙ্গল, যাহাতে আমাদিগেরই সুখ বৃদ্ধি হইবে, সে কার্য্যে আমাদিগের যতদূর প্রয়াসী হওয়া উচিত, পরের মুখাপেক্ষায় না থাকিয়া, আপনারাই সচেষ্ট হইয়া তাহার অনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়া যতদূর আমাদিগেরই উচিত, পরের ততদূর ঔচিত্য হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের এতদূর নিশ্চেষ্ট ভাব, যেন সে কার্য্যভার কিছুই আমাদিগের নহে। আমরা পরের উপর সে ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। আমরা যদিও কোন বিষয় আপনা হইতে চেষ্টা করি, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত সুসম্পন্ন করিতে পারি না। যাহা আপনাদের

প্রয়াসে সুসম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহাতেও আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সমাধা করিতে পারি না। কোন বিষয় স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে এখনও আমাদিগের ক্ষমতা হয় নাই। কিন্তু স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শিক্ষা-দাত্রী। স্বাধীনভাবে, আত্মনির্ভর না করিয়া কার্য্য করিলে, কার্য্যবিষয়ক স্বাধীনতা কখনই লাভ করা যাইবে না। এমন অনেক কায আছে, যাহা সামাজিক সুখের জন্য, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য আমরা নিজেই করিতে পারি; সে সমস্ত কার্য্য আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করা ও রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহা গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না, যাহার জন্য নূতন নূতন রাজনৈতিক বিধান আবশ্যক, তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে লাভ করিবার জন্য সতত আমাদিগের চেষ্টা নিয়োজিত থাকা চাই। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের এই কয়েকটী অভাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

১। গবর্ণমেণ্টকে আপনাদিগের অভাব জানাইবার জন্য প্রতিনিধিত্বের আবশ্যকতা।

২। গবর্ণমেণ্টের রাজ-বিধান-কার্য্যে আমাদিগের কিয়ৎপরিমাণে অধিকার লাভ করা আবশ্যক।

৩। গবর্ণমেণ্টের সাধারণ-হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে আমাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য-দান ও তাহার অনেক দূর আপনাদিগের হস্তে লওয়া আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে প্রতিনিধিত্ব দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। দেশীয় সাময়িক ও সম্বাদপত্র, এবং পার্লেমেণ্টের মহাসভা এই প্রতিনিধিত্ব-কার্য্যে ব্রতী আছেন। দেশীয় সম্বাদ-পত্রের প্রতিনিধিত্ব প্রজাগণের ইচ্ছাকৃত; পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। সাময়িক ও সম্বাদ-পত্রের প্রতিনিধিত্ব বলিতে গেলে, প্রজাগণ জোর করিয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্ট নিজে ইহা চাহেন নাই; কিন্তু যখন ইহা আছে, তখন গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাইতে পারেন না। অনিচ্ছা থাকিলেও, এ প্রতিনিধিত্ব কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে। অতএব রাজ্যমধ্যে সাময়িক ও সম্বাদপত্রের প্রতিনিধিত্বের যে কোন ফলোপধায়িতা ও উপকারিতা নাই, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। প্রতিনিধিত্ব-কার্য্য সাময়িক ও

সম্বাদপত্র দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাময়িক ও সম্বাদ-পত্রের সম্পাদন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, তদ্দ্বারা ত্রিবিধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাহারা রাজ্যের একটী শাসন-যন্ত্র এবং অত্যাচার-নিবারণের প্রধান উপায়, তাহারা প্রজামণ্ডলীর মুখস্বরূপ ও প্রতিনিধি, এবং সাধারণ জনগণের শিক্ষাগুরু ও উন্নতির পথপ্রদর্শক। ভারতবর্ষে এক্ষণে এইরূপ ত্রিবিধ-উদ্দেশ্য-সাধনের নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা সাময়িক ও সম্বাদ-পত্রকে এই উদ্দেশ্য-সাধনে বরণ করিব। এই পত্র আমাদিগের প্রথমোক্ত অভাব-মোচনে কত দূর সক্ষম, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি বুঝাইতে চাহি যে, প্রজামণ্ডলীর মুখস্বরূপ ও প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া ইহা আমাদিগের দ্বিতীয় রাজনৈতিক অভাবমোচনেও অনেকদূর সমর্থ। বিশে-ষতঃ যখন ভারতরাজ্যে ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান নাই, যখন কোন প্রতিনিধি সভা দ্বারা আমাদিগের রাজকার্য্যের মন্ত্রণা ও বিচার হয় না, যখন এরূপ সভার প্রত্যাশা বহুদূর, তখন আমরা যতদূর পারি, সাময়িক ও সম্বাদ-পত্রকে আমাদিগের প্রতিনিধিত্ব-কার্য্যে নিযুক্ত করিব। রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব ও মন্ত্রণা গ্রহণ না করেন, আমরা আস্তে আস্তে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করিব। অতএব ভারতবর্ষে এক্ষণে সাময়িক ও সম্বাদপত্রের মূল্য অত্যন্ত অধিক। ব্রিটিশরাজ্য অপেক্ষা এখানে ইহার মূল্য দ্বিগুণতর। আমরা যে এত যত্ন পূর্ব্বক ইংরাজী শিক্ষা করিতেছি, তাহা কি বৃথা হইবে? তদ্দ্বারা কি একটীও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব না? সেই বিদ্যাকে কি শুদ্ধ আমরা অর্থকরী বিদ্যা করিয়া রাখিব? আমাদিগের ইংরাজী বিদ্যা এই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব-কার্য্য-পক্ষে কতদূর উপকারে আসিতে পারে, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতবাসী দ্বারা যে দুই এক খানি ইংরাজী সম্বাদ-পত্রিকা সম্পাদিত ও চালিত হইয়া থাকে, তাহাতেই আমার কথার যাথার্থ্য অনেকদূর প্রতিপন্ন হইতেছে; তাহাতেই আমরা ইহার রাজনৈতিক মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে, তদ্দ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। সকলের

যোগ্যতা ততদূর নাই। কোন কোন পত্র দল অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষপাতী। অনেক অকর্ম্মণ্য কাগজকেও আমরা প্রশ্রয় দিই। কোন সাময়িক পত্র আমাদিগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। আমাদিগের সাময়িক পত্রাবলিকেও এই উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত করা উচিত। দেশীয় ভাষায় যে সমস্ত সাময়িক ও সম্বাদপত্র চালিত হয়, তাহার অভিপ্রায় অনুবাদে কোন ইংরাজী কাগজ নিয়োজিত নাই। এরূপ অভিপ্রায় অনুবাদের রাজনৈতিক মূল্য আমাদিগের ইংরাজী কাগজের সম্পাদকগণ হয় বুঝেন না, না হয়, তাঁহারা তাঁহাদিগের পত্রে তজ্জন্য স্বতন্ত্র স্থান দিতে পারেন না। অথবা সে কার্য্য সম্পাদনের জন্য, যে স্বতন্ত্র পরিশ্রম ও সহায়তার আবশ্যক, হয় সে পরিশ্রম-স্বীকারে তাঁহারা কাতর, না হয়, তজ্জন্য সহায়তা প্রাপ্ত হন না। কিন্তু কথা এই, এরূপ অনুবাদের কি রাজনৈতিক প্রয়োজন নাই? গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক কি আমাদিগের সমুদায় প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন? তিনি শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেই নিয়োজিত। তাঁহা দ্বারা আমাদিগের বৃহৎ প্রয়োজন কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং এজন্য আমাদিগের স্বতন্ত্র উপায়ের আবশ্যক, এজন্য আমাদিগের স্বতন্ত্র পত্র স্থাপন ও প্রচালন করা আবশ্যক। যদি নিজ আয়ে সে পত্র না চলে, তাহার ব্যয়, সমুদায় সমাজের দেওয়া আবশ্যক।

যাহাতে রাজ্যের ও প্রজাগণের সুখবৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে আমাদিগের ইংরাজরাজ অত্যন্ত অনুকূল। সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রস্তাবে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন তাঁহাদের হস্তাবলম্ব প্রসারিত করিতে প্রস্তুত, এমত অন্য কার্য্যে নহে। তাঁহারা এজন্য সাহায্য দিতে কখনই বিমুখ নহেন। অনেক স্থানের মিউনিসিপাল গবর্ণমেণ্ট প্রজাহস্তে অনেকদূর সমর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা এই গবর্ণমেণ্ট কেমন সম্পাদন করি, তদুপরি এই কার্য্যভার সমর্পণের বিমৃশ্যকারিতা নির্ভর করিতেছে। কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জেলার মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য কি এদেশীয়গণ তত পারগতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন? আমরা এই কার্য্যে যত যোগ্যতা দেখাইব, ইহাতে যত

মনোযোগ দিব, তত আমাদিগেরই লাভ। এই যোগ্যতার উপর আমাদিগের আর একটী ভবিষ্য রাজনৈতিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে, আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য রাজকার্য্যে ও রাজমন্ত্রণায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ইহাতে যদি আমরা সুখ না পাই, আমরা কি মুখে অন্য অধিকারের প্রার্থী হইতে পারি? ইংরাজগণই বা কেন অন্য গুরুতর কার্য্যভার আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন?

আর এক স্থলে আমাদিগের যোগ্যতা দেখাইবার আবশ্যকতা হইয়াছে। এক্ষণে ইংরাজরাজ প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের রাজসভায় দেশীয় সদস্য গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ হিতকর প্রস্তাবে তাঁহাদিগের মন্ত্রণা গ্রহণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের কথায় যদি সুযুক্তি থাকে, তাঁহাদিগের মন্ত্রণায় যদি সদ্ভাব থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন? সুযুক্তি ও সুমন্ত্রণা যে স্থান হইতে আসুক না কেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা কখনই উপেক্ষা করেন না; করিতেও পারেন না। সংখ্যায় ন্যূন বলিয়া আমাদিগের চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে। আমরা যত দূর পারিব, আপনাদিগের স্বার্থের জন্য, রাজ্যের সুখের জন্য উদ্যোগী হইয়া মন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করিব। একবার বিফল হই, তাহাতে ক্ষতি নাই। সময় সময় আমাদিগের গবর্ণর বদলি হইতেছেন। যাহা ক্যাম্বেলের কাছে সুব্যবস্থা বলিয়া নির্ণীত না হইতে পারে, তাহা হয় ত ইডেনের কাছে সুব্যবস্থা বলিয়া গণনীয় হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ পরিবর্ত্তন আমাদিগেরই সুবিধার কারণ। সময় ও লোক বুঝিয়া কেবল প্রস্তাব করা আবশ্যক। লিটনের সময়ে যে মুদ্রাযন্ত্রের নববিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, রিপনের কৃপায় তাহা উঠিয়া গেল। আমাদিগের সমুদায় গবর্ণমেণ্টই সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কি স্থানীয় গবর্ণর, কি গবর্ণর-জেনারল, কি সেক্রেটরি অব ষ্টেট সকলই মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের রাজশাসনপ্রণালী এবং কৌশলেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমাদিগের বেণ্টিক ও মেকলে যে উচ্চশিক্ষার বিধান করিয়া গিয়াছেন, ক্যাম্বেলের মত লোক তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিতেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু একবার যাহা প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া সুসাধ্য নহে। তাহাতে অনেক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়।

অতএব এই রাজ-পরিবর্ত্তন হেতু আমাদিগের মন্ত্রণা-দানের অনেক সুবিধা ঘটিতে পারে। ইহাকে আমাদিগের সুবিধা-সাধনোপযোগী করিয়া লইব। লোক ও সময় বুঝিয়া সকল বিষয়ের প্রস্তাব করিব। তাহা হইলে আমাদিগের অনেক দূর কৃতকার্য্যতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য্যতা আমাদিগের রাজসভার দেশীয় সভ্যগণের যোগ্যতা, উদ্যোগ, কৌশল ও কার্য্যশীলতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যত উদ্যোগী, কৌশলী ও কার্য্যশীল হইবেন, আমরা রাজকার্য্যের মন্ত্রণা-সম্বন্ধে, এবং নূতন নূতন সাধারণ হিতকর ব্যবস্থা-স্থাপন-সম্বন্ধে ততই কৃতকার্য্যতা লাভ করিব।

এক্ষণে আমাদিগের রাজনৈতিক অভাবের তৃতীয় সর্গে উপস্থিত হই লাম। আমাদিগের তৃতীয় অভাব জাতীয় চরিত্র-বল। এই চরিত্র-বল কিরূপে সৃজন হইতে পারে, তাহাই আমার এক্ষণে বিবেচ্য বিষয়। এক্ষণে আমাদিগের জাতীয় চরিত্র-বল কিছুই নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। বহুকালের অধীনতায় আমাদিগের প্রকৃতি এত মৃদু, নিস্তেজ ও কোমল হইয়া গিয়াছে যে, আমাদিগের সমস্ত জাতিকে একটী বৃহৎ স্ত্রীজাতি বলিলে অযথা কথা বলা হয় না। মুসলমান-রাজত্বের পূর্ব্বেও ভারতে অধীনতা যত নিম্ন স্তরে গিয়াছিল, এবং এই অধীনতার প্রভাবে যত দূর জাতীয় দুর্ব্বলতা সংসাধিত হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয়, আর কোন খানে হয় নাই। এখানে অধীনতা এক প্রকার ছিল না; এখানে অধীনতা নানা আকারে জাতীয় তেজ হ্রাস করিয়াছিল। অবশেষে মুসলমানগণের রাজনৈতিক অধীনতায় যাহা ছিল, একেবারে তাহার সমুদায় তেজ হরণ করিল। জাতীয় অধঃপতন সম্পূর্ণ হইল। বাস্তবিক অধীনতাই প্রাচ্য সভ্যতার প্রধান ধর্ম্ম। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সহিত প্রাচ্য সভ্যতার তুলনা করিলে, এই বিভিন্নতা স্পষ্টাক্ষরে প্রতীত হইতে থাকে। ভারতে কেন—কি চীন, কি তাতার, কি পারস্য, সর্ব্ব প্রাচ্য দেশেই অধীনতাই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। "মানবজাতি যখন অসভ্য অবস্থায়

অবস্থিত থাকে, তখন তাহাদিগকে শাসনাধীনে আনিয়া বশীভূত রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যতদিন এই বশ্যতা ও অধীনতা নিতান্ত দাসত্বে পরিণত না হয়, ততদিন জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু রাজকীয় অধীনতা যখন ঘোর দাসত্বে পরিণত হয়, তখন হইতে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। রাজ্যতন্ত্র এরূপ হওয়া চাই, যেন বর্ত্তমান শাসন ও ব্যবস্থাবলি ভবিষ্য উন্নতির পথ রুদ্ধ না করে। যে স্থলে এরূপ ভবিষ্য-উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে, সে স্থলে ক্রমশঃ ঘোর রাজকীয় অধীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। এই মর্ম্মভেদী ঘটনা ইতিহাসের অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারত ও মিশরের পুরোহিত জাতির প্রভুত্ব, চীন-রাজ্যের জনকের আধিপত্য আদৌ সেই সেই রাজ্যকে অনেকদূর সভ্যতা-মার্গে উন্নীত করিয়াছিল। এই উপায়ে প্রথমে সেই সেই রাজ্যের অনেক সুশৃঙ্খলা ও উন্নতিসাধন হইয়াছিল। কিন্তু এই উপায়ে সেই সেই রাজ্য, যে উন্নতিসীমায় উত্থিত হইয়াছিল, এবং যে সীমা অতিক্রম করিলে, সেই দুই প্রভুত্বের বিনাশ হইত, সমস্ত রাজকীয় ব্যবস্থার গণ্ডগোল ও মহা বিশৃঙ্খলা ঘটিত, সেই সীমায় উন্নত হইয়া একদা চিরদিনের জন্য সেই সেই রাজ্য দণ্ডায়মান ছিল। এই উন্নতি-সীমায় আসিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই।" এই সীমায় উপনীত হইয়া ভারতে ব্রাহ্মণগণের বল বিক্রম প্রভূত হইয়া উঠিল। ভারতের অধীনতা পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শনৈঃ শনৈঃ সেই অধীনতার বৃদ্ধি হওয়াতে, ভারত একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ভারতের জাতীয় পতন সম্পূর্ণ হইল। ভারত-পতনের সমস্ত কারণ অন্যান্য প্রাচ্য দেশে বিদ্যমান নাই বলিয়া, তাহারা আজিও দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহারা দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। তাহাদিগের উন্নতির আর বৃদ্ধি নাই, তাহাদিগের সভ্যতার আর উন্নতি নাই। তাহাদিগের সভ্যতা যে যে পথে উঠিয়াছিল, কিয়দ্দূর উঠিয়াই দণ্ডায়মান আছে। সমস্ত প্রাচ্য রাজ্যের সভ্যতার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, সকলেতেই জাতীয় অধীনতা বিদ্যমান আছে।

আমি পূর্ব্বে আরও বলিয়াছি যে, প্রাচ্যরাজ্যের সহিত প্রধান প্রধান ইয়োরোপীয় রাজ্য সমুদায়ের তুলনা করিলে, পরিদৃষ্ট হইবে যে, ইয়োরোপীয়

রাজ্য সমুদায় মধ্যে একটী মধ্য শ্রেণীর প্রকাণ্ড লোক-বিভাগ অত্যন্ত বল-বীর্য্যশীল হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ মধ্যশ্রেণী প্রাচ্যরাজ্য মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি উপরে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে এই-রূপই ঘটিবার সম্ভাবনা। যেখানে ঘোর অধীনতা, সেখানে কেবল দুই দল বর্ত্তমান থাকিতে পারে; এক দল প্রভুত্ব করিবে, অন্য দল তাহাদিগের অধীনতার বশবর্ত্তী থাকিবে। যাহারা প্রভুত্ব করে, তাহারা অধীনস্থ দলকে বাড়িতে দেয় না,—তাহাদিগকে সর্ব্বথা দাবিয়া রাখে। সমস্ত প্রাচ্য রাজ্যের এই সামাজিক অবস্থা। এখানে তিন দল লোকের বিদ্যমানতা সম্ভবে না। যে সমাজে স্বাধীনতা আছে, সেই সমাজেই কেবল তিন দল লোকের অবস্থান সম্ভবে। এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হেতু যে সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়, সেই উন্নতির নেতৃস্বরূপ যাঁহারা সেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য সমাজের মধ্যে প্রধান ও বৃহৎ দল হইবেন। বলিতে গেলে, তাঁহারাই সমাজের জীবন-স্বরূপ। কিন্তু এই দলের মত্ততা, তাঁহাদিগের প্রবলতার আধিক্য, তাঁহাদিগের বীর্য্যের দমন জন্য, এবং সামাজিক শৃঙ্খলা-স্থাপন জন্য, একটী উচ্চ-শ্রেণীস্থ লোকেরও আবশ্যকতা হইয়া উঠে। আবার যাহারা সেই দল হইতে বিচ্যুত হয়, অথবা ক্ষমতাহীনতা ও অজ্ঞতা হেতু সেই দলে উঠিতে না পারে, তাহারা অবশ্য সমাজ মধ্যে নিম্নতর একটী তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইয়োরোপীয় মধ্যশ্রেণীর উৎপত্তি এইরূপ সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত হইয়া থাকে।

অধীনতা মানব-প্রকৃতিকে নিস্তেজ ও মৃদু করিয়া ফেলে। স্বাধীনতা মানব-প্রকৃতির স্ফূর্ত্তিসাধন করে। অধীনতা হইতে মৃদুতা সঞ্জাত হয়, স্বাধীনতা হইতে উৎসাহ, সাহস, বল ও বীর্য্য উদয় হইতে থাকে। অধীনতা মানবকে দুর্ব্বল করে, স্বাধীনতা মানবকে সবল করে। যাহা একজন মানবের পক্ষে সত্য, তাহা সমগ্র জাতির পক্ষেও সত্য। কারণ, একটী সমগ্র জাতি প্রতি ব্যক্তির সমষ্টি-মাত্র। এই জন্য, আমরা অধীন-জাতি-মধ্যে যত মৃদু ধর্ম্ম দেখিতে পাই; আর স্বাধীন-জাতি-মধ্যে যত উগ্র ধর্ম্মের প্রাবল্য দেখি। ভারতবর্ষীয়গণ নিতান্ত মৃদু ও মেষপালের ন্যায়

নিরীহ, কিন্তু ব্রিটিশ জাতি উদ্যোগী, সাহসী ও বীর্য্যবান্। ভারতবর্ষীয়-গণের চরিত্র-বল কিছুই নাই, ব্রিটিশ জাতির চরিত্র-বল অতি দুর্দ্দমনীয়।

ভারতবাসীগণের চরিত্র-বল স্বজন করিতে হইলে, তাহাদিগকে ইয়োরোপীয় সমাজের স্বাধীনতাকে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজকে এই স্বাধীনতার ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইবে। স্বাধীনতার ভাব প্রতি জনের মনে বাগ্মীর অগ্নিময় বাক্যে সঞ্জাত করিয়া দিতে হইবে। আমরা এক্ষণে যেমন সর্ব্ব বিষয়ে অধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া আছি, সে অধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা কি পরিবার-মণ্ডলে, কি সমাজ-মধ্যে, সর্ব্বস্থলেই ঘোর অধীনতায় বাস করিতেছি। এই অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীনতার ভাবে সম্পূর্ণরূপে অনুবিদ্ধ করিতে হইবে। স্বাধীনতাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক করিতে হইবে।*

এক্ষণে বোধ হয়, আপনাদিগের প্রতীত হইতেছে যে, ইয়োরোপীয় সমাজের মধ্যশ্রেণীর মত ভারতে একটী মধ্যশ্রেণী স্বজন করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। এই মধ্যশ্রেণী সৃষ্ট না হইলে জাতীয় চরিত্র-বল সৃষ্ট হইবে না, ইয়োরোপীয় মধ্য-শ্রেণীর জাতীয় ধর্ম্ম কি কি, তাহা আমাদিগের পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। কি কি কারণে ও প্রভাবে সেই গুণাবলির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ পর্য্যালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, শুদ্ধ স্বাধীনতানুরাগই ইয়োরোপীয়গণের মধ্যশ্রেণীর জাতীয় চরিত্রোৎপত্তির এক-মাত্র কারণ নহে, সাধারণ উচ্চশিক্ষাও অন্যতর কারণ। শুদ্ধ ইয়োরোপ-সমাজে আমরা সাধারণ উচ্চশিক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাই। সেখানে সাধারণ সকল লোকেরই নিকট উচ্চশিক্ষার দ্বার বিমুক্ত রহিয়াছে। সাধারণ সর্ব্বজনেই উচ্চশিক্ষাকে আদরণীয় জ্ঞান করেন। স্বাধীনতার সহিত বিদ্যাদেবীর সম্মিলনের এই ফল। প্রাচ্যরাজ্যে এরূপ ফল দর্শে নাই; কারণ, সেখানে বিদ্যার সহিত স্বাধীনতার মিলন হয় নাই।

---

* লেখক তাঁহার "সমাজ চিন্তা" নামক গ্রন্থেও এই মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাচ্য সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণ প্রায় মূর্খতায় সমাচ্ছন্ন। ভারতে এই মূর্খতা কত প্রবল ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নিম্নশ্রেণী মধ্যে বিদ্যালোচনা প্রবর্ত্তিত ছিল না। সমস্ত বিদ্যা ব্রাহ্মণজাতি-মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইয়োরোপীয় সভ্যতা—বিদ্যালোচনার অধিকার সর্ব্বসাধারণকে প্রদান করিয়া, এত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। সেই সভ্যতার দিন দিন উন্নতি-সাধন হইতেছে। বিদ্যা ও জ্ঞান-রাজ্যের সীমা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। জ্ঞানের সহিত জাতীয় বলের বৃদ্ধি হইতেছে। কারণ, মানবজাতির জ্ঞানই প্রধান বল। ইয়োরোপীয়গণ বুদ্ধিবলে ক্রমশই বলবান্ হইয়া উঠিতেছেন। "জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি" এ কথা কেবল ইয়োরোপীয় সমাজেই প্রামাণ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে সেই জ্ঞান ও বুদ্ধি অনেক স্থলে ব্রাহ্মণচাতুরীর অস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছিল। কুবিষয়ে প্রযুক্ত হওয়াতে, তাহাতে কুফলই উৎপন্ন করিয়াছিল। ইয়োরোপে স্বাধীনতার সহিত জ্ঞান ও বুদ্ধির যোগ হওয়াতে, তাহাদিগের ক্রমশই স্ফূর্ত্তি ও বলবৃদ্ধি হইতেছে। জ্ঞান ও বিদ্যা সর্ব্বসাধারণ জন-গণ-মধ্যে বিস্তারিত হইয়াছে; সমগ্র জাতির উন্নতিসাধন করিতেছে। সর্ব্বজাতীয় প্রকৃতিকে উন্নত ও বলবতী করিতেছে। অতএব আমাদিগেরও জাতীয় বল স্বজন করিতে হইলে, এই উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, আমাদিগের জাতীয়বল-স্বজন-পক্ষে এই দুইটী বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদিগের সর্ব্বসাধারণ জনগণ মধ্যে স্বাধীনতার ভাব উদ্রেক করিয়া দেওয়া উচিত, এবং যতদূর সাধ্য উচ্চশিক্ষার বিস্তার করা আবশ্যক। স্বাধীনতা-শব্দে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতার কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য, এবং উচ্চশিক্ষা শব্দ ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

জাতীয় উন্নতি ও চরিত্র-সৃষ্টির পক্ষে এক্ষণে এই দুইটী উপায় প্রশস্ত বোধ হইতেছে। আমি বলি—অগ্রে জ্ঞান, তৎপরে কার্য্য। জ্ঞান ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। অগ্রে সমস্ত-জাতি-মধ্যে যাহাতে স্বাধীনতার ভাব সুপ্রচারিত হয়, অগ্রে বিদ্যালোচনায় যাহাতে সমস্ত-জাতি-মধ্যে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে পারে এবং যাহাতে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, এরূপ

উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে, চরিত্র-বল ক্রমশঃ স্বতই সঞ্জাত হইবে। যাহাতে স্বাধীনতার ভাব দেশ-মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, যাহাতে এই জ্ঞান-বিস্তার সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য আমি এই কয়টী উপায় স্থির করিয়াছি।

১। বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষার উন্নতির পথ আরও বিস্তারিত করা উচিত।

২। সাময়িক এবং সম্বাদপত্রের সংখ্যা ও যোগ্যতা-বৃদ্ধির প্রয়োজন।

৩। দেশীয় ভাষায় উচ্চ বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন।

৪। প্রকাশ্য লাইব্রেরী, ও সভায় সর্ব্বদাই জ্ঞানলোচনার প্রয়োজন।

৫। দেশীয় ভাষায় বাগ্মিতার প্রয়োজন।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা যথেষ্ট নহে। এই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আরও অধিক বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, এবং যাহাতে উচ্চশিক্ষা সাধারণ জনগণের অল্প ব্যয়ে ও অল্প বেতনে সম্পন্ন হয়, এমত উপায় সকল অবলম্বন করাও উচিত। স্কলার্সিপ অথবা ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ফণ্ড ও অর্থানুকূল্য করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে সাময়িক ও সম্বাদ-পত্রের দ্বিবিধ প্রয়োজনের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছি। সমাজ-মধ্যে ইহাদিগের আর একটী প্রয়োজন আছে। ইহাদিগের দ্বারা আমরা সাধারণ-জ্ঞান-রাজ্য বিস্তার করিতে পারি। ইহারা সমাজের শুধু শাসন নহে, শুধু প্রতিনিধি নহে, ইহারা সমাজের শিক্ষক ও গুরু। ইংলণ্ডে সাময়িক পত্রাবলী এক্ষণে জ্ঞানালোচনার প্রধান উপায়। ছাত্রেরা স্কুলে জ্ঞানালোচনা করে, বৃদ্ধ লোক ও অধ্যাপকেরা সাময়িক এবং সংবাদ-পত্রে জ্ঞানালোচনা করেন। এ দেশে স্কুল ছাড়িবার পরেই লোকের জ্ঞানালোচনার পথ এক রকম রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহাদিগের পক্ষে সাময়িক ও সম্বাদ-পত্র পরম উপকারী। কি লেখক, কি পাঠক, উভয়ের ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদিগের অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল পুস্তকে প্রকাশ করা উচিত। সভায় তাহার বিচার করা উচিত। সামাজিক ও রাজনৈতিক

উদ্দেশে দেশমধ্যে সভাসংস্থাপনের এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন। সামাজিক-উন্নতি-চিন্তায় পাঁচ জনে একত্রিত হইয়া পরামর্শ স্থির করা এক্ষণে যত আবশ্যক হইয়াছে, দুঃখের বিষয় এই, তদুপযোগী সমাজ সকল স্থাপিত হয় নাই। এইরূপ সভা বাগ্মিতা অভ্যাসের এবং পরিচয়েরও প্রশস্ত ক্ষেত্র। পব্‌লিক্ লাইব্রেরী রূপ প্রকাশ্য স্থলে বিদ্বজ্জনগণের একত্র সমাগমের কি শুভ ফল হয়, তাহা এডিসনের সময়ে প্রকাশিত আছে। সর্ব্বশেষে এক্ষণে আমাদিগের সমাজমধ্যে বাগ্মীর যত আবশ্যকতা, এমত আর কিছুই নহে। ভারত এখন অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাগ্মীর উত্তেজন-বাক্যে ও উদ্বোধনায় তাহাকে জাগরিত করিতে হইবে। সাধারণ-জনগণকে উদ্বোধিত করিতে হইলে, দেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করা উচিত। যাহাতে হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠে, যাহাতে লোকের মনে স্বাধীনতার ভাব জাগরিত হয়, যাহাতে সাধারণ-জনগণ স্বদেশানুরাগে পূর্ণ হন, যাহাতে লোকে উত্তেজিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বাগ্মিতার এক্ষণে যে কত প্রয়োজন, তাহা বর্ণনাতীত।

আমাদিগের এই সমস্ত অভাব যে পরিমাণে পূরণ হইবে, সেই পরিমাণে আমাদিগের সমাজে মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হইতে থাকিবে। এই মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি না হইলে, আমাদিগের জাতীয় চরিত্র-বল সৃষ্ট হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত অভাবের যতই সম্পূরণ হইতে থাকিবে, আমরা ততই দেখিতে পাইব, ভারতবর্ষে একটী নূতন জাতি নববলে বলীয়ান্ হইয়া উত্থিত হইতেছে। এই জাতির সৃষ্টি হইবার এখনই প্রারম্ভ হইয়াছে। যে সকল বীজে এই জাতি সৃষ্ট হইবে, তাহা রোপিত হইয়াছে। এই বীজ যাহাতে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, আমাদিগের এক্ষণে সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা উচিত; সেই সকল উপকরণ আনিয়া দেওয়া উচিত। আমাদিগের অভাব-মোচনের সূত্রপাত-মাত্র হইয়াছে। যে দিবসের আলোকে আমরা প্রভাসিত হইব, তাহার প্রভাত-রশ্মি দেখা দিয়াছে। আমার সম্মুখেই সেই আলোক দেদীপ্যমান। আমার সম্মুখেই সেই নবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই জাতির অভ্যুদয় শীঘ্র অথবা বিলম্বে হওয়া আপনাদিগেরই হস্তে। এই গুরু ভার যাঁহাদিগের উপর অর্পিত, তাঁহারা

কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আপনাদিগের আশাপূর্ণ, উল্লসিত ও উৎসাহের মুখ-বিকাশ দেখিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, আপনারা নিশ্চিন্ত নহেন। আপনাদিগের প্রসন্ন মুখ-বিকাশ ও প্রখর-নয়ন-জ্যোতিঃ দেখিয়া আমার আশা হইতেছে, সেই নবজাতির অভ্যুত্থানের অধিক কাল বিলম্ব নাই। আপনাদিগেরই মুখ-বিকাশে ও নয়ন-জ্যোতিতে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। এই কল্পনা-দৃশ্য যেন সত্য হয়, এই আমার প্রার্থনা।

হিন্দু-পত্নী। *

হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যজীবনকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম; দ্বিতীয়, গৃহস্থাশ্রম; তৃতীয়, বানপ্রস্থাশ্রম; চতুর্থ, সন্ন্যাসাশ্রম। এই চারিটি আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমকে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন:—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য
বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য
বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥ (৩অ-৭৭)

যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবিত থাকে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া আর সকল আশ্রম জীবিত থাকে।

যস্মাত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো
জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ (৩অ-৭৮)

যেহেতু অপর তিন আশ্রম অহরহঃ এই গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া রক্ষিত হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন
স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং
যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥ (৩অ-৭৯)

---

* সন ১২৮৯ সালে ৫ই চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যসুখ কামনা করেন, তাঁহার পরম যত্নে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা
ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্য
স্তেভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা॥ (৩অ-৮০)

ঋষিগণ, পিতৃলোক, দেবলোক, অতিথি, এবং অন্যান্য প্রাণীগণ পুত্রাদি-পরিবেষ্টিত গৃহীর নিকট আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানী গৃহস্থ ঐ সকলের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

এখানে দুইটি সার তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথম তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রম অপর তিনটি আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ; কেন না অপর তিনটি আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়াধীন। গৃহস্থাশ্রম অপর সমস্ত আশ্রমের প্রাণস্বরূপ বলিয়া সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। অপর সমস্ত আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা উপকৃত হয় বলিয়া গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রধান আশ্রম। পরোপকারের নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান। পরোপকার গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয় তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি, ইন্দ্রিয়-সংযমন। গৃহস্থাশ্রম আত্মসুখের জন্য নয়, ভোগবিলাসের জন্য নয়, যশ গৌরবের জন্য নয়। গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মচর্য্যার জন্য—পরোপকারের জন্য। অতএব শাস্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সংযমন গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি। কিন্তু এই যে আশ্রমপ্রধান গৃহস্থাশ্রম, এই যে আত্মসংযম-মূলক গৃহস্থাশ্রম, দার পরিগ্রহ ভিন্ন ইহাতে প্রবেশ করা যায় না—ভার্য্যা ব্যতিরেকে এই পরম পরোপকার ব্রতে ব্রতী হওয়া যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে এতই অধম যে জীবনসত্ত্বেও তিনি মৃত বলিয়া গণ্য। যথা ভগবান মনুঃ—

দেবতাতিথিভৃত্যানাং
পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানা
মুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥ (৩অ-৭২)

যিনি দেবতাগণের, পিতৃলোকের, ভৃত্যগণের, অতিথি এবং আত্মার সন্তোষসাধন না করেন, তিনি শ্বাস প্রশ্বাস সত্ত্বেও জীবিত নন।

কিন্তু যে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে মনুষ্যের জীবন সার্থক হয়, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, বিবাহ ব্যতিরেকে—ভার্য্যা ব্যতিরেকে সে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না।

মনু বলেন—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত
গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞ বিধানঞ্চ
পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥ (৩অ-৬৭)

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্য্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং দৈনিক পাকক্রিয়া বৈবাহিক অগ্নিতেই সম্পাদন করিবে।

এবং মহামুনি কশ্যপ বলেন—

দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা
ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন
বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ॥

গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নির্দ্দোষা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে।*

বুঝা যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ এবং উদ্দেশ্য, ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকার। হিন্দুবিবাহ ধর্ম্মের জন্য এবং সমাজের জন্য। ভার্য্যা ব্যতিরেকে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না এবং সমাজ-সেবা হয় না। বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে এ কথা বলে না বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক, ১৭২ পৃষ্ঠা।

জগতে আর কেহই ধর্ম্মচর্য্যা, সমাজসেবা ও পরোপকারের জন্য দার-পরিগ্রহ করে নাই ও করে না। আর কেহ যাহা করে নাই, একা হিন্দু তাহা কেন করে, সে কথা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে, যে বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এত দিনের পর ইউরোপে কেবল কোম্‌তের শিষ্যেরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা-লাভ করিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতের দার্শনিক ভিত্তি যাহাই হউক, সে মতটি কি এস্থলে কেবল তাহাই জানা আবশ্যক। জানা গেল যে হিন্দু-বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা ও পরোপকার। জানা গেল যে পবিত্র পরোপকার-ব্রত পালন করিবার জন্য, সমগ্র সমাজের সেবা করিবার জন্য, পবিত্র পিতৃপুরুষগণের আত্মার যথাবিহিত পূজার জন্য, জগতে মনুষ্য বল, পশু বল, পক্ষী বল, সকল প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, হিন্দু পুরুষ হিন্দু রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পবিত্র, এত প্রশস্ত, সেই বিবাহে পত্নী অথবা ভার্য্যা কি বস্তু তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু অগ্রে আর একটী কথার সংক্ষেপে নিষ্পত্তি করিব। সকল দেশেই বিবাহের অগ্রে কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হয়। নির্ব্বাচন-প্রণালী সকল দেশে এক নয়। এ দেশে পিতামাতা পুত্রের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন; এবং যে সকল দোষগুণ বিবেচনা করিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্রকারেরা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে অনেকেই এই প্রণালীর বিরোধী এবং ইংরাজি courtship প্রণালীর পক্ষপাতী। দুইটি প্রণালীর মধ্যে কোনটি ভাল, তাহা মীমাংসা করা কঠিন কি সহজ বলিতে পারি না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজসেবা, সে বিবাহের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে, যে যৌবনমদমত্ত যুবক বিবাহ করিবেন তিনি না

করিয়া, কোন বিজ্ঞ, বর্ষীয়ান্, প্রশান্তচিত্ত, ধর্ম্মশীল, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি করিলেই ভাল হয়। যে ভার্য্যাকে প্রধানতঃ পতির নিমিত্ত নয়, সমাজের নিমিত্ত সংসারে থাকিতে হইবে, সে ভার্য্যা স্বয়ং পতির দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজসেবার জন্য কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে যতগুলি বিষয় এবং যে সকল বিষয় স্থিরচিত্তে এবং বহুদর্শিতাসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, বিবাহার্থী যুবক স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিতে বসিলে ততগুলি বিষয় এবং সেই সকল বিষয় কখনই স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন না। তিনি নিজের ভাবনা যত ভাবিবেন, ধর্ম্ম বা সমাজের ভাবনা কখনই তত ভাবিবেন না। এবং সেই নিমিত্তই দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেশে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসেবা এবং আত্মতুষ্টি সে দেশে বিবাহার্থী ব্যক্তি স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। অতএব বিবাহের উদ্দেশ্য ভেদে কন্যানির্ব্বাচন প্রণালী ভেদ। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা যদি প্রধানতঃ নিজের উদ্দেশে, নিজের সুখের জন্য বিবাহ করা মহত্ত্ব মনে করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলিব যে ইংরাজি courtship প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কন্যানির্ব্বাচন-প্রণালী তাঁহারা কোথাও পাইবেন না। কিন্তু যদি তাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত, সমাজ-সেবার নিমিত্ত দার পরিগ্রহ করা তদপেক্ষা মহত্ত্ব মনে করেন, তাহা হইলে যেন একটু লোভ সম্বরণ করিয়া প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বয়োজ্যেষ্ঠদিগের হাত হইতে কন্যা-নির্ব্বাচনের ভারটি কাড়িয়া না লয়েন। মনুই ত বলিয়াছেন যে সংযতেন্দ্রিয় না হইলে সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট এবং কোন্‌টি নিকৃষ্ট, বোধ হয় তাহা মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। আত্মতুষ্টি অপেক্ষা পরোপকার যে অনেক ভাল জিনিস, বোধ হয় তাহা হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। তবে যাঁহারা আত্মোদ্দেশমূলক বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে একটি কথা বলা আবশ্যক। যেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ আত্মোদ্দেশে বিবাহ করে, অর্থাৎ স্ত্রী এই মনে করিয়া বিবাহ করে যে পুরুষ সর্ব্বরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, এবং পুরুষ এই মনে করিয়া বিবাহ করে, যে স্ত্রী সর্ব্বরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ

পরস্পরের হাবভাব আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কালযাপন করে। সেই জন্য তাহারা অপরের ভাবনা ভাবিতে অনেকাংশে অপারগ এবং অনিচ্ছুক হয়। এবং পরস্পরের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখে বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে অত্যন্ত ছিদ্রান্বেষী হইয়া সর্ব্বদাই কলহ করে এবং যার পর নাই অসুখী হইয়া পড়ে। মূর্খতা, ক্রোধাধিক্য অথবা সাংসারিক অপ্রতুলতাবশতঃ অন্য দেশেও যেমন এ দেশেও তেমনি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কলহ থাকিতে পারে। কিন্তু বোধ হয় যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রকৃত বা কল্পিত তাচ্ছিল্য লইয়া অথবা মনোযোগের কড়া ক্রান্তি কম হইয়াছে, অথবা তদনুরূপ অপর কোন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যত কলহ হয়, এ দেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। অপর পক্ষে, যেখানে বিবাহ আপনার উদ্দেশে না হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজের উদ্দেশে হইয়া থাকে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাহাদের প্রবৃত্তিও হয় না, সেখানে আত্মবিশ্লিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্য ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষ দুইজনে এক হইয়া এক মনে এক প্রাণে সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হয়। যদি তাহাতে কাহারো ত্রুটি হয়, তবেই তাহাদের মধ্যে অসুখ বা কলহের হেতু উপস্থিত হয়, নতুবা নয়। অতএব, বোধ হয় যে, আপনার উদ্দেশে যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক; এবং ধর্ম্মচর্য্যা এবং সমাজসেবার জন্য যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। যদি তাহাই হয়, তবে বিবাহার্থ স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন না করাই ভাল। স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ক্রমশঃ তাহা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়াই সম্ভব।

হিন্দু বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপযুক্ত প্রণালীতে কন্যা নির্ব্বাচিত হইলে পর বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দেখা যাউক, সেই বিবাহ-ক্রিয়া অনুসারে হিন্দু ভার্য্যা কি বস্তু হইয়া দাঁড়ান। ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহপ্রণালীতে, বিবাহ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেবল একটি চুক্তি বই আর কিছুই নয়; অতএব সেই সকল প্রণালীতে স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পরের তুল্য, কেহ কাহার বড় নয়, কেহ কাহার ছোট নয়; স্বামী ও যত বড় এক জন, স্ত্রী ও তত বড় এক জন। হিন্দুপত্নীও কি হিন্দুপতির সম্বন্ধে তাই? দেখা যাউক।

হিন্দু-বিবাহরূপ যে কার্য্য সেটি চুক্তি অথবা Contract নয়। ইংরাজি বিবাহ যেমন পুরুষ স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে এবং স্ত্রী পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে সম্পন্ন হইয়া যায়, হিন্দু-বিবাহ তেমন করিয়া সম্পন্ন হয় না। মোটা মুটি বলিতে গেলে হিন্দু বিবাহের প্রথম কার্য্য—দান ও গ্রহণ। কন্যাকর্ত্তা কন্যাটিকে বরকে দান করেন। কিন্তু সে দানের গুণে, কন্যা বরের ভার্য্যা হন না। বরের সম্পত্তি হন মাত্র। মনু বলিয়াছেনঃ——

সকৃদংশোনি পততি
সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি
ত্রীণ্যেতানিসতাং সকৃৎ॥ (৯অ-৪৭)

অংশ একবার, কন্যাদান একবার, দানবাক্য একবার—সাধুদিগের এই তিন কার্য্য একবার।

এ কথার তাৎপর্য্য এই, সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন বস্তুও যেমন একবারের বেশী দুইবার দান করা যায় না, কন্যাও তেমনি একবারের বেশী দুইবার দান করা যায় না। অতএব সম্পত্তি দান করার অর্থও যা, কন্যা দান করার অর্থও তাই। এবং প্রদত্ত সম্পত্তির উপর দানগ্রহীতার যেরূপ স্বামিত্ব জন্মে, প্রদত্ত কন্যার উপর কন্যাগ্রহীতার সেইরূপ স্বামিত্বই জন্মিয়া থাকে। আর এক স্থলে মনু এ কথা আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং
যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু
প্রদানং স্বাম্যকারণং॥ (৫অ-১৫২)

বিবাহ কালে যে স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতির উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করা হইয়া থাকে তাহা কেবল মঙ্গলের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ফলতঃ বাগ্দানই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের কারণ।

এখানে স্বাম্যের অর্থ অধিকার অথবা প্রভুত্ব বই আর কিছুই নয়। অতএব

সম্প্রদানরূপ কার্য্যের গুণে কন্যা ভার্য্যাত্ব লাভ করেন না, পতির সম্পত্তি হন মাত্র। ঘটি, বাটি যেমন সম্পত্তি, তেমন সম্পত্তি হন মাত্র। বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার একটু মানে আছে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা একা পুরুষকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া গণ্য করেন না। স্ত্রীর সহিত মিলিত যে পুরুষ তাহাকেই তাঁহারা পুরুষ বলেন। যথা ভগবান মনুঃ—

এতাবানেব পুরুষো
যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্
যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥ (৯অ-৪৫)

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুয়ের নামই পুরুষ।

এই চমৎকার কথার যে কি গূঢ় তাৎপর্য্য তাহা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। জানা গেল যে হিন্দু-শাস্ত্রকারদিগের মতে, ভার্য্যাহীন পুরুষ একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তি; ভার্য্যা ব্যতিরেকে পুরুষ পূর্ণতা লাভ করে না, পুরুষ পুরুষ হইতে পারে না। অতএব যিনি ভার্য্যা হইবেন তাঁহাকে পুরুষের সম্পত্তি হওয়া চাই, নহিলে পুরুষ কি প্রকারে তাঁহাকে নিজস্ব করিয়া তাঁহার দ্বারা তাঁহার আপনার অভাব পূরণ করিবেন? দাসখত ব্যতীত চুক্তির দ্বারা মানুষকে নিজস্ব করা যায় না। প্রভু ও ক্রীতদাস ছাড়া আর যাহাদের সম্পর্ক চুক্তিমূলক, তাহাদের মধ্যে কেহ কাহার নিজস্ব হইতে পারে না। তাই হিন্দুশাস্ত্রকার সম্প্রদানরূপ কার্য্যের দ্বারা কন্যাকে পুরুষের নিজস্ব করিয়া দিলেন। পুরুষের উপকারার্থ স্ত্রীকে ক্ষুদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। স্ত্রীর পক্ষ হইতে বলিতে গেলে এটা কি সামান্য গৌরব ও মহত্বের কথা? পতির উদ্দেশে এত আত্মত্যাগ হিন্দু রমণী বই আর কে কোথায় করিয়াছে বা করিতে পারে? কিন্তু গৌরবের কথা হইলেও, ঘটি বাটির মতন সামান্য সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া থাকা স্ত্রীর পক্ষে বড় একটা হিতকর বা সম্মানসূচক অবস্থা নয়। তাই দান গ্রহণে কেবল মাত্র সম্পত্তি সৃষ্টি হয়, ভার্য্যাত্ব জন্মে না। যাহাতে ভার্য্যাত্ব জন্মে তাহা এই:—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা
নিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া
বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥ (৮অ-২২৭)

পাণিগ্রহণের যে মন্ত্র তাহাই প্রকৃত দারলক্ষণ। সপ্তপদী গমনে সেই মন্ত্রের পরিসমাপ্তি হয়—বিজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

সপ্তপদীগমনরূপ যে একটি প্রক্রিয়া আছে, মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেইটি যতক্ষণ না সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না। এই কথার প্রকৃত অর্থ রঘুনন্দন বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

ভার্য্যাশব্দোয়ূপাহবনীয়াদিবদলৌকিকাঙ্গসঙ্গেনালৌকিক
সংস্কারযুক্তো স্ত্রীবচনঃ।

(উদ্বাহতত্ত্ব)।

যেমন যূপ বলিলে যে সে পশুবন্ধন কাষ্ঠ বুঝায় না, যেমন আহবনীয় বলিলে যে সে অগ্নিকে বুঝায় না, কোন অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন কাষ্ঠ বা অগ্নিকে বুঝায়, তেমনি ভার্য্যা বলিলে যে সে স্ত্রী বুঝায় না, কেবল সেই অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন স্ত্রীকে বুঝায়।

পশু বাঁধিবার কাষ্ঠ এবং অগ্নি দুইই অতি সামান্য জিনিস—পথের ধূলা যেমন সামান্য জিনিস, তেমনি সামান্য জিনিস—কাহারো কোন মাহাত্ম্য নাই, কাহারো কোন পবিত্রতা নাই। কিন্তু ধর্ম্মযাজক যখন সেই কাষ্ঠ অথবা অগ্নির সহিত কোন একটি অলৌকিক সংস্কার সংযোগ করেন তখন সেটি আর পথের ধুলার ন্যায় সামান্য পদার্থ থাকে না, তখন সেটি দেবতা অথবা দেবত্বের ন্যায় একটি অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে। অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ মনুষ্যবুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় না এমন পদার্থ হইয়া পড়ে; মনুষ্য বুদ্ধির কাছে রহস্যবৎ এমন অপার্থিব পদার্থ হইয়া পড়ে; মনুষ্যবুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা যাহা কিছু সম্পন্ন করা যাইতে পারে সে সকল অপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র পদার্থ হইয়া পড়ে। হিন্দু-ভার্য্যাও তাই। দানগ্রহণের গুণে যে স্ত্রী পথের ধূলার ন্যায় সামান্য ছিনি। বই আর কিছুই নয়, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি অলৌকিক সংস্কারের

অলৌকিক গুণে সেই স্ত্রী অলৌকিক সংস্কার-প্রাপ্ত অগ্নি এবং পশুবন্ধন কাষ্ঠের ন্যায় একটি পবিত্র, দেবতুল্য, অলৌকিক পদার্থ। হিন্দুপত্নী পতির সম্পত্তি বটে, কিন্তু পতির সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি অলৌকিক, অতি দেবতুল্য বস্তু। সে বস্তুর গৌরবের, সে বস্তুর মর্য্যাদার, সে বস্তুর পবিত্রতার, সে বস্তুর দেবত্বের কি সীমা আছে? ভগবান মনু শিক্ষাগুরুকে পিতামাতা অপেক্ষাও বড় বলিয়াছেন বলিয়া সেই শিক্ষাগুরুকে আহবনীয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (২অ-২৩১)। আবার রঘুনন্দন বলিলেন, আহবনীয়ও যা, হিন্দুভার্য্যাও তাই। একবার হিন্দুর জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখ, হিন্দুভার্য্যার কি পদ, কি মহিমা! যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ যাঁহার আরাধ্য দেবতা, যজ্ঞের আহবনীয় যাঁহার আরাধ্য দেবতা, তিনিই বলিতেছেন যে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠও যা, যজ্ঞের আহবনীয়ও যা, ভার্য্যাও তাই! আবার বলি, হিন্দুর চক্ষে দেখ বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুভার্য্যা পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তি বল, সবই! হিন্দুর ধর্ম্মভাবে ভোর হইয়া দেখ বুঝিতে পারিবে যে, হিন্দুভার্য্যা দেবাসনে উপবিষ্টা, দেবীপদে প্রতিষ্ঠিতা, দেবীমাহাত্ম্যে মণ্ডিতা! যতদূর পার হিন্দুর অলৌকিক শব্দের অলৌকিক অর্থ ভাবিয়া দেখ, চিত্ত এই ভাবে ভরিয়া উঠিবে, যে মানুষ যতদিন মানুষ অপেক্ষা বড় না হইবে, ততদিন হিন্দু ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব যে কি অননুভবনীয় কল্পনাতীত পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারিবে না। এখন বলি—হিন্দু ভার্য্যা হিন্দু পতির সম্পত্তি, এ কথায় লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। কেন না মনুষ্যের দেবতার ন্যায় সম্পত্তি আর কি আছে? মানুষ যদি দেবতাকে নিজের সম্পত্তি মনে না করেন, তবে কেমন করিয়া বলিব যে মানুষে দেবত্ব আছে? হিন্দুশাস্ত্রকার ভার্য্যাকে পতির দেবতা করিবেন বলিয়াই তাহাকে পতির সম্পত্তি করিয়াছেন। এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুর ভার্য্যাগ্রহণের উদ্দেশ্যও যেমন মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর, তাঁহার ভার্য্যাও তেমনি মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর। ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকারের জন্য ভার্য্যা। যেমন যজ্ঞ তেমনি তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সংসারধর্ম্মরূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন

করিতে হইলে যথার্থই দেবতার প্রয়োজন হয়। যে যেখানে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, সেই দেবশক্তির সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছে। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, হোমর, সেক্সপীয়র প্রভৃতি কবিরূপধারী মহাযাজ্ঞিকগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই এক একটি দেবতা ছিল। সেই দেবতার পবিত্র প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া, সেই দেবতার অলৌকিক উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, সেই দেবতার অপরিমেয় বলে বলীয়ান্ হইয়া, প্রত্যেকেই এক একখানি মহাকাব্য রূপ এক একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী রাজবিপ্লবোন্মত্ত মহাপুরুষেরা মাদাম রোলা-রূপী মহাদেবীর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীর মুখ চাহিয়া, পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার কোলে মাথা রাখিয়া, ভীষণ বনবাস রূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসারধর্ম্মরূপ যজ্ঞ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। সেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে অপরিমেয় দয়া, ধর্ম্ম, শক্তি এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ প্রাচীন হিন্দুরা গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি স্বরূপ ভার্য্যারূপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুভার্য্যার এই অর্থ। হিন্দুভার্য্যা কি সামান্য জিনিস!

এখন সময়োপযোগী দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোকে স্ত্রী জাতিকে অতি নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করিত এবং ঐ ধর্ম্মই প্রথম স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বোধ হয় যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না জানা হেতু এই মিথ্যা কথাটি শুধু ইউরোপে কেন, আজ কাল এদেশেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। আমি হিন্দু বিবাহ-প্রণালীর যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়া থাকি, তবে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম স্ত্রীজাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল; হিন্দুধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই,

পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। "যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"— যেখানে নারী পূজিতা হন সেখানে দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন। (মনু ৩অ-৫৬)

এ কথা যদি ঠিক হয় তবে ভাবিয়া দেখ, অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইংরাজি সাম্যবাদে ভর করিয়া, বাঙ্গালীর স্ত্রী এটি পাবে না কেন, ওটি পাবে না কেন, বলিয়া যে গোলযোগ করিয়া থাকেন, তাহা ভাল কি মন্দ, সঙ্গত কি অসঙ্গত। বাঙ্গালীর স্ত্রী দেবতা, অতএব তাঁহাকে অদেয়, এমন ভাল জিনিস কিছুই নাই। যদি বল বিদ্যা, "স্বাধীনতা" প্রভৃতি অনেক ভাল জিনিস তাঁহাকে দেওয়া হয় না; তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি, যে যাহা ভাল জিনিস বলিয়া উক্ত হয়, তাহা যদি সত্যই ভাল জিনিস হয়, তবে লোকে যখন বুঝিবে যে তাহা ভাল, এবং স্ত্রী দেবতা, তখন অবশ্যই তাহারা সে জিনিস স্ত্রীকে দিবে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার কৃতবিদ্য স্বদেশীয়-গণকে বলি, যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইংরাজি সাম্যবাদ প্রয়োগ করিও না। স্ত্রী এবং পুরুষকে সমান জ্ঞান করা যুক্তিসঙ্গত কি না, এখন তাহার মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এ কথা অকুতোভয়ে বলিতেছি, যে স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা মনে করিয়া স্ত্রীর প্রতি বিহিতাচরণ করিলে স্ত্রীর যত লাভ হইবে, তাঁহাকে পুরুষের সমান মনে করিয়া সমানের প্রতি যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য সেইরূপ করিলে, তাঁহার তদপেক্ষা অনেক কম লাভ হইবে। জাতির কথা ছাড়িয়া ব্যক্তিবিশেষের কথা ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে কি ভারতে, কি ইংলণ্ডে, কি ফ্রান্সে, যেখানেই স্বামী স্ত্রীকে যথার্থ মনের সহিত কোন কিছু দিয়াছে, সেই খানেই স্ত্রীকে হয় দেবী, নয় দেবতুল্য ভাবিয়া দিয়াছে, পুরুষের সমান অথবা সমস্বত্বাধিকারিণী ভাবিয়া দেয় নাই। স্ত্রীকে দেবতা মনে করিয়া দেবতার ন্যায় ব্যবহার করিলে, এবং দেবতার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিলে, তাঁহার যত বিশুদ্ধ সুখ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, তাঁহাকে সমান মনে করিয়া সমানের ন্যায় ব্যবহার করিলে কখনই তত সুখ এবং উন্নতি হইবে না। সাম্যবাদের বিরোধী আছে—দেবতার বিরোধী নাই। সাম্যবাদে তর্ক আছে, যুদ্ধ আছে—দেবসেবায় তর্ক নাই, যুদ্ধ নাই, সমস্তই প্রীতির আহুতি। সাম্যবাদের ফল সীমাবদ্ধ, সমান

সমান, বেশী নয়—দেবতাকে যত ইচ্ছা দাও, দেবতাকে দিয়া সাধ মিটে না, দেবোপহারের সীমা নাই। অতএব এ দেশে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাম্যবাদ অবলম্বন করিলে আমাদের যে উর্দ্ধে আরোহণ করা হইবে তা নয়, নিম্নে অবতরণ করা হইবে; এবং আমাদের স্ত্রীদিগকে দেবীমণ্ডপ হইতে নামাইয়া রসাতলে নিক্ষেপ করা হইবে। এক্ষণে বাঙ্গালীর স্ত্রীর যে কোন দুঃখ নাই, এমন কথা বলি না। দুঃখ অনেক আছে। কিন্তু দেশের লোক যত শিক্ষা লাভ করিবে এবং হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে হিন্দু স্ত্রী কি পদার্থ তাহা যত বুঝিবে, ততই তাহারা স্ত্রীজাতির অবস্থা ভাল করিতে যত্নবান্ হইবে। বোধ হয় যে, এ দেশে বৃদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর ঘরে স্ত্রীর যে সুখ, সম্মান, পূজা, গুণ এবং মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কৃতবিদ্য সাম্যবাদী বঙ্গীয় যুবকের ঘরে তাহার শতাংশের একাংশও নাই।

আর এক কথা। ইংরাজের সাম্যবাদ এ দেশের লোক জানে না, কখন বুঝে নাই, এবং বোধ হয় যে সহজে বুঝিবেও না। স্ত্রী পুরুষের সমান—এ কথা এ দেশের লোক কখন শুনে নাই—শুনিলে নিশ্চয়ই কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। স্ত্রী গৃহের দেবতা—এ কথা এ দেশের লোক ভাল করিয়া না হউক এক রকম করিয়া বহুকাল হইতে জানে এবং বুঝিয়া আসিতেছে। অতএব হিন্দু স্ত্রীর উপকারার্থ যদি কিছু করিতে হয়, তবে হিন্দু স্ত্রী দেবতা এই বলিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিলে, এ দেশে সিদ্ধি লাভ সম্ভব। অতএব ইংরাজি ধূয়া ছাড়িয়া, দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। সকল লোক এবং সকল জাতি এক ছাঁচে ঢালা নয়। অধিকন্তু স্ত্রীকে পুরুষের সমান বলিয়া বুঝিলে পুরুষের যত লাভ হইতে পারে, স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলে পুরুষের তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইবে। স্ত্রীকে পুরুষের সমান মনে করা মানুষের কাজ। কিন্তু স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা মনে করা দেবতার কাজ। প্রকৃত দেবতা ভিন্ন জগতে কেহ কখন প্রকৃত দেবতা গড়িতে পারে নাই। যিনি সীতা গড়িয়াছেন তিনি বাল্মীকি; যিনি শকুন্তলা গড়িয়াছেন তিনি কালিদাস; যিনি দিস্‌দেমোনা গড়িয়াছেন তিনি সেক্সপীয়র; যিনি থেক্‌লা গড়িয়াছেন তিনি শিলর। অতএব আমাদের রমণীদিগকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় আমরাও কিঞ্চিৎ

দেবত্ব লাভ করিব। তাহার বেশী লাভ আর আমাদের কি হইতে পারে? যদি সে লাভ হয়, তাহা আমাদের পিতৃপুরুষগণের পুণ্যবলে এবং হিন্দু নারীর ভাগ্যবলেই ঘটিবে।
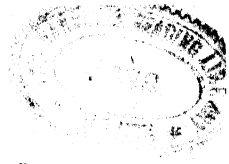
বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য। *

এখন যেমন এ দেশে প্রায় দশ হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হইয়া যায়, বোধ হয় প্রাচীন ভারতে সেরূপ হইত না। পূর্ব্বকালে উপনয়নের পর সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পত্নীগ্রহণ করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার রীতি ছিল। মনুর ব্যবস্থা এই :—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং
গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা॥
গ্রহণান্তিকমেব বা
বেদানধীত্য বেদৌ বা
বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো
গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥ (৩অ-১৩২)

ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর এবং আবশ্যক হইলে ততোধিক কাল, অথবা তাহার অর্দ্ধকাল কিম্বা তাহার এক-চতুর্থাংশ কাল বাস করিবে। এইরূপে নিজ বেদ-শাখা শিক্ষা করিয়া, তিনটি, দুইটি বা একটি ভিন্ন বেদ-শাখা শিক্ষা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

অতি উত্তম ব্যবস্থা। ব্রতাবলম্বীর ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হইয়া বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি উন্নত শাস্ত্র সকলের মর্ম্মগ্রহণ করত জ্ঞানবান্ ও বিদ্যানুরাগী হইয়া বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ করিবার আগে ধন সঞ্চয় কর আর না কর, জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এ নিয়ম এখন প্রচলিত নাই; সুতরাং এখন দশ বল, এগার বল, বার বল, সকল বয়সেই পুরুষের

* এই প্রবন্ধটি পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি (sequel) স্বরূপ বলিয়া এই স্থলে সন্নিবেশিত হইল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর কোন অধিবেশনে ইহা পঠিত হয় নাই, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে তাহা হইতে পারিত না। এখনকার ন্যায় তখন বিবাহ সখের খেলা ছিল না, মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ছিল। কাজেই শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিতে বয়স বেশী হইত। মনু বলেন ঃ—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং
হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা
ধর্ম্মেসীদতি সত্বর ॥ (৯অ-৯৪)

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুরদর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহা সামান্যতঃ উদাহরণ মাত্র। ফলে, পুরুষের বয়স কন্যার বয়সাপেক্ষা প্রায় তিন গুণ হওয়া চাই। তবে যদি গৃহস্থাশ্রমের হানি হয়, তাহা হইলে আরো সত্বর বিবাহ করিতে পারিবে।

পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ করিবে, কিন্তু স্ত্রীর বিবাহ শৈশবাবস্থাতেই সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না হইলে কন্যার পিতৃকুলের উপরনীচে চৌদ্দ পুরুষ নরকগামী হইবে—শাস্ত্রকারদিগের এমনি কঠিন শাসন। কি জন্য তাঁহারা পুরুষের বিবাহের নিমিত্ত অধিক বয়স এবং কন্যার বিবাহের নিমিত্ত অল্প বয়স ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় যে একেবারে বুঝিতে পারা যায় না এমন নয়। শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে যাহা একটু বুঝিয়া দেখিলে এইরূপ ব্যবস্থার তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। সে তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পারিবারিক প্রণালী এখানকার পারিবারিক প্রণালীর মত নয়। এখানে যাহাকে একান্নবর্ত্তী পরিবার বলে, ইংলণ্ডে তাহা নাই। ইংলণ্ডে শুধু পতিপত্নী লইয়া পরিবার। এখানে পিতা, মাতা, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, ভাই, ভগিনী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, প্রভৃতি লইয়া পরিবার। কাজেই ইংলণ্ডের পত্নীর একমাত্র সম্বন্ধ পতির সহিত। এখানে যতগুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর ততগুলি সম্বন্ধ, বা ততগুলি লোকের সহিত

সম্বন্ধ। যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার কার্য্য এবং কর্ত্তব্যের সংখ্যা অল্প; যাহার অনেক লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য্য এবং কর্ত্তব্যের সংখ্যা অধিক। অতএব যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার শিক্ষার বিষয় কম এবং যাহার অধিক লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার শিক্ষার বিষয় বেশী। এই দুইটি শিক্ষার প্রকৃতিও এক নয়। যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে প্রেমের বলে অনেক কর্ত্তব্য সহজেই শিখে ও সম্পন্ন করে। যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ সে প্রেমের সহায়তা পায় না, তাহাকে কেবল পারিবারিক প্রণালীর অনুরোধে অনেক কর্ত্তব্য কষ্ট করিয়া শিখিতে এবং সম্পন্ন করিতে হয়। অল্প বয়স হইতে পতির পরিবারে থাকিয়া এই শিক্ষা লাভ না করিলে, এ শিক্ষা প্রায়ই লাভ করা যায় না। এ শিক্ষা লাভ না করিয়া অধিক বয়সে পতির পরিবারে আগমন করিলে, বয়োধর্ম্ম বশতঃ শুধু পতির প্রতি স্ত্রীর এতই অনুরাগ হয় যে, অপরের প্রতি পারিবারিক নিয়মানুসারে কর্ত্তব্য সাধন করিতে সে নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়ে। আরো এক কথা। যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে শুধু পতির মনের মত হইলেই চলে। কিন্তু যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাকে অনেকের মনের মত হওয়া চাই। কিঞ্চিৎ রূপ, কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য, কিঞ্চিৎ হাবভাব থাকিলে পত্নী পতির মনের মত হইতে পারে; কিন্তু অপরের মনের মত হইতে হইলে, সে সব গুণ কার্য্যকর হয় না, অপরের দ্বারা গঠিত বা শিক্ষিত হইলেই ভাল হয়। সে রকম শিক্ষা অল্প বয়সে যত কার্য্যকর হয়, বেশী বয়সে তত হওয়া অসম্ভব। ফল কথা, যাহাকে অনেকের মনের মত হইতে হইবে, অনেকের তাহাকে মনের মত করিয়া লওয়াই প্রকৃত পদ্ধতি। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিত পত্নীর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়া সেই সম্বন্ধ যাহাতে সুখের সম্বন্ধ হয়, এইরূপ কামনা করিতেন। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব
সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

বর কন্যাকে বলিতেছেন ;—শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, সম্রাজ্ঞী যেমন প্রজাবর্গের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখেন, কন্যা তেমনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন।

বিবাহ প্রক্রিয়ায় ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বর নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পড়াইয়া কন্যাকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইবে ;—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং
পতিকুলোভূয়াসম্।

হে ধ্রুবনক্ষত্র! তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।

উভয় মন্ত্রেরই তাৎপর্য্য এই যে, পত্নীর পতির পরিবারে সকলের সহিত সুখ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেন না, তাহা না হইলে তিনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর প্রভৃতি কাহারো প্রীতিপ্রদায়িনী এবং পতিকুলে অচলা হইতে পারেন না।

ইংরাজপত্নীর যেমন একটি মাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্নীর তেমন নয়। হিন্দু-পত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব এক রকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুস্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে কেমন করিয়া শৈশববিবাহের নিন্দা করি?

হিন্দুপত্নীর যে সকল সম্বন্ধের কথা বলিলাম, তাহা ছাড়া তাহার আর একটি সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ পত্নী মাত্রেরই আছে ; কেন না তাহা পতির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু বোধ হয় যে, পতির সহিত হিন্দুপত্নীর সম্বন্ধ যে প্রকৃতির, অন্য কোন দেশীয় পত্নীর সে প্রকৃতির নয়। অন্য দেশে পত্নী পতির সমান। সেই সমানত্বে যতই কেন নৈকট্যের ভাব থাকুক না, তাহাতে পার্থক্যের ভাব এককালীন বিলুপ্ত নয়। ফলতঃ পার্থক্য ব্যতীত সমানত্ব অসম্ভব। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে লোকসাধারণ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী

উভয়েই পতি এবং পত্নীর সমানত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের পার্থক্য-মূলক পৃথক পৃথক স্বত্ব কল্পনা করিতে ও সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতেই বিশেষ উৎসুক ও যত্নবান হইয়া থাকেন। ইংরাজ পতি এবং পত্নীর প্রত্যেক কার্য্যে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের গ্রন্থে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং মহাকবি শেলির *Revolt of Islam* নামক কাব্যে এবং কতিপয় গদ্যে রচিত প্রবন্ধে এই কথার সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশের লোকের সংস্কার সে রকম নয়। এ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী পতি এবং পত্নীকে একটি ব্যক্তি মনে করেন। তাঁহাদের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, অসম্পূর্ণ পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া, একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি হইবেন। মনু বলেন ;—

এতাবানেব পুরুষো
যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্
যোভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥ (৯অ-৪৫)

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুয়ের নামই পুরুষ।

হিন্দু-বিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যও সেই একত্ব সাধন। যথা—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বদেবাঃ
সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা
সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

বর কন্যাকে বলিতেছেন ঃ—বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন। জল সকল, প্রাণবায়ু, * প্রজাপতি, উপদেষ্ট্রী দেবতা, ইঁহারা আমাদের উভয়ের হৃদয় একীভাবে সংযুক্ত করুন।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন ঃ—

---

* ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থে হলায়ুধ মাতরিশ্বা শব্দের প্রাণবায়ু অর্থ করিয়াছেন।

ও মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতি নিযুনক্তু মহ্যম্‌।

তুমি আমার কার্য্যে হৃদয় সমর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হউক, একতান মনে আমার বাক্য সেবা কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্তই নিযুক্ত করুন।

বর বিবাহ সমাপনে অন্ন ভোজনকালে বধূকে কহিতেছেন ঃ—

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা
প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা
মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে ॥

অর্থাৎ—যাহা মহারত্ন আত্মা স্বরূপ, যাহা প্রাণের বন্ধনস্বরূপ, সত্য যাহার গ্রন্থি স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে তোমার চিত্ত, বুদ্ধি ও অন্তরাত্মাকে বন্ধন করিলাম।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন ;—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব ॥

এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক, এই যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হৃদয় হউক।

কিন্তু শাস্ত্রকারেরা শুধু হৃদয়ের মিশ্রণে পরিতৃপ্ত নন। তাঁহারা সম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন মিশ্রণের অভিলাষী। সেই জন্য বর কন্যাকে বলিতেছেন ;—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্‌।

প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক।

সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পতি পত্নীর এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই। হিন্দু-বিবাহে স্ত্রী এবং

পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত্ব সম্পাদিত হয়—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরে মিশিয়া যায়। সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি। সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, দেহ দগ্ধ হইলে যেমন পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, আত্মা যেমন পরমাত্মায় মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনি স্ত্রীতে এবং স্ত্রী তেমনি পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে ২ আর ২ নাই—১ হইয়া গিয়াছে। যে ১, ২ হইয়াছিল, সেই ২ আবার ১ হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ম্ভূ নিজ দেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভূ প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে।* হিন্দুধর্ম্মে স্বয়ম্ভূ ও যা, মুক্তিও তা। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্যও মুক্তি। তাই হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষ মিশিয়া একটি মুক্তি অথবা স্বয়ম্ভূর সৃষ্টি হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মুক্তি অথবা পারলৌকিক সদ্‌গতি লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এই বিবাহনিষ্পন্ন অপূর্ব্ব একত্বমূলক। তাঁহারা বলেন, "স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হন এবং স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।†" পত্নীর ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন;—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্‌যজ্ঞো
ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতঃ।
পতিং শুশ্রূষতে যেন
তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ (৫ অ-১৫৫)

স্ত্রীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নাই; স্ত্রী কেবল পতি-শুশ্রূষা করিয়াই সুরলোকধন্যা হন।

---

* "নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়"—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতমহিলা নামক গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠা।

† ঐ গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠা।

এবং পতির ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে :—

(১) পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেযু।

অর্থাৎ, ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পতির পিতা অর্থাৎ মহাগুরু।

(২) দারাঃ পরা গতিঃ।

অর্থাৎ, ভার্য্যা পতির পরম গতি।

(৩) এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্
পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যা-
মিহলোকে পরত্র চ॥

অর্থাৎ, ভার্য্যা শুধু ইহকালের জন্য নয়, ইহকাল ও পরকালের জন্য; এই কারণেই বিবাহের বিধি হইয়াছে।

(৪) রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ
তাস্বায়ত্ত মবেক্ষ্য হি।

অর্থাৎ মনুষ্যের রতি, প্রীতি, ও ধর্ম্ম ভার্য্যারই আয়ত্ত।
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে পতি এবং পত্নী, উভয়ে মিলিয়া একটি ব্যক্তি—উভয়ের এক দেহ, এক চিত্ত, এক হৃদয়, এক উদ্দেশ্য, এক স্বর্গ, এক নরক। আবার বলি, পতিপত্নীর এমন সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব আর কোন জাতি কল্পনাও করে নাই। একত্বের ন্যায় অপূর্ব্ব কবিত্ব জগতে কমই আছে। সঙ্গীতময় বিশ্বমণ্ডল যেমন কবিত্ব এও তেমনি কবিত্ব। ভারতে বলিয়া এ কবিত্ব মানুষের জীবন-প্রণালীতে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে কদাচিৎ কখন কোন ক্ষণজন্মা কবির কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষায় থাকে, যথা শেলি :—

"We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, Oh! wherefore two?
One passion in twin-hearts, which grows and grew,
Till like two meteors of expanding flame,
Those spheres instinct with it become the same.
Touch, mingle, are transfigured; ever still

Burning, yet ever inconsumable :
In one another's substance finding food,
Like flames too pure and light and unimbued
To nourish their bright lives with baser prey.
Which point to Heaven and cannot pass away:
One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds ; one life, one death,
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation."

(Epipsychidion)

এ খুব চমৎকার একত্ব বটে। কিন্তু হিন্দু-দম্পতির একত্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কবির একত্ব শুধু হৃদয়ের, হিন্দু-দম্পতির একত্ব হৃদয়ের এবং কর্ম্মের। কবির একত্ব শুধু অন্তর্জ্জগৎ লইয়া, হিন্দু-দম্পতির একত্ব অন্তর্জ্জগৎ এবং বহির্জ্জগৎ দুই লইয়া। কবির একত্বের সঙ্গীত নির্জ্জন নীরব স্থানে ভিন্ন শুনিতে পাওয়া যায় না, গোলমালে সে সঙ্গীত ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দু-দম্পতির একত্বের সঙ্গীত পৃথিবীর সুপ্রশস্ত কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকে একতানে বাঁধিয়া ফেলে। কবির একত্ব poetic ; হিন্দু-দম্পতির একত্ব cosmic। কবির একত্ব lyric ; হিন্দু দম্পতির একত্ব dramatic। নাটকে গীত থাকে, কিন্তু গীতে নাটক্ থাকে না। হিন্দু-দম্পতির একত্বই উৎকৃষ্ট একত্ব।

কিন্তু পত্নীকে পতিতে এত মিশাইয়া দিতে হইলে পতির পত্নীকে গড়িয়া লওয়া আবশ্যক। পতি নিজে যেমন, তাঁহার পত্নীকে তেমনি করিয়া লওয়া চাই। তিনি নিজে যে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, তাঁহার পত্নীকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী করিয়া তোলা চাই। পত্নী পতি-কর্তৃক সৃষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু সৃষ্টিকার্য্য গোড়ায় ভিন্ন হয় না। পরকে সর্ব্ব রকমে আপনার করিতে হইলে, পরের সর্ব্বস্ব আপনার হাতে রাখা চাই, পরের দেহ বল, মন বল, হৃদয় বল, আত্মা বল, সকলই আপনার হাতে রাখা চাই। কিন্তু পরের বয়োধিক্য হইলে তাহার সর্ব্বস্ব আপনার

হাতে পাওয়া যায় না। সন্তানকে আপনার মনের মত করিতে হইলে, তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই পিতা তাহার শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। মনের মত চেলা করিতে হইলে, মহান্ত বালক দেখিয়া চেলা নিযুক্ত করেন। পশুশাবক যেমন পোষ মানে, বড় পশু তেমন পোষ মানে না। রাম সীতাকে বনে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া ভাবিতেছেন ঃ—

শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াম্
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব॥

(উত্তরচরিত।)

বাল্যকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ করিয়াছি ; এমনি প্রণয় যে আমার হৃদয়ের যে ভাব, তাঁহার হৃদয়েরও সেই ভাব, কোন ভেদ নাই। তাঁহাকে আজ কি না ছল করিয়া মৃত্যুর হস্তে দিতেছি, যেন কসাই হইয়া গৃহপালিতা পক্ষিণীটিকে বধ করিতেছি।

ফলতঃ যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, যাহার কিছুই আপনা হইতে পৃথক থাকিবে না, তাহাকে গোড়া হইতেই আপনাতে মিশাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আপনার অভিলাষানুযায়ী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানবান, বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে মিশিতে হইবে, তাহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দু-শাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশী, স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা কি অমূলক, অর্থহীন, না অনিষ্টকর? ব্যবস্থা যে অমূলক বা অর্থহীন নয়, তাহা এক রকম বুঝাইলাম। অনিষ্টকর কি না, তাহাই এখন বুঝাইব।

স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশিয়া যদি চিরকালের জন্য একটি ব্যক্তি হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবাবস্থা হইতে স্ত্রীকে পুরুষের শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অতএব বিবাহের বয়স সম্বন্ধে হিন্দু-

শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা অনিষ্টকর কি না, এ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ এই যে, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের যে একত্ব সম্পাদিত হয়, তাহা ভাল কি মন্দ? দুইটি ব্যক্তিকে যদি একটি কর্ম্ম করিতে হয়, তবে তাহারা এক-মন এক-প্রাণ হইলেই কর্ম্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক জনের কম অনুরাগ বা কম যত্ন হইলে কর্ম্মটিও সুসম্পন্ন হয় না এবং দুইজনের মধ্যে কেহই কর্ম্ম করিয়া সুখ বা তৃপ্তি লাভ করে না। অতএব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে পতি এবং পত্নীর এক-মন এক-প্রাণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, স্ত্রী এবং পুরুষ, এই দুই লইয়া মনুষ্য। স্ত্রী ঋক্‌, পুরুষ সাম; স্ত্রী পৃথিবী, পুরুষ স্বর্গ*। পৃথিবী এবং স্বর্গ একত্র হইলে তবে একটি পূর্ণজগৎ হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সঙ্গীতময় মিলন না হইলে মনুষ্য হয় না। স্ত্রী, পুরুষের প্রয়োজনীয় এবং পুরুষ, স্ত্রীর প্রয়োজনীয়। কাজেই পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ। যদি দুই জনকে সম্পূর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে দুইজনে মিশিয়া এক হওয়া আবশ্যক। মিশ্রণে যেমন অভাব মোচন হয়, আর কিছুতে তেমন হয় না। অমিষ্ট দ্রব্যকে সুমিষ্ট করিতে হইলে অমিষ্ট দ্রব্যের সহিত মিষ্ট দ্রব্য মিশাইতে হয়। মিষ্ট দ্রব্য যত কম মিশান হয়, অমিষ্ট দ্রব্য তত কম মিষ্ট হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্যত্ব-সাধক। তাই বলি যদি ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা জীবন পবিত্র করিতে হয়, তবে স্ত্রীপুরুষে মিশিয়া ধর্ম্মচর্য্যা না করিলে ধর্ম্মচর্য্যা অঙ্গহীন এবং এক রকম অসম্ভব হয়। দুইটি হৃদয়রূপ দুইটি নদী মিলিয়া একটি ধারায় অনন্তে মিশিতে না পারিলে মানুষের জীবনরূপ আহুতি সুন্দর, সম্পূর্ণ এবং সঙ্গীতময় হয় না। যুক্তহস্তে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে দেবার্চ্চনা করিয়া কি আশ মিটে? হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এই মিশ্রণ এবং একীকরণ। সে উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ এবং গূঢ় তত্ত্বমূলক, তাহা কি অস্বীকার করা যায়?

যাঁহারা ইংরাজি বিদ্যা এবং ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাঁহারা বোধ হয় বলিবেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশাইয়া এক করিলে, দুই জনের

---

* সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং।

যে সকল পৃথক্ পৃথক্ মনোবৃত্তি এবং রুচি আছে, তাহার স্বাধীন এবং সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি ? রুচি এবং মনোবৃত্তি কিসের জন্য ? শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তির জন্য,না জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ? যদি স্বাধীন স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে গেলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা না যায়, তাহা হইলে শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লইয়া কি হইবে ? যদি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীনতা এবং স্ফূর্ত্তির পরিমাণ কম করিতে হয়, তাহাও কি করা উচিত নয় ? এবং মানুষ কি তাহা করে না ? সামাজিক জীবনের অর্থই ত তাই। দশজনে মিলিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, সকলকেই কিয়ৎ পরিমাণে আপন আপন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়। অপরের সাহায্যে আপনার কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, অপরের কাছে আপনার কিয়দংশ বলি দেওয়া নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, স্ত্রী ও পুরুষ মিশিয়া এক হইলে দুই জনের যে সকল পৃথক পৃথক রুচি ও মনোবৃত্তি আছে তাহার স্বাধীন ও সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পতি এবং পত্নী একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি সেই কার্য্যটি যে রকমে করিতে সক্ষম, তাঁহার তাহা সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই। পতি এবং পত্নী উভয়েই অতিথি সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু পতি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া অতিথি সেবার জন্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছেন। পত্নী স্বহস্তে সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানকে যেমন যত্ন করিয়া স্বয়ং ভোজন করাইয়া থাকেন, অতিথিকে তেমনি স্বয়ং ভোজন করাইতেছেন। একই কর্ম্ম দুই জনে দুই রকমে করিতেছেন। শাস্ত্র-কারদিগের ব্যবস্থাও তাই। পতি প্রাত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, পত্নী সেই যজ্ঞের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবেন। তৃতীয় উত্তর এই যে, একমনে একপ্রাণে এক উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইলে কি পতি, কি পত্নী, কাহারো পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিবার বেশী অভিরুচি হয় না। যতটুকু অভিরুচি হয়, প্রগাঢ় প্রণয়স্থলে সেটুকু যেমন অবিবাদে এবং প্রীতিকর প্রণালীতে চরিতার্থ করা যায়, প্রণয়ের অন্য অবস্থায় তেমন করা যায় না।

যাঁহারা ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আরো দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা এই যে, হিন্দু, পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান। বিবাহকালে বর কন্যাকে এই মন্ত্র পড়াইয়া অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া থাকেন:—

ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।

হে অরুন্ধতি! আমি যেন তোমার ন্যায় অবরুদ্ধ অর্থাৎ পতিতে লগ্ন হইয়া থাকি।

তাহার পর বর কন্যাকে দর্শন এবং বারংবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন:—

ওঁ ধ্রুবাদ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী,
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে,
ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্॥

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু-শাস্ত্রকার পত্নীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে বাঁধিয়া রাখিতে চান, এবং সেই জন্য তিনি পতিপত্নীর যোগকে চিরস্থায়ী যোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ঠিক সে মত এবং সে চেষ্টা নয়। তাঁহারা যে পতিপত্নীর সম্বন্ধ স্থায়ী করিতে অনিচ্ছুক, তা নয়। কিন্তু পতি এবং পত্নীর স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথক পৃথক আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ এবং অভিরুচির দিকে তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি, এবং সেই জন্য তাঁহারা পতি এবং পত্নীর বিবাহগ্রন্থি যাহাতে সহজে খোলা যায়, সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দু বলেন, পতি এবং পত্নীর মধ্যে আজ যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল তাহা অদৃশ্য হউক, কাল যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ হয়, পরশ্ব তাহা অদৃশ্য হউক, মোটা কথা, পতি এবং পত্নীর মধ্যে সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া ক্রমেই তাঁহারা পরস্পরে মিশিয়া যাউন। * ইংরাজ

* বিবাহান্তে বর, অগ্নি ও সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিবে:—

(১) ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পতিঘ্নী তনুস্তামস্বৈ নাশয় স্বাহা।

বলেন,—পতি এবং পত্নী আজ পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, কিন্তু কাল তাঁহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ জন্মিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, তবে পরশ্বই তাঁহারা যাহাতে দাম্পত্যবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। হিন্দু, পতিপত্নীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি আঁটিয়া দিতে চান। ইংরাজ পতিপত্নীর বিরোধ বাড়াইয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান। হিন্দু সৃষ্টি এবং পালনের পক্ষপাতী, ইংরাজ প্রলয়ের পক্ষপাতী। হিন্দু এবং ইংরাজের মধ্যে এই প্রভেদটি অতি গুরুতর এবং ইহার তাৎপর্য্যও অতি গভীর। ইহার দুইটি তাৎপর্য্য আছে। একটি তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেন যে, তখন তাঁহার পতি তাঁহাকে শিক্ষা দ্বারা আপনার মনের মত করিয়া লইতে পারেন, এবং সেই জন্য যত দিন যায়, ততই তিনি পতিতে মিশিতে থাকেন। কিন্তু ইংরাজ-রমণীর এমন বয়সে বিবাহ হয় যে, তখন তিনি নূতন শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম, এবং সেই জন্য তাঁহার পতির সহিত অপ্রণয়ের কোন কারণ তাঁহাতে থাকিলে, পতি তাহা নষ্ট করিতে অক্ষম হন; এবং যত দিন যায়, কারণটি কাজেই তত প্রবল হইয়া উঠে। দুইটি জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহের বয়সের প্রভেদ বশতঃ তাহাদিগের দাম্পত্য নীতি ও প্রণালীর এত আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে। আর একটি তাৎপর্য্য এই, অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া তিনি পতিকর্তৃক প্রয়োজনমত শিক্ষিত হইতে পারেন না, ইংরাজ এ কথা বুঝেন। কিন্তু বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবিধান করেন না—অল্প

হে সর্ব্বদোষহর অগ্নি! তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এই জন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কন্যার) পতি-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট কর।

(২) ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি। যাস্যৈ গৃহঘ্নী তনুস্তামস্যে নাশয় স্বাহা।

হে সর্ব্বদোষহর সূর্য্য! তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এইজন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কন্যার) গৃহধর্ম্ম-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট কর।

বয়সে রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা কেন করেন না? এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। আমি যেরূপ বুঝি তাহা বলিতেছি। অনেক কারণে ইংরাজ অল্প বয়সে স্ত্রীর বিবাহ দেন না। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, অল্প বয়স হইতে স্ত্রী যদি পতির নিকট থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পতির মানসিক শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। যদি তাহা হয়, তবে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে, সুরুচি এবং কুরুচি সম্বন্ধে এবং অন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার যেরূপ স্বাধীন শিক্ষা লাভ হওয়া উচিত তাহা হয় না। সে যেন প্রভুর দাস হইয়া পড়ে। কিন্তু সেটি হওয়া উচিত নয়। সেটি হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে না, স্বাধীন মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে না। এ কথার অর্থ এই যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ যখন মিলিত হইবে তখন তাহারা পরস্পরে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় স্বাধীনভাবে থাকিবে বলিয়া মিলিত হইবে। কোন একটি কার্য্য বা উদ্দেশ্যকে প্রধান ভাবিয়া মিলিত হইবে না। আপনিই প্রধান এই ভাবিয়া মিলিত হইবে। আত্মপ্রিয়তা ইংরাজি বিবাহ-প্রণালীর মূল সূত্র। তাই ইংরাজ, বিবাহের গ্রন্থি খুলিয়া দিতে এত যত্নবান। হিন্দুর বিবাহ মহৎ উদ্দেশ্য মূলক বলিয়া, হিন্দু বিবাহ-গ্রন্থি আঁটিয়া রাখিতে চান; ইংরাজের বিবাহ মহৎ উদ্দেশ্যহীন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-মূলক বলিয়া, ইংরাজ বিবাহ-গ্রন্থি খুলিয়া দিতে এত তৎপর। কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে সেই স্বাধীনতাকে বড় করা ভাল, না জীবনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া সেইটিকে বড় করা ভাল? যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে তবে এমন হইতে পারে যে, তোমারই সুখ হইল, আর কাহারো কিছু হইল না। কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যদি পরোপকারী হইতে পার, তবে তুমিও সুখী হইবে এবং অপরেও সুখী হইবে। এ জগতে একলা থাকিবার যো নাই; পশু একলা থাকিতে পারে, মানুষ পারে না। আবার সকল পশু ও একলা থাকিতে পারে না, মানুষ ত দূরের কথা। যদি পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হইল, তবে জীবনটা পাঁচ জনের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিলেই, এ জগতে এ জীবনের কার্য্যটা এক রকম করা হইল না?

কিন্তু সেই মহৎ কার্য্য সাধনার্থ যদি স্ত্রীপুরুষের মিলন আবশ্যক হয়, তবে নিজ স্বাধীনতাকে বড় না ভাবিয়া সেই মহৎ কার্য্যটিকে বড় ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইলেই ভাল হয় না? যদি বল যে স্ত্রীপুরুষে মিলিত হয় হউক; কিন্তু যে মহৎ কার্য্যের উল্লেখ করা হইল, সেই জন্যই যে তাহারা মিলিত হইবে এমন কি কথা আছে? ইহার উত্তর এই যে, যদি স্ত্রী এবং পুরুষকে মিলিতেই হয়, তবে সেই মহৎ কার্য্যোদ্দেশে মিলিলে মিলনটা যত মহৎ এবং মনুষ্যত্বসূচক হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে মিলিলে তত হয় না। এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বিবাহের দ্বারা জীবনের মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে বা বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে যে মানুষ হইবে তাহার তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইংরাজ আত্মপ্রিয় বলিয়া তাহার বিবাহের প্রকৃতপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই তাহার বিবাহ, বিবাহই নয়। মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত মানুষের প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোদিয়াসের সহিত এরিষ্টজিটনের বিবাহ; যিশুখৃষ্টের সহিত সেণ্টপলের বিবাহ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ; রামের সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ।

আরো এক কথা। ইংরাজের স্বাধীনতার ধূয়া কি জন্য? না, অপরের দ্বারা স্বাধীনতা অপহৃত হয় বলিয়া, অপরে অত্যাচার করিয়া বা স্বার্থ-সাধনার্থ স্বাধীনতা বিনষ্ট করে বলিয়া। কিন্তু জগতের এবং মনুষ্যজীবনের মহৎকার্য্য সাধনার্থ স্ত্রীপুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয়, তাহাতে অত্যা-চারই বা কোথায়, স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ই বা কোথায়? তাহাতে যদি স্বাধী-নতার বিলোপ হয়, সে ত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মহৎকার্য্য সাধনার্থ হইবে। অতএব সে স্বাধীনতা বিলোপের বিরুদ্ধে কাহারো কোন কথা কহিবার যো নাই। মহৎকার্য্যের নিমিত্ত যাহা দেও তাহা ত দূষণীয় দান নয়, তাহা মহৎ মনের মহৎ ও পবিত্র আহুতি। ইংরাজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি দিবার নিমিত্ত বিবাহ করেন না, হিন্দু করেন। ইংরাজ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, হিন্দু জগৎকে লইয়াই ব্যস্ত। ইংরাজ আপনার জন্য সমাজে থাকেন, হিন্দু সমাজের জন্য সমাজে থাকেন। বল দেখি ইংরাজমানুষ

বেশী মানুষ, না হিন্দু-মানুষ বেশী মানুষ? বল দেখি ইংরাজ হইবে না হিন্দু হইবে? বল দেখি ইংরাজের মতে বিবাহ করিবে না হিন্দুর মতে বিবাহ করিবে?

এখন বোধ হয় বুঝা গেল যে ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ভাল নয়, এবং হিন্দু-বিবাহে স্ত্রীপুরুষের যে মিশ্রণ বা একীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাহা অতি উত্তম এবং অতি প্রয়োজনীয়। জগৎকে একই চক্ষে দেখিয়া যাহাদিগকে জগতের মঙ্গলসাধন করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। পতি এবং পত্নীর হৃদয়রূপ দুইটি সুর মিলিয়া একতানে না বাজিলে জগৎ কেমন করিয়া সঙ্গীত সুধা পান করত শোকতাপ ভুলিয়া যাইবে! কিন্তু যদি দুইটি হৃদয়কে মিশাইয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর মিশাইয়া না লইলে কেমন করিয়া সেই অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটিয়া উঠিবে? তবেই ত বোধ হয় যে হিন্দুশাস্ত্রে পুরুষের বেশী বয়সে এবং স্ত্রীর শৈশবকালে বিবাহ হওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি উত্তম এবং উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

তুমি বলিবে যে এ পূর্ব্বকালের ব্যবস্থা, এখন চলিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন চলিবে না? উপরে বুঝাইয়াছি যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুরোধে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ আবশ্যক। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার এখনও ত এদেশে আছে। তবে কেন সেই সকল পরিবারে কন্যার বিবাহ এখনও অল্প বয়সে হইবে না? আর, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া একলা একলা থাকেন বা থাকিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও বলি যে, অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ আবশ্যক এবং বিশেষ উপকারী। একান্নবর্ত্তী পরিবারে পতি অনেক সময় পত্নীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারেন না। এবং অনেক সময় পরিবারস্থ লোকে পত্নীকে পতির শিক্ষার বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া তাঁহার চেষ্টা অনেক অংশে বিফল করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাকে পাঁচ রকমের পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হয় না, তিনি নির্ব্বিরোধে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে পত্নীকে নিজের মনের মত করিয়া তুলিতে পারেন। যাহাকে লইয়া জীবনের সুখ

দুঃখ সকলি, যাহাকে লইয়া জীবনের অর্থ, যাহাকে লইয়া জগতে মুক্তি, তাহাকে গড়িবার মতন পুরুষের মহৎ, প্রীতিকর এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ আর কি আছে! এবং তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করা মহা পাপ!

বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতিহস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন করিয়া তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাইবেন এবং সন্তানগুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবেন। এ কথার অর্থ এই যে, পতি শিশুপত্নীর সহিত অযথা ব্যবহার করিবেন। আজ কাল এই সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায় এবং অনেকেই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবারণ করিবার আশায়, কিছু বেশী বয়সে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু চরক শুশ্রুতের মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, আর সর বেনজমিন ব্রোডির মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, যিনি যেমন করিয়াই বলুন, বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য বিবাহের ফল তাহা সপ্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দ্বিতীয় কথা এই যে, শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা-পত্নী তাহার জন্য নয়। বালিকার সহিত শারীরিক সম্বন্ধ শাস্ত্রে নিষিদ্ধঃ—

নাজাতলোম্ন্যোপহাসমিচ্ছেৎ।
নাযুগ্মা।

(গোভিল-গৃহ্যসূত্র, ৩য় প্রপাঠক, ৫ম খণ্ড, ৩ ও ৪ সূত্র।)

যাহার অন্তর্লোম উৎপন্ন হয় নাই এ রূপ রসানভিজ্ঞা বালিকার সহিত উপহাস করিতেও ইচ্ছাও করিবে না। বয়োরূপগুণ প্রভৃতিতে সর্ব্বথা অযোগ্যা নারীর সহিতও উপহাস পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য। (শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমীর অনুবাদ।)

অতএব যে দেহের প্রয়োজনে বিবাহ করে সে পশু, বালিকারূপ পবিত্র বস্তু তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, অর্থাৎ, যে রকম উদ্দেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বিবাহ করে, বালিকাপত্নী তাহারই প্রাপ্য। যিনি জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, পরিণতবয়স্ক, উন্নতমনা, মহৎ আশয়ে মহিমান্বিত, তাঁহার পত্নী চির-

কালই সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তাঁহার সন্তান সন্ততি সকল সময়েই সুপ্রস্ফুটিত পুষ্প। তাই বলি, যদি বিবাহের অপব্যবহার নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে পুত্রকে বিদ্যা দান করিয়া বেশী বয়সে তাহার বিবাহ দিও, কিন্তু অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিও না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন বাহ্যশাসনে নাই। চোর বার বার জেলে যায়, তবু চুরি করিতে ছাড়ে না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন আধ্যাত্মিক উন্নতি। এখন এ দেশে আধ্যাত্মিকতা নাই বলিয়াই বাল্যবিবাহের অপব্যবহার হয়। এখন এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই, বিবাহের সহিত ধর্ম্মের অর্থাৎ বিশ্বের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই বিবাহের ফল কদর্য্য হইতেছে এবং সংসারধর্ম্ম প্রকৃত সৌন্দর্য্যহীন হইতেছে। নৈতিক উন্নতি কর, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য স্থির কর, করিয়া লক্ষ্মীরূপা নারীর হৃদয়ে মিশিয়া থাক, দেখিবে এদেশ আর এদেশ নাই, দেশ ধর্ম্মবলে অমিত বল প্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুর ঘরে জগতের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, সপত্নীক হিন্দু পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বীরপুরুষ হইয়াছে এবং জগতের সৌন্দর্য্যের ছটায় ডুবিয়া রহিয়াছে, দেশে রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, হীনতা নাই—সকলই উন্নত, সকলই পবিত্র, সকলই বীরোচিত, সকলই সঙ্গীতময়।

অকালকুষ্মাণ্ড ।*

পরামর্শ দেওয়া কাজটা না কি গুরুতর নহে, অথচ যিনি পরামর্শ দেন তিনি সহসা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠেন, এই নিমিত্ত পরামর্শদাতার অভাব লইয়া সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষকে বোধ করি কখন আক্ষেপ করিতে হয় নাই! কতকগুলি নিতান্ত সত্য কথা আছে তাহারা এত সত্য যে সচরাচর কোন ব্যবহারে লাগে না অর্থাৎ তাহারা এত সস্তা যে, তাহাদের পয়সা দিয়া কেহ কেনে না—কিন্তু গায়ে পড়িয়া বদান্যতা করিবার সময় তেমন সুবিধার জিনিষ আর কিছু হইতে পারে না। যৎপরোনাস্তি সত্য কথা গুলির দশা কি হইত যদি সংসারে পরামর্শদাতার কিছুমাত্র অভাব থাকিত! তাহা হইলে কে বলিত, "বাপু সাবধান হইয়া চলিও, বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করিও, মনোযোগ পূর্ব্বক বিষয় আশয় দেখিও, এগ্‌জামিন্ পাশ হইতে চাও ত ভাল করিয়া পড়া মুখস্থ করিও—খামকা পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিও না, খবরদার জলে ডুবিয়া মরিও না—ইত্যাদি?" এই কথা গুলো কোম্পানির মাল হইয়া পড়িয়াছে, দরিয়ায় ঢালিতে হইলে ইহাদের প্রতি আর কেহ মায়া-মমতা করে না!

অনেক ভাল ভাল পরামর্শও দুরবস্থায় পড়িয়া সস্তা হইয়া উঠিয়াছে। সহসা তাহাদের এত বেশী আমদানী হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দাম নাই বলিলেও হয়। দেশকে উপদেশ এবং আদেশ করিতে কেহই পরিশ্রমের ত্রুটি করেন না;—রাস্তায় যত লোক চলিতেছে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী লোক পথ দেখাইয়া দিতেছে। (বাঙ্গালাটা Finger-Post-এরই রাজত্ব হইয়া উঠিল।) কিন্তু তাহাদের এই অত্যন্ত গুরুতর কর্ত্তব্য সমাধান করিতে তাহারা এত বেশী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে

---

* সন ১২৯০ সালের ১১ ই চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

যে পথিকেরা চলিবার রাস্তা পায় না। সহসা সকলেরই এক মাত্র ধারণা হইয়াছে যে, দেশটা যে রসাতলে যাইতেছে সে কেবল মাত্র উপদেশের অভাবে। একটা ভাল জিনিষ সস্তা হইলে খুচরা দোকানদার মহলে অত্যন্ত আনন্দ পড়িয়া যায়। দেখিতেছেন না, আজ কাল ইহাদের মধ্যে ভারি স্ফূর্ত্তি দেখা যাইতেছে! সাহিত্যের ক্ষুদে পিঁপ্ড়েগণ ছোট ছোট টুক্‌রো মুখে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ও অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত সার বাঁধিয়া চলিয়াছে! এখানে একটা কাগজ, ওখানে একটা কাগজ, সেখানে একটা কাগজ, এক রাত্রের মধ্যে হুস্ করিয়া মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা যখন ইংরাজি বিদ্যাটাকে কলা দিয়া চট্‌কাইয়া ফলার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পাতের চারদিকে পোলিটিকল্ ইকনমি ও কন্‌ষ্টিট্যুশনল হিষ্টির, বক্‌লের ও মিলের এবং এ-ও-তার কিছু কিছু গুঁড়া পড়িয়াছিল—সাহিত্যের ক্ষুধিত উচ্ছিষ্টপ্রত্যাশী এক দল জীববিশেষ তাহাদের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি প্রভাবে শুঁকিয়া শুঁকিয়া তাহা বাহির করিয়াছে। বড় বড় ভাবের আধ্‌খানা শিকিখানা টুক্‌রা পথের ধূলার মধ্যে [illegible]ড়িয়া সরকারী সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে, ছোট ছোট মুদি এবং [illegible]ারিকুলতিলকগণ পর্য্যন্ত সে গুলোকে লইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াই[illegible] পাট কেলের মত ছোঁড়াছুঁড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এত ছ[illegible] ভাল কি না সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে—কারণ, এরূপ অবস্থায় উপযোগী দ্রব্য সকলও নিতান্ত আবর্জ্জনার সামিল হইয়া দাঁড়ায়—অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে এবং সমালোচকদিগকে বড় বড় ঝাঁটা হাতে করিয়া ম্যুনিসিপলিটির শকট বোঝাই করিতে হয়।

এমন কেহ বলিতে পারেন বটে যে, ভাল কথা মুখে মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে হানি যে কেন হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। হানি হইবার একটা কারণ এই দেখিতেছি—যে কথা সকলেই বলে, সে কথা কেহই ভাবে না। সকলেই মনে করে, আমার হইয়া আর পাঁচ শ জন এ কথাটা ভাবিয়াছে ও ভাবিতেছে, অতএব আমি নির্ভাবনায় ফাঁকি দিয়া কথাটা কেবল বলিয়া লই না কেন। কিন্তু ফাঁকি দিবার যো নাই—ফাঁকি

নিজেকেই দেওয়া হয়। তুমি যদি মনে কর একটা ঘোড়াকে স্থায়ীরূপে নিজের অধিকারে রাখিতে হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল রসারসি দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই হইল, তাহাকে দানা ছোলা দিবার কোন দরকার নাই—এবং সেই মত আচরণ কর, তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যে দেখিবে দড়িতে একটা জিনিষ খুব শক্তরূপে বাঁধা আছে বটে কিন্তু সেটাকে ঘোড়া না বলিলেও চলে। তেম্‌নি ভাষারূপ দড়িদড়া দিয়া ভাবটাকে জিহ্বার আস্তাবলে দাঁতের খুঁটিতে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই যে সে তোমার অধিকারে চিরকাল থাকিবে তাহা মনে করিও না—তিন সন্ধ্যা তাহার খোরাক যোগাইতে হইবে। একটা গল্প আছে, একজন বুদ্ধিমান লোক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উদ্দেশে একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন ঘোড়াকে নিয়মিতরূপে না-খাওয়ান' অভ্যাস করাইলে সে টেঁকে কি না। অভ্যাসের গুণে অনেক হয় আর এটা হওয়াই বা আশ্চর্য্য কি! কিন্তু সেই বিজ্ঞানহিতৈষী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্প্রতি এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে—প্রতিদিন একটু একটু করিয়া ঘোড়ার খোরাক কমাইয়া যখন ঠিক একটি মাত্র খড়ে আসিয়া নাবিয়াছি, এমন সময়টিতে ঘোড়াটা মারা গেল। নিতান্ত সামান্য কারণে এত বড় একটা পরীক্ষা সমাপ্ত হইতেই পারিল না, ও এ বিষয়ে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াই গেল। আমরাও বুদ্ধিমান বিজ্ঞানবীরগণ বোধ করি কতকগুলি ভাব লইয়া সেইরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি, কিছু মাত্র ভাবিব না,—অথচ গোটাকতক বাঁধা ভাব পুষিয়া রাখিব, শুধু তাই নয় চব্বিশ ঘণ্টা তাহাদের ঘাড়ে চড়িয়া রাস্তার ধূলা উড়াইয়া দেশময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইব, অবশেষে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইবার ঠিক পূর্ব্বেই দেখিব, কথা সমস্তই বজায় আছে অথচ ভাবটার যে কি খেয়াল গেল সে হঠাৎ মরিয়া গেল!

য়ুরোপে যাহা হইয়াছে তাহা সহজে হইয়াছে, আমাদের দেশে যাহা হইতেছে তাহা দেখাদেখি হইতেছে এই জন্য ভারি কতকগুলো গোলযোগ বাধিয়াছে। সমাজের সকল বিভাগেই এই গোলযোগ উত্তরোত্তর পাকিয়া উঠিতেছে। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার

আগ্‌ডালে বসিয়া আনন্দে দোল্ খাইতেছি, তাহার আগাটাই দেখিতেছি, তাহার যে আবার একটা গোড়া আছে ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এরূপ ভ্রম শাখা-মৃগেরই শোভা পায়। যে কারণে এতটা কথা বলিলাম তাহা এই—য়ুরোপে দেখিতে পাই বিস্তর পাক্ষিক মাসিক ত্রৈমাসিক বার্ষিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, ইহা সেখানকার সভ্যতার একটা নিদর্শন বলিতে হইবে। আমাদের দেশেও বিস্তর সাময়িক পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহাই লইয়া কি উল্লাস করিব? এ বিষয়ে আমি কিন্তু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া থাকি। আমার সন্দেহ হয় ইহাতে ঠিক ভাল হইতেছে কি না। য়ুরোপে লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বিস্তর আছে তাই কাগজ পত্র আপনা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। আমরা তাই দেখাদেখি আগেভাগে কাগজ বাহির করিয়া বসিয়া আছি, তার পর লেখক লেখক করিয়া চতুর্দ্দিক হাৎড়াইয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে যে কুফল কি হইতে পারে, তাহা ক্রমশঃ ব্যক্ত করা যাইতেছে।

আমার একটি বিশ্বাস এই যে, য়ুরোপেই কি আর অন্য দেশেই কি, সাহিত্য সম্বন্ধে নিয়মিত যোগান্ দিবার ভার গ্রহণ করা ভাল নয়। কারণ, তাহা হইলে দোকানদার হইয়া উঠিতে হয়। সাহিত্যে যতই দোকানদারী চলিবে ততই তাহার পক্ষে অমঙ্গল। প্রথমত, ভাবের জন্য সবুর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না, লেখাটাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর আশঙ্কার বিষয় আরেকটি আছে। ইংরাজেরা দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু স্বাধীন ভাবগুলিকে ক্রীতদাসের মত কেনাবেচা করিবার প্রথা তাঁহারাই অত্যন্ত প্রচলিত করিয়াছেন। এইরূপে শতসহস্র ভাব প্রত্যহই নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন অবস্থায় তাহারা যেরূপ গৌরবের সহিত কাজ করিতে পারে, দাসত্বের জোর জবর্দস্তিতে ও অপমানে তাহারা সেরূপ পারে না। ও এইরূপে ইংরাজিতে যাহাকে cant বলে সেই cant-এর সৃষ্টি হয়। ভাব যখন স্বাধীনতা হারায়, দোকান্দারেরা যখন খরিদ্দারের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে, তখন তাহাই cant হইয়া পড়ে। য়ুরোপের বুদ্ধি ও ধর্ম্মরাজ্যের সকল বিভাগেই cant নামক একদল ভাবের শূদ্রজাতি

স্থগিত হইতেছে। য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আক্ষেপ করেন যে, প্রত্যহ Theological cant, Sociological cant, Political cant-এর দলপুষ্টি হইতেছে। আমার বিশ্বাস তাহার কারণ—সেখানকার বহুবিস্তৃত সাময়িক সাহিত্য ভাবের দাস-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। সত্য কথা মহৎকথাও দোকানদারীর অনুরোধে প্রচার করিলে অনিষ্টজনক হইয়া উঠে। যথার্থ হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে কথা দেবতার সিংহাসন টলাইতে পারিত, সেই কথাটাই কি না ডাকমাশুল সমেত সাড়ে তিন টাকা দরে মাসহিসাবে বাঁটিয়া-বাঁটিয়া ছেঁড়া কাগজে মুড়িয়া বাড়ি বাড়ি পাঠান'! যাহা সহজ প্রকৃতির কাজ তাহারো ভার নাকি আবার কেহ গ্রহণ করিতে পারে !. কোন দোকানদার বলুক দেখি, সে মাসে মাসে এক একটা ভাগীরথী ছাড়িবে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় লাটাই বাঁধিয়া ধূমকেতু উড়াইবে বা প্রতি শনিবারে ময়দানে একটা করিয়া ভূমিকম্পের নাচ দেখাইবে। সে হুঁকার জল ফিরাইতে, ঘুড়ি উড়াইতে ও বাঁদর নাচাইতে পারে বলিয়া যে অম্লান বদনে এমনতর একটা গুরুতর কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করিতে চাহে, ইহা তাহার নিতান্ত স্পর্দ্ধার কথা। সহৃদয় লোকদের হৃদয়ের অন্তঃপুরবাসী পবিত্র ভাবগুলিকে সাহিত্য সমাজের অনার্য্যেরা যখনি ইচ্ছা অসঙ্কোচে তাহাদের কঠিন মলিন হস্তে স্পর্শ করিয়া অশুচি করিয়া তুলিতেছে। এই সকল ম্লেচ্ছেরা মহৎবংশোদ্ভব কুলীন ভাব গুলির জাত মারিতেছে। কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তবে তাহাদিগকে সমাজে তুলিতে হয়। কারণ, সকল বিষয়েই অধিকারী ও অনধিকারী আছে। লেখার অধিকারী কে? না, যে ভাবে, যে অনুভব করে। ভাবগুলি যাহার পরিবারভুক্ত লোক। যে-খুসী-সেই কোম্পানির কাছ হইতে লাইসেন্স লইয়া ভাবের কারবার করিতে পারে না। সেরূপ অবস্থা মগের মুল্লুকেই শোভা পায়, সাহিত্যের রাম-রাজত্বে শোভা পায় না। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের অরাজকতার মধ্যে কি তাহাই হইতেছে না! না হওয়াই যে আশ্চর্য্য। কারণ এত কাগজ হইয়াছে যে তাহার লেখার জন্য যা'কে তা'কে ধরিয়া বেড়াইতে হয়—নিতান্ত অর্ব্বাচীন হইতে ভীমরতিগ্রস্ত পর্য্যন্ত কাহাকেও ছাড়িতে পারা যায় না। মনে কর,

হঠাৎ যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইয়াছে, কেল্লায় গিয়া দেখিলাম সৈন্য বড় বেশী নাই—তাড়াতাড়ি মুটেমজুর চাষাভুষো যাহাকে পাইলাম এক একখানা লাল পাগড়ি মাথায় জড়াইয়া সৈন্য বলিয়া দাঁড় করাইয়া দিলাম। দেখিতে বেশ হইল। বিশেষতঃ রীতিমত সৈন্যের চেয়ে ইহাদের এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে—ইহারা বন্দুকটা লইয়া খুব নাড়িতে থাকে, পা খুব ফাঁক করিয়া চলে, এবং নিজের লাল পাগড়ি ও কোমরবন্দটার বিষয় কিছুতেই ভুলিতে পারে না—কিন্তু তাহা সত্বেও যুদ্ধে হার হয়। আমাদের সাহিত্যেও তাই হইয়াছে—লেখাটা চাইই চাই, তা-সে যেই লিখুক না কেন। এ লেখাতেও না কি আবার উপকার হয়! উপকার চুলায় যাউক, স্পষ্ট অপকার হয় ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন! অনবরত ভাণ চলিতেছে—গদ্যে ভাণ, পদ্যে ভাণ, খবরের কাগজে ভাণ, মাসিকপত্রে ভাণ। রাশি রাশি মৃত-সাহিত্য জমা হইতেছে, ভাবের পাড়ায় মড়ক প্রবেশ করিয়াছে। ভারতজাগান'র ভাবটা কিছু মন্দ নয়। বিশেষতঃ যথার্থ সহৃদয়ের কাতর মর্ম্মস্থান হইতে এই জাগরণ-সঙ্গীত বাজিয়া উঠিলে, আমাদের মত কুম্ভকর্ণেরো একমুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রাভঙ্গ হয়; নিদেন হাই তুলিয়া গা-মোড়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখন এম্নি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভারত-জাগান কথাটা যেন মারিতে আসে! তাহার কারণ আর কিছুই নয়, আজ দশপনেরো বৎসর ধরিয়া অনবরত বালকে এবং স্ত্রীলোকে পর্য্যন্ত ভারতজাগানর ভাণ করিয়া আসিয়াছে। কুম্ভকর্ণকে যেমন ঢাকঢোল জগঝম্প বাজাইয়া বলপূর্ব্বক জাগাইয়া তুলিয়া অকালে মারিয়া ফেলা হইয়াছিল, তেমনি এই ভাবটিকেও সকলে মিলিয়া নিতান্ত উৎপীড়ন করিয়া কাঁচাঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিল, ও সে যেমন জাগিল, তেম্নি মরিল। ইহার বিপুল মৃতদেহ আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রের কতটা স্থান জুড়িয়া পড়িয়া আছে একবার দেখদেখি! এখনো কেহ-কেহ কাজকর্ম্ম না থাকিলে জেঠাইমাকে গঙ্গাযাত্রা হইতে অব্যাহতি দিয়া এই মৃত দেহের কানের কাছে ঢাকঢোল বাজাইতে আসেন। কিন্তু এ আর উঠিবে না, এ নিতান্তই মারা পড়িয়াছে! যদি ওঠে তবে প্রতিভার সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন দেহ

ধারণ করিয়া উঠিবে। এমন একটার উল্লেখ করিলাম; কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে শতকরা কত কত ভাব হৃদয়হীন কলমের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ও কপট কৃত্রিম রসনা-শয্যার উপরে হাত পা খিঁচাইয়া ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মরিতেছে তাহার একটা তালিকা কে প্রস্তুত করিতে পারে! এমনতর দারুণ মড়কের সময় অবিশ্রাম চুলা জ্বালাইয়া এই শত সহস্র মৃত সাহিত্যের অগ্নিসংকার করিতে কোন্ সমালোচক পারিয়া ওঠে!

কথাটা সত্য হইলেই যে সমস্ত দায় হইতে এড়াইলাম তাহা নহে। সত্য কথা অনুভব না করিয়া যে বলে তাহার বলিবার কোন অধিকার নাই। কারণ সত্যের প্রতি সে অন্যায় ব্যবহার করে। সত্যকে সে এমন দীনহীন ভাবে লোকের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে, যে কেহ সহসা তাহাকে বিশ্বাস করিতে চায় না। বিশ্বাস যদি বা করে ত মৌখিক ভাবে করে, সসম্ভ্রমে হৃদয়ের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে আসন পাতিয়া দেয় না। সে যত বড় লোকটা তদুপযুক্ত আদর পায় না। অনবরত রসনায় রসনায় দেউড়িতে ফিরিতে থাকে, হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, ক্রমে রসনার শোভা হইয়া ওঠে, হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না। হৃদয়ের চারা রসনায় পুঁতিলে কাজেই সে মারা পড়ে।

সত্যের দুই দিক আছে—প্রথম, সত্য যে সে আপনা-আপনিই সত্য, দ্বিতীয়, সত্য আমার কাছে সত্য। যতক্ষণ-না আমি সর্ব্বতোভাবে অনুভব করি ততক্ষণ সত্য হাজার সত্য হইলেও আমার নিকটে মিথ্যা। সুতরাং আমি যখন অনুভব না করিয়া সত্যকথা বলি, তখন সত্যকে প্রায় মিথ্যা করিয়া তুলি। অতএব বরংচ মিথ্যা বলা ভাল তবু সত্যকে হত্যা করা ভাল নয়। কিন্তু প্রত্যহই যে সেই সত্যের প্রতি মিথ্যাচরণ করা হইতেছে! যাহারা বোঝে না তাহারাও বুঝাইতে আসিয়াছে, যাহারা ভাবে না তাহারাও টিয়া পাখীর মত কথা কয়, যাহারা অনুভব করে না তাহারাও তাহাদের রসনার শুষ্ককাষ্ঠ লইয়া লাঠি খেলাইতে আসে! ইহার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই! অপমানিত সত্য কি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইবেন না!

সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাবের সংস্রবে আসিয়াই, বোধ করি, আমাদের এই উৎপাত ঘটিয়াছে। আমরা অনেক তত্ত্ব তাহাদের কেতাব হইতে পড়িয়া পাইয়াছি।—ইহাকেই বলে পোড়ে পাওয়া—অর্থাৎ ব্যবহারী জিনিষ পাইলাম বটে কিন্তু তাহার ব্যবহার জানি না। যাহা শুনিলাম মাত্র, ভাণ করি যেন তাহাই জানিলাম। পরের জিনিষ লইয়া নিজস্ব স্বরূপে আড়ম্বর করি। কথায় কথায় বলি, উনবিংশ শতাব্দী, ওটা যেন নিতান্ত আমাদেরই! এঁকে বলি ইনি আমাদের বাঙ্গালার বাইরন্, ওঁকে বলি উনি আমাদের বাঙ্গালার গ্যারিবল্‌ডি, তাঁকে বলি তিনি আমাদের বাঙ্গালার ডিমস্থিনীস্—অবিশ্রাম তুলনা করিতে ইচ্ছা যায়—ভয় হয় পাছে একটুমাত্র অনৈক্য হয়—হেমচন্দ্র যে হেমচন্দ্রই এবং বাইরন্ যে বাইরনই, তাহা মনে করিলে মন কিছুতেই সুস্থ হয় না। জবর্দস্তি করিয়া কোনমতে বট্‌কে ওক্ বলিতেই হইবে, পাছে ইংলণ্ডের সহিত বাঙ্গালার কোন বিষয়ে এক চুল তফাৎ হয়। এমনতর মনের ভাব হইলে ভাণ করিতেই হয়—পাউডার মাখিয়া শাদা হইতেই হয়, গলা বাঁকাইয়া কথা কহিতেই হয়, ও বিলাতকে "হোম্" বলিতে হয়! সহজ উপায়ে না বাড়িয়া আর একজনের কাঁধের উপরে দাঁড়াইয়া লম্বা হইয়া উঠিবার এইরূপ বিস্তর অসুবিধা দেখিতেছি! আমরা খল্‌সেরা দেখিতেছি অ্যাংবাাংগণ খুব থপ্‌থপ্ করিয়া চলিতেছে, সুতরাং খল্‌সে বলিতেছেন, আমিও যাই! যাও তাহাতে ত দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদের চাল যে স্বতন্ত্র! আংবাাংয়ের চালে চলিতে চেষ্টা করিলে আমাদের চলিবার সমূহ অসুবিধা হইবে এইটে জানা উচিত!

আমাদের এ সাহিত্য প্রতিধ্বনির রাজ্য হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে একটা আওয়াজ ভোঁ ভোঁ করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর নহে, হৃদয়ের কথা নহে, ভাবের ভাষা নহে। কানে তালা লাগিলে যেমন একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়—সে শব্দটা ঘূর্ণাবায়ুর মত বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মস্তিষ্কের সমস্ত ভাবগুলিকে ধূলি ও খড়কুটার মত আসমানে উড়াইয়া দিয়া মাথার খুলিটার মধ্যে শাঁখ বাজাইতে থাকে; জগতের যথার্থ শব্দগুলি একেবারে চুপ করিয়া যায় ও সেই মিথ্যা শব্দটাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বৃত্রাসুরের মত সঙ্গীতের স্বর্গরাজ্যে একাধিপত্য করিতে থাকে; মাথা কাঁদিয়া বলে,

ইহা অপেক্ষা অরাজকতা ভাল, ইহা অপেক্ষা বধিরতা ভাল—আমাদের সাহিত্য তেমনি করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—শব্দ খুবই হইতেছে কিন্তু এ ভোঁ ভোঁ—এ মাথাঘোরা আর সহ্য হয় না!

আমরা বিশ্বামিত্রের মত গায়ের জোরে একটা মিথ্যাজগৎ নির্ম্মাণ করিতে চাহিতেছি—কিন্তু ছাঁচে ঢালিয়া, কুমারের চাকে ফেলিয়া, মস্ত একতাল কাদা লইয়া জগৎ গড়া যায় না! বিশ্বামিত্রের জগৎ ও বিশ্বকর্ম্মার জগৎ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ—বিশ্বকর্ম্মার জগৎ এক অচল অটল নিয়মের মধ্য হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর বিনাশ নাই;—তাহা রেষারেষি করিয়া, তর্জ্জমা করিয়া, গায়ের জোরে, বা খাম্‌খেয়াল হইতে উৎপন্ন হয় নাই; এই নিমিত্তই তাহার ভিত্তি অচলপ্রতিষ্ঠ। এই নিমিত্তই এই জগৎকে আমরা এত বিশ্বাস করি—এই নিমিত্তই এক পা বাড়াইয়া আর এক পা তুলি-বার সময় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয় না পাছে জগৎটা পায়ের কাছ হইতে হুস্ করিয়া মিলাইয়া যায়! আর বিশ্বামিত্রের ঘরগড়া জগতে যে হতভাগ্য জীবদিগকে বাস করিতে হইত তাহাদের অবস্থা কি ছিল একবার ভাবিয়া দেখদেখি! তাহারা তপ্ত ঘিয়ে ময়দার চক্র ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতে বসিত ইহা হইতে লুচি হইবে কি চিনির সর্‌বত হইবে! এক গাছ ফল দেখিলেও তাহাদের গাছে উঠিয়া পাড়িতে প্রবৃত্তি হইত না, সন্দেহ হইত পাছে হাত বাড়াইলেই ও-গুলো পাখী হইয়া উড়িয়া যায়। তাহাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা মিলিয়া তর্ক করিত পায়ে চলিতে হয় কি মাথায় চলিতে হয়; কিছুই মীমাংসা হইত না। প্রতিবার নিশ্বাস লইবার সময় দুটো তিনটে ডাক্তার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইত, নাকে নিশ্বাস লইব কি কাণে নিশ্বাস লইব, কেহ বলিত নাকে, কেহ বলিত কাণে। অবশেষে একদিন ঠিক্ দুপুরবেলা যখন সেখানকার অধিবাসীরা ক্ষুধা পাইলে খাইতে হয় কি উপবাস করিতে হয়, এই বিষয়ে তর্ক করিতে করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ বিশ্বামিত্রের জগৎটা উল্টোপাল্টা হিজিবিজি, হ-য-ব-র-ল হইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফাটিয়া, বোমার মত আওয়াজ করিয়া, হাউয়ের মত আকাশে উঠিয়া সবশুদ্ধ কোনখানে যে মিলাইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত তাহার ঠিকানাই পাওয়া গেল না! তাহার

কারণ আর কিছু নয়—সৃষ্ট হওয়ায় এবং নির্ম্মিত হওয়ায় অনেক তফাৎ। বিশ্বামিত্রের জগৎটা যে অন্যায় হইয়াছিল তা বলিবার যো নাই—তিনি এই জগৎকেই চোখের সমুখে রাখিয়া এই জগৎ হইতেই মাটি কাটাইয়া লইয়া তাঁহার জগৎকে তাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, এই জগতের বেলের খোলার মধ্যে এই জগতের কুলের আঁটি পূরিয়া তাঁহার ফল তৈরি করিয়াছিলেন; অর্থাৎ এই জগতের টুক্‌রো লইয়া খুব শক্ত শিরীষের আঠা দিয়া জুড়িয়াছিলেন সুতরাং দেখিতে কিছু মন্দ হয় নাই। আমাদের এই জগৎকে যেমন নিঃশঙ্কে আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এ আপনার কাজ আপনি করিতেছে, আপনার নিয়মে আপনি বাড়িয়া উঠিতেছে, কোন বালাই নাই, বিশ্বামিত্রের জগৎ সেরূপ ছিল না; তাহাকে ভারি সন্তর্পণে রাখিতে হইত, রাজর্ষি দিনরাত্রি তাহাকে তাঁহার কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া বেড়াইতেন, এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তবুত সে রহিল না! তাহার কারণ, সে মিথ্যা! মিথ্যা কেমন করিয়া হইল! এই মাত্র যে বলিলাম, এই জগতের টুকুরা লইয়াই সে গঠিত হইয়াছে, তবে সে মিথ্যা হইল কি করিয়া? মিথ্যা নয় ত কি? একটি তালগাছের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশ বজায় থাকিতে পারে, ছাল আঁশ কাঠ মজ্জা পাতা ফল শিকড় সমস্তই থাকিতে পারে; কিন্তু যে অমোঘ সজীব নিয়মে তাহার নিজ চেষ্টা ব্যতিরেকেও সে দায়ে পড়িয়া তালগাছ হইয়াই উঠিয়াছে, মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহার তুলসী-গাছ হইবার যো নাই, সেই নিয়মটি বাহির করিয়া লইলে সে তালগাছ নিতান্ত ফাঁকি হইয়া পড়ে, তাহার উপরে আর কিছুমাত্র নির্ভর করা যায় না! তাহার উপরে যে লোক নির্ভর করিতে পারে, সে কৃষ্ণনগরের কারীগরের গঠিত মাটির কলা খাইতেও পারে--কিন্তু সে কলায় শরীর পুষ্টও হয় না, জিহ্বা তুষ্টও হয় না; কেবল নিতান্ত কলা খাওয়াই হয়।

যাহা বলা হইল তাহাতে এই বুঝাইতেছে যে, অংশ লইয়া অনেক লইয়া সত্য নহে, সত্য একের মধ্যে মূল নিয়মের মধ্যে বাস করে। আমাদের সাহিত্যে নবেল থাকিতে পারে, নাটক থাকিতে পারে, মহাকাব্য গীতিকাব্য খণ্ডকাব্য থাকিতে পারে, সাপ্তাহিক পত্র থাকিতে পারে এবং মাসিক পত্রও থাকিতে

পারে কিন্তু সেই অমোঘ নিয়ম না থাকিতেও পারে, যাহাতে করিয়া নবেল নাটক পত্র পুষ্পের মত আপনাআপনি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা একটি গঠিত সাহিত্য দিনরাত্রি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। আমরা লিখিবার আগেই সমালোচনা পড়িতে পাইয়াছি; আমরা আগেভাগেই অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িয়া বসিয়া আছি, তাহার পরে কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছি। সুতরাং ল্যাজায় মুড়ায় একাকার হইয়া সমস্তই বিপর্য্যয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সত্য ঘরে না জন্মাইলে সত্যকে "পুষ্যি" করিয়া লইলে ভাল কাজ হয় না। বরঞ্চ সমস্তই সে মাটি করিয়া দেয়। কারণ সেই সত্যকে জিহ্বার উপরে দিনরাত্রি নাচাইয়া নাচাইয়া আদুরে করিয়া তোলা হয়। সে কেবল রসনা-দুলাল হইয়া উঠে। সংসারের কঠিন মাটিতে নামাইয়া তাহার দ্বারা কোন কাজ পাওয়া যায় না। সে অত্যন্ত খোষ-পোষাকী হয়, ও মনে করে আমি সমাজের শোভা মাত্র! এইরূপ কতকগুলো অকর্ম্মণ্য নবাবী সত্য পুষিয়া সমাজকে তাহার খোরাক যোগাইতে হয়। আমাদের দেশের অনেক রাজা মহারাজা সক্ করিয়া এক একটা ইংরাজ চাকর পুষিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোন কাজ পাওয়া দূরে থাক্, তাহাদের সেবা করিতে করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়! আমরাও তেমনি অনেকগুলি বিলিতি সত্য পুষিয়াছি, তাহাদিগকে কোন কাজেই লাগাইতে পারিতেছি না, কেবল গদ্যে পদ্যে কাগজে পত্রে তাহাদের অবিশ্রাম সেবাই করিতেছি! যোরো সত্য কাজকর্ম্ম করে ও ছিপ্‌ছিপে থাকে, তাহাদের আয়তন দুটো কথার বেশী হয় না, আর নবাবী সত্যগুলো ক্রমিক মোটা হইয়া উঠে ও অনেকটা করিয়া কাগজ জুড়িয়া বসে—তাহার সাজসজ্জা দেখিলে ভাল মানুষ লোকের ভয় লাগে—সর্ব্বাঙ্গে চারিদিকে বড় বড় ইংরাজির তর্জ্জমা, অর্থাৎ ইংরেজি অপেক্ষা ইংরেজিতর সংস্কৃত, বৃহদায়তন ম্লেচ্ছ সংস্কৃত ও অসাধু সাধু ভাষা তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে—তাহারি মধ্যে আবার বন্ধনী-চিহ্নিত ইংরিজি শব্দের উল্কির ছাপ—ইহার উপরে আবার ভূমিকা উপসংহার পরিশিষ্ট—পাছে কেহ অবহেলা করে এই জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাত আটটা করিয়া নকীব তাহার সাতপুরুষের নাম

হাঁকিতে হাঁকিতে চলে—বেকন্, লক্, হবস্, মিল্, স্পেন্সর, বেন্,—শুনিয়া আমাদের মত লোকের সর্দ্দিগর্ম্মি হয়, পাড়াগেঁয়ে লোকের দাঁতকপাটি লাগে! যাহাই হউক, এই ব্যক্তিটার শাসনেই আমরা চলিতেছি। এমূনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সত্য বিলিতি বুট জুতা পরিয়া না আসিলে তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দিই না। এবং সত্যের গায়ে দিশি থান ও পায়ে নাগ্‌রা জুতো দেখিলে আমাদের পিত্তি জ্বলিয়া ওঠে ও তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত তুইতকারি করিতে আরম্ভ করি! যদি শুনিতে পাই সংস্কৃতে এমন একটা দ্রব্যের বর্ণনা আছে, যাহাকে টানিয়া-বুনিয়া টেবিল্ বলা যাইতে পারে, বা রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বিশেষ একটা জায়গায় কাঁটাচামচের সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া গিয়াছে বা বারুণী ব্র্যাণ্ডির, সুরা শেরীর, মদিরা ম্যাডেরার, বীর বিয়ারের অবিকল ভাষান্তর মাত্র—তবে আর আমাদের আশ্চর্য্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না—তখনই সহসা চৈতন্য হয়, তবে আমরা সভ্য ছিলাম! যদি প্রমাণ করিতে পারি, বিমানটা আর কিছুই নয়, অবিকল একখানা বেলুন, এবং শতঘ্নীটা কামান ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না,—তাহা হইলেই ঋষিগুলোর উপর আবার কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হয়! এ সকল ত নিতান্ত অপদার্থের লক্ষণ! সকলেই বলিতেছেন, এইরূপ শিক্ষা এইরূপ চর্চ্চা হইতে আমরা বিস্তর ফল লাভ করিতেছি। ঠিক কথা, কিন্তু সে ফলগুলো কি রকমের? গজভুক্তকপিত্থবৎ!

ইহার ফল কি এখনি দেখা যাইতেছে না! আমরা প্রতিদিনই কি মনুষ্যত্বের যথার্থ গাম্ভীর্য্য হারাইতেছি না। এক প্রকার বিলিতি পুঁতুল আছে তাহার পেট টিপিলেই সে মাথা নাড়িয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে; আমরা অনবরত সেইরূপ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও করিতেছি, মাথা নাড়িয়া খঞ্জনীও বাজাইতেছি, কিন্তু গাম্ভীর্য্য কোথায়! মানুষের মত দেখিতে হয় কই যে, বাহিরে পাঁচ জন লোক দেখিয়া শ্রদ্ধা করিবে! আমরা জগতের সম্মুখে পুঁৎলোবাজি আরম্ভ করিয়াছি, খুব ধড়ফড় ছটফট করিতেছি ও গগনভেদী তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছি। সাহেবেরা কখন হাসিতেছেন, কখন হাততালি দিতেছেন, আমাদের নাচনী ততই বাড়িতেছে, গলা ততই উঠিতেছে! ভুলিয়া যাইতেছি এ কেবল অভিনয়

হইতেছে মাত্র—ভুলিয়া যাইতেছি যে জগৎ একটা নাট্যশালা নহে, অভিনয় করাও যা কাজ করাও তা একই কথা নহে। পুঁতুল নাচ যদি করিতে চাও, তবে তাহাই কর—আর কিছু করিতেছি মনে করিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইও না; মনে করিও না যেন সংসারের যথার্থ গুরুতর কার্য্যগুলি এইরূপ অতি সহজে অবহেলে ও অতি নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছি; মনে করিও না অন্যান্য জাতিরা শত শত বৎসর বিপ্লব করিয়া প্রাণপণ করিয়া, রক্তপাত করিয়া যাহা করিয়াছেন আমরা অতিশয় চালাক জাতি কেবল মাত্র ফাঁকি দিয়া তাহা সারিয়া লইতেছি—জগৎসুদ্ধ লোকের একেবারে তাক লাগিয়া গিয়াছে! আমাদের এই প্রকার চটুলতা অত্যন্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা হইতেই কি প্রমাণ হইতেছে না আমরা ভারি হাল্কা! এ প্রকার ফড়িংবৃত্তি করিয়া জাতিত্বের অতি দুর্গম উন্নতি শিখরে উঠা যায় না এবং এই প্রকার ঝিঁঝিপোকার মত চেঁচাইয়া কাল নিশীথের গভীর নিদ্রাভঙ্গ করান' অসম্ভব ব্যাপার! অত্যন্ত অভদ্র, অনুদার, সংকীর্ণ গর্ব্বস্ফীত ভাবের প্রাদুর্ভাব কেন হইতেছে! লেখায় কুরুচি, ব্যবহারে বর্ব্বরতা, সহৃদয়তার আত্যন্তিক অভাব কেন দেখা যাইতেছে! কেন পূজ্য ব্যক্তিকে ইহারা ভক্তি করে না, গুণের সম্মান করে না, সকলই উড়াইয়া দিতে চায়। মনুষ্যত্বের প্রতি ইহাদের বিশ্বাস নাই কেন? যখনি কোন বড় লোকের নাম করা যায়, তখনি সমাজের নিতান্ত বাজে লোকেরা রাম শ্যাম কার্ত্তিকেরাও কেন বলে, হুঁঃ, অমুক লোকটা ফাঁকি দিয়া নাম করিয়া লইয়াছে, অমুক লোকটা আর এক জনকে দিয়া লিখাইয়া লয়, অমুক লোকটা লোকের কাছে খ্যাত বটে, কিন্তু খ্যাতির যোগ্য নহে! ইহারা প্রাণ খুলিয়া ভক্তি করিতে জানে না, ভক্তি করিতে চাহে না, ভক্তিভাজন লোকদিগকে হুট্ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে মস্ত লোক মনে করে, এবং যখন ভক্তি করা আবশ্যক বিবেচনা করে তখন সে কেবল ইংরাজি দস্তুর বলিয়া—সভ্যজাতির অনুমোদিত বলিয়া করে, মনে করে, দেখিতে বড় ভাল হইল। এত অবিশ্বাস কেন, এত অনাদর কেন, এত স্পর্দ্ধা কেন—অভদ্রতা এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে কেন, ছেলেপিলেগুলো দিনরাত্রি এত রুখিয়া আছে কেন, দাম্ভিক ভীরুদিগের ন্যায় অকারণ গায়ে পড়া রূঢ় ব্যবহার ও আড়ম্বরপূর্ণ আস্ফালনের

সামান্য অবসর পাইলেই আপনাদিগকে মহাবীর বলিয়া মনে করিতেছে কেন; এই সকল হঠাৎসভ্য হঠাৎবীরগণ বুকে চাদর বাঁধিয়া মালকোচা মারিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া তোপের বদলে তুড়ি দিয়া ফুঁ দিয়া বিশ্ব-সংসার উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন কেন? তাহার এক মাত্র কারণ, ভাণের প্রাচুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া,—কিছুরই পরে যথার্থ শ্রদ্ধা নাই, কিছুরই যে যথার্থ শ্রদ্ধা আছে, কিছুরই যে যথার্থ মূল্য আছে তাহা কেহ মনে করে না, সকলই মুখের কথা, আস্ফালনের বিষয় ও মাদকতার সহায় মাত্র! সেই জন্যই সকলেই দেখিতেছেন, আজকাল কেমন এক রকম ছিবলেমির প্রাচুর্ভাব হইয়াছে! জগৎ যেন একটা তামাসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমরা কেবল যেন মজা দেখিতেই আসিয়াছি। খুব মীটিং করিতেছি, আজ এখানে যাইতেছি, কাল ওখানে যাইতেছি, ভারি মজা হইতেছে! আতস বাজি দেখিলে ছেলেরা যেমন আনন্দে একেবারে অধীর হইয়া উঠে, এক একজন লোক বক্তৃতা দেয় আর ইহাদের ঠিক তেমনিতর আনন্দ হইতে থাকে, হাত পা নাড়িয়া চেঁচাইয়া, করতালি দিয়া আহ্লাদ আর রাখিতে পারে না;—বক্তাও উৎসাহ পাইয়া আর কিছুই করেন না, কেবলই মুখ-গহ্বর হইতে তুবড়িবাজি ছাড়িতে থাকেন, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের আর কোন উপকার না হউক্ অত্যন্ত মজা বোধ হয়! মজার বেশী হইলেই অন্ধকার দেখিতে হয়, মজার কম হইলেই মন টেঁকেনা, যেমন করিয়া হউক মজাটুকু চাইই। যতই গম্ভীর হউক ও যতই পবিত্র হউক না কেন, জীবনের সমুদয় অনুষ্ঠানই একটা মীটিং গোটাকতক হাততালি ও খবরের কাগজের প্রেরিত পত্রে পরিণত করিতে হইবে—নহিলে মজা হইল না! গম্ভীর ভাবে অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার কাজ আপনি করিব, আপনার উদ্দেশ্যের মহত্বে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া তাহারি সাধনায় অবিশ্রাম নিযুক্ত থাকিব, সুদূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষিণে বামে কোন দিকে দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া সীধা রাস্তা ধরিয়া চলিব; চটক লাগাইতে করতালি জাগাইতে চেঁচাইয়া ভূত ভাগাইতে নিতান্তই ঘৃণা বোধ করিব, কোথাকার কোন্ গোরা কি বলে-না-বলে তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিব না এমন ভাব আমাদের মধ্যে কোথায়! কেবলি হৈ হৈ করিয়া বেড়াইব ও

মনে করিব কি-যেন একটা হইতেছে! মনে করিতেছি ঠিক এই রকম বিলাতে হইয়া থাকে, ঠিক এই রকম পার্ল্যামেণ্টে হয়, এবং আমাদের এই আওয়াজের চোটে গবর্ণমেণ্টের তক্তপোষের নীচে ভূমিকম্প হইতেছে! আমরা গবর্ণমেণ্টের কাছে ভিক্ষা করিতেছি, অথচ সেই সঙ্গে ভাণ করিতেছি যেন বড় বীরত্ব করিতেছি; সুতরাং চোক রাঙাইয়া ভিক্ষা করি ও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে খাইতে মনে করি হ্যাম্প্‌ডেন ও ক্রমোয়েলগণ ঠিক এইরূপ করিয়াছিলেন; আহারটা বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক হয়! কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চোক রাঙানি ও বুক ফুলানির যতই ভাণ কর না কেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিকে আমাদের উন্নতির একমাত্র বা প্রধানতম উপায় বলিয়া গণ্য করিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের যথার্থ উন্নতি ও স্থায়ী মঙ্গল কখনই হইবে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অলক্ষ্য ও অদৃশ্যভাবে পিছনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিব। গবর্ণমেণ্ট যতই আমাদিগকে এক একটি করিয়া অধিকার ও প্রসাদ দান করিতেছেন, ততই দৃশ্যতঃ লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু অদৃশ্যে যে লোকসানটা হইতেছে, তাহার হিসাব রাখে কে? ততই যে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর বাড়িতেছে; ততই যে উর্দ্ধ কণ্ঠে বলিতেছি, "জয় ভিক্ষাবৃত্তির জয়,"—ততই যে আমাদের প্রকৃত জাতিগত ভাবের অবনতি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে মাঝে মাঝে আমাদের আশাভঙ্গ করিয়া দেন, আমাদের প্রার্থনা বিফল করিয়া দেন, তাহাতে আমাদের মহৎ উপকার হয়, আমাদের সহসা চৈতন্য হয়, যে পরের উপরে যতখানা নির্ভর করে ততখানাই অস্থির, এবং নিজের উপর যতটুকু নির্ভর করে, তত টুকুই ধ্রুব! এ সময়ে, এই লঘুচিত্ততার নাট্যোৎসবের সময়ে আমাদিগকে যথার্থ মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ শিখাইবে কে? অতিশয় সহজসাধ্য ভাণ দেশহিতৈষিতা হইতে ফিরাইয়া লইয়া যথার্থ গুরুতর কঠোর কর্ত্তব্য সাধনে কে প্রবৃত্ত করাইবে! সাহেবদিগের বাহাবাধ্বনির ঘোরতর কুহক হইতে কে মুক্ত করিবে! সে কি এই ভাণ সাহিত্য! এই ফাঁকা আওয়াজ! সকলেই একতানে ঐ একই কথা বলিতেছ কেন? সকলেই একবাক্যে কেন বলিতেছ ভিক্ষা চাও, ভিক্ষা চাও! কেহ কি হৃদয়ের কথা বলিতে জানে না! কেবলিই কি প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি

উঠাইতে হইবে! যতবড় গুরুতর কথাই হউক না কেন, দেশের যতই হিত বা অহিতের কারণ হউক না কেন, কথাটা লইয়া কি কেবল একটা রবরের গোলার মত মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া বেড়াইতে হইবে! এ কি কেবল খেলা! এ কি তামাসা, আর কিছুই নয়! যথার্থ হৃদয়বান্ লোক যদি থাকেন তাঁহারা একবার একবাক্যে বলুন—যে, যথার্থ কর্ত্তব্য কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরের মুখাপেক্ষা না করিয়া পরের প্রশংসাপেক্ষা না করিয়া গম্ভীর ভাবে আমরা নিজের কাজ নিজে করিব, সবই যে ফাঁকি, সবই যে তামাসা, সবই যে কণ্ঠস্থ, তাহা নয়—কর্ত্তব্য যতই সামান্য হউক্ না কেন, তাহার গাম্ভীর্য্য আছে, তাহার মহিমা আছে, তাহার সহিত ছেলেখেলা করিতে গেলে তাহা অতিশয় অমঙ্গলের নিদান হইয়া উঠে। Agitation করিতে হয় ত কর, কিন্তু দেশের লোকের কাছে কর—দেশের লোককে তাহাদের ঠিক অবস্থাটি বুঝাইয়া দাও,—বল যে গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবার তাহা করিতেছেন, কেবল তোমরাই কিছু করিতেছ না! তোমরা শিক্ষা লাভ কর, শিক্ষা দান কর, অবস্থার উন্নতি কর। দেশের যাহা কিছু অবনতি তাহা তোমাদেরই দোষে, গবর্ণমেণ্টের দোষে নহে। এ কথা বলিবামাত্রই চারি দিকের খুচ্রা কাগজপত্রে বড্ড গোলমাল উঠিবে—তাহারা বলিবে এ কি কথা! ইংলণ্ডে ত এরূপ হয় না, Political Agitation বলিতে ত এমন বুঝায় না, Mazzini ত এমন কথা বলেন নাই; Garibaldi যে আর এক রকম কথা বলিয়াছেন—Washington-এর কথার সহিত এ কথাটার ঐক্য হইতেছে না, যদি এক্টা কাজ করিতেই হইল তবে ঠিক পার্লামেণ্টের অনুসারে করাই ভাল ইত্যাদি। উহারাও আবার যদি কথা কহিতে আসে ত কহুক্ না, উহাদের মাথা চাস করিলে বালি ওঠে, আবাদ করিলে কচুও হয় না, অতএব বাঁধি বোলের মহাজনী না করিলে উহাদের গুজ্রান্ চলে না! কিন্তু হৃদয়ের কথা সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া কানের মধ্যে গিয়া পৌঁছাইবেই ইহা নিশ্চয়ই।

সে দিন কথোপকথন কালে একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, রোমকেরা যখন প্রাচীন ইংলণ্ডের অকালসভ্য শেণ্টদিগকে ফেলিয়া আসিয়া ছিল, তখন তাহারা ইংলণ্ডেই পড়িয়া ছিল, কিন্তু ইংরাজ যদি কখন ভারত-

বর্ষ হইতে চলিয়া যায়, তবে জাহাজে গিয়া দেখিবে বাঙ্গালীরা আগেভাগে গিয়া কাপ্তেন নোয়া সাহেবের পা-দুটি ধরিয়া জাহাজের খোলের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়া গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া আছে! আর কেহ যাক্ না যাক্—আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যটা ত যাইবেই! কারণ ইংরাজি সাহিত্যের গ্যাস-লাইট্ ব্যতীত এ সাহিত্য পড়া যায় না, হৃদয়ের আলোক এখানে কোন কাজেই লাগিবে না, কারণ, ইহা হৃদয়ের সাহিত্য নহে। আমরা বাংলা পড়ি বটে কিন্তু ইংরাজির সহিত মিলাইয়া পড়ি—ইংরাজি চলিয়া গেলে এ বাংলা রাশীকৃত কতকগুলো কালো কালো আঁচড়ে পরিণত হইবে মাত্র! সুতরাং সেই হীনাবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এ যে আগেভাগে জাহাজে গিয়া চড়িয়া বসিবে তাহার কোন ভুল নাই—সেখানে গিয়া বাবুর্চ্চিখানার উনুন জ্বালাইবে বটে, কিন্তু তবুও থাকিবে ভাল!

অকাল কুষ্মাণ্ড কাহাকে বলে জানি না, কিন্তু এরূপ সাহিত্যকে কি বলা যায় না!

একটা আশার কথা আছে; এ সাহিত্য চিরদিন থাকিবার নহে। এ সাহিত্য নিজের রোগ নিজে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ নিজের বিনাশ নিজে সাধন করিবে—কেবল দুঃখ এই যে, মরিবার পূর্ব্বে বিস্তর হানি করিয়া তবে মরিবে; অতএব এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল। প্রভাত হইবে কবে, নিশাচরের মত অন্ধকারে কতকগুলা মশাল জ্বালাইয়া তারস্বরে উৎকট উৎসবে না মাতিয়া, কবে পরিষ্কার দিনের আলোতে বিমল-হৃদয়ে আগ্রহের সহিত, সকলে মিলিয়া নূতন উৎসাহে, স্বাস্থ্যের উল্লাসে, সংসারের যথার্থ কাজগুলি সমাধা করিতে আরম্ভ করিব সেই দিন প্রভাতে বাঙ্গালীর যথার্থ হৃদয়ের সাহিত্য জাগিয়া উঠিবে, অলসদিগকে ঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিবে, নিরাশ-হৃদয়েরা পাখীর গান শুনিয়া প্রভাতের সমীরণ স্পর্শ করিয়া ও নবজীবনের উৎসব দেখিয়া নূতন প্রাণ লাভ করিবে অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশ হইতে নিদ্রার রাজত্ব, প্রেতের উৎসব, অস্বাস্থ্যের গুপ্ত সঞ্চরণ একেবারে দূর হইয়া যাইবে। জানি না সে কোন্ শক কোন্ সাল সেই বৎসরই সাবিত্রী লাইব্রেরির যথার্থ গৌরবের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে, সে দিনকার লোকসমাগম, সে দিনকার উৎসাহ, সে দিনকার প্রতি-

ভার দীপ্তি ও কেবলমাত্র বহিস্থিত দর্শকের জড় কৌতূহলের ভাব নহে, যথার্থ প্রাণে প্রাণে মিলন কল্পনা-চক্ষে স্পষ্টই ছায়ার মত দেখা যাইতেছে !

হাতে কলমে। *

---o---

প্রেমের ধর্ম্ম এই, সে ছোটকেও বড় করিয়া লয়। আর, আড়ম্বর-প্রিয়তা বড়কেও ছোট করিয়া দেখে। এই নিমিত্ত প্রেমের হাতে কাজের আর অন্ত নাই, কিন্তু আড়ম্বরের হাতে কাজ থাকে না। প্রেম শিশুকেও অগ্রাহ্য করে না, বার্দ্ধক্যকে উপেক্ষা করে না, আয়তন মাপিয়া সমাদরের মাত্রা স্থির করে না। প্রেমের অসীম ধৈর্য্য; যে চারা শত বৎসর পরে ফলবান্ হইবে, তাহাতেও সে এমন আগ্রহ সহকারে জল-সেক করে, যে, ব্যবসায়ী লোকেরা ফলবান্ তরুকেও তেমন যত্ন করিতে পারে না। সে যদি একটা বড় কাজে হাত দেয়, তবে তাহাব ক্ষুদ্র সোপানগুলিকে হতাদর করে না। প্রেম, প্রেমের সামগ্রীর বসনের প্রান্ত চরণের চিহ্ন পর্য্যন্ত ভালবাসিয়া দেখে। আর আড়ম্বর ধরাকেও সরা জ্ঞান করেন। ছোট কাজের কথা হইলেই তিনি বলিয়া বসেন, 'ও পরে হইবে।' তিনি বলেন এক-পা এক-পা করিয়া চলা ওত আপামর সাধারণ সকলেই করিয়া থাকে, তবে উৎকট লম্ফ-প্রয়োগ যদি বল তবে তিনিই তাহা সাধন করি-বেন, এবং ইতিহাস যদি সত্য হয়, তবে ত্রেতাযুগে তাহারই এক পূর্ব্ব পুরুষ তাহা সাধন করিয়াছিলেন। † তিনি এমন সকল কাজে হস্তক্ষেপ করেন যাহা "উনবিংশ শতাব্দীর" শাস্ত্র-সম্মত, ইতিহাস-সম্মত, যাহা কনষ্টিট্যুশনল। সমস্ত ভারতবর্ষের যত দুঃখ দুর্দ্দশা দুর্ঘটনা দুর্ণাম আছে সমস্তই তিনি বালীর লাঙ্গুল-পাশবদ্ধ দশাননের ন্যায় এক পাকে জড়াইয়া এককালে ভারত-সমুদ্রের জলে ডুবাইয়া মারিবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন একটা ক্ষুদ্র অংশের কোন একটা কাজ সে তাঁহার দ্বারা হইয়া

---

* সন ১২৯১ সালের ১১ই ভাদ্র সাবিত্রী-সভার ৬ষ্ঠ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

† ইহা যদি কেহ 'রুচিবিরুদ্ধ' বা গালাগালি জ্ঞান করেন তবে আমি "উনবিংশ শতাব্দীর" ডারুয়িনের দোহাই দিব।

উঠিবে না। বিপুলা পৃথিবীতে জন্মিয়া ইঁহার আর কোন কষ্ট নাই, কেবল স্থানাভাবের জন্য কিঞ্চিৎ কাতর আছেন। বামনদেব তিন পায়ে তিন লোক অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তদপেক্ষা বামন এই বামনশ্রেষ্ঠের জিহ্বার মধ্যে তিন্‌টে লোক তিনখানা বাতাসার মত গলিয়া যায়। "হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী" ও "সিন্ধু নদ হইতে ব্রহ্মপুত্রের" মধ্যে অবিশ্রাম ফুঁ দিয়া ইনি একটা বেলুন বানাইতেছেন, অভিপ্রায়, আস্‌মানে উড়িবেন, সেখানে আকাশকুসুমের ফলাও আবাদ করিবার অনুষ্ঠান পত্র বাহির হইয়াছে। ইনি যদি ইঁহার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করেন সে এক রকম হয়, আর তা' যদি নিতান্ত না পারেন তবে না হয় খুব ঘটা করিয়া নিদ্রার আয়োজন করুন। হিমালয় নামক উঁচু জায়গাটাকে শিয়রের বালিশ করিয়া কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পা ছড়াইয়া দিন, দুই পাশে দুই ঘাটগিরি রহিল।

কেবল আড়ম্বর-প্রিয়তার নহে, ক্ষুদ্রত্বেরই লক্ষণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের প্রতি মন দিতে পারে না। পিপীলিকাকে আমরা যে চক্ষে দেখি, ঈশ্বর সে চক্ষে দেখেন না। বড়র প্রতি যে মনোযোগ বা হস্তক্ষেপ করে, আত্ম-শ্লাঘা, যশ, ক্ষমতা প্রাপ্তির আশায় সদাসর্ব্বক্ষণ তাহাকে উত্তেজিত করিয়া রাখিতে পারে, সে তাহার ক্ষুদ্রত্বের চরম পরিতৃপ্তিলাভ করিতে থাকে। কিন্তু ছোটর প্রতি যে মন দেয়, তাহার তেমন উত্তেজনা কিছুই থাকে না সুতরাং তাহার প্রেম থাকা চাই, তাহার মহত্ত্ব থাকা চাই—তাহার পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই, সে প্রাণের টানে—সে নিজের মহিমার প্রভাবে কাজ করে, তাহার কাজের আর অন্ত নাই।

আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশ-প্রেম যাহার বেশী সেই প্রাণ ধরিয়া স্বদে-শের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে; সে কিছুই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে না। বাস্তবিক পক্ষে কোন্‌টা ছোট কোন্‌টা বড় তাহা স্থির করিতে পারে কে! ইতিহাস বিখ্যাত একটা কুহেলিকাময় দিগ্‌গজ ব্যাপারই যে বড়, আর দ্বারের নিকটস্থ একটী রক্তমাংসময় দৃষ্টিগোচর অসম্পূর্ণতাই যে সামান্য তাহা কে জানে! কিসের হইতে যে কি হয়, কোন্‌ ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে কোন্‌ বৃহৎ বৃক্ষ হয় তাহা জানি না, এই পর্য্যন্ত

জানি সহজ হৃদয়ের প্রেম হইতে কাজ করিলে কিছুই আর ভাবিতে হয় না। কারণ, সহজ ভাবের গুণ এই, সে আর হিসাবের অপেক্ষা রাখে না। তাহার আপনার মধ্যেই আপনার নথী, আপনার দলিল। তাহাকে আর চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দ রচনা করিতে হয় না, সুতরাং তাহার আর ছন্দোভঙ্গ হয় না, আর যাহাকে গণনা করিতে হয়, তাহার গণনায় ভুল হইতেই বা আটক কি? সে বড়কে ছোট মনে করিতে পারে, ছোটকে বড় মনে করিতে পারে।

আমাদের স্বদেশহিতৈষীদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাহাদের এক হাতে ঢাল, এক হাতে তলোয়ার—তাহাদের হাতের অপেক্ষা হাতিয়ার বেশী হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য কাজ কর্ম্ম একেবারে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এবং এই অবসরে দু-শ পাঁচ-শ উর্দ্ধপুচ্ছ জিহ্বা এককালে ছাড়া পাইয়া দেশের লোকের কাণের মাথাটী মুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছে। এই সকল ভীমার্জ্জুনের প্রপৌত্রগণের, স্বদেশের উপর প্রেম এত অত্যন্ত বেশী যে স্বদেশের "লোকের" উপর প্রেম আর বড় অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে, ইহারা স্বদেশের হিতসাধনে অত্যন্ত উন্মুখ, সুতরাং স্বদেশীর হিতসাধনে সময় পান না। ব্যাপারটা যে কিরূপ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। ঘোড়াটা না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, ও সকলে মিলিয়া একটা ঘোড়ার ডিম লইয়া 'তা' দিতেছেন, দেশে বিদেশে রাষ্ট্র তাহা হইতে এক যোড়া পক্ষিরাজের জন্ম হইবে।

যে ব্যক্তি দয়া প্রচার করিয়া বেড়ায় অথচ ভিক্ষুককে এক মুঠা ভিক্ষা দেয় না তাহার প্রতি আমার কেমন স্বভাবতই অবিশ্বাস জন্মে। সে, কথায় কথায় বেশী করিয়া চেক্ কাটে, কেন না কোন ব্যাঙ্কেই তাহার এক পয়সা জমা নাই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে দেশহিতৈষিতা ষোল আনা দেখিতেছি কিন্তু দেশহিতকর কার্য্য অধিক দেখি না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। আজ কাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ কর্ত্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা না একটা শুনিতেই হয়। কিন্তু কে সেই স্বদেশীয় অসহায়দের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়! বাঙ্গালার জেলায় জেলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিলিতি

উত্তরাধিকারীগণ চাবুক হস্তে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যে রাজত্ব অর্থাৎ অরাজকত্ব করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি গরীব অনাথদের পরিত্রাণ করিতে কে ধাবমান্ হয়! পেট্রিয়টেরা বলিতেছেন, স্বদেশের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ তাঁহারা পাকে প্রকারে জানাইতে চান্ তাঁহাদের হৃদয় নামক একটা পদার্থ আছে, তাঁহারা তাঁহাদের "মাথা ব্যথার" কথাটা এমনই রাষ্ট্র করিয়া দিতেছেন যে, লোকে তাঁহাদের মাথা না দেখিতে পাইলেও মনে করে সেটা কোন জায়গায় আছে বা। কিন্তু হৃদয় যদি থাকিবে, হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় না কেন? চারি দিক হইতে যখন নিপীড়িত স্বদেশীয়দের আর্ত্তস্বর উঠিতেছে, তখন সেই স্বজাতি-বৎসল হৃদয় নিদ্রা যায় কি করিয়া? এই ত সে দিন শুনিলাম, স্বজাতি-দুঃখকাতর কতকগুলি লোক মিলিয়া একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের দেশীয় ব্যারিষ্টার অনেকগুলি তাহাতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বোধ করি, উক্ত ব্যারিষ্টারগুলির মধ্যে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত এমন অল্প লোকই আছেন যাঁহারা বিদেশীয় অত্যাচারীর হস্ত হইতে স্বদেশীয় অসহায়কে মুক্তি দিবার জন্য প্রাণ ধরিয়া টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। স্বজাতির প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক প্রাণের টান নাই, তাঁহাদের "স্বদেশ" জিনিসটা কি জানিতে কৌতুহল হয়। সেটা কি রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান ও রাবণ বিবর্জ্জিত রামায়ণ, না কলার আত্যন্তিক অভাব বিশিষ্ট কলার কাঁদি! না লাঙ্গুলের সম্পর্কশূন্য কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড!

ইতিহাসপড়া স্বদেশহিতৈষিতা এমনিতর একটা ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া-ঘাস খাওয়া। দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত স্বদেশের দুঃখে যাহাদের হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হয়, তাহারা সেই হৃদয়বিদারণ ব্যাপারটাকে বিশেষ একটা দুর্ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে না। তাহারা সেই বিদীর্ণ হৃদয়টাকে সভায় লইয়া আসে, তাহার মধ্যে ফুঁ দিয়া ভেঁপু বাজাইতে থাকে ও উৎসব বাধাইয়া দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই বিদীর্ণ হৃদয়ের রীতিমত কন্সর্ট বসিয়া গেছে, নৃত্যেরও বিরাম নাই। কিন্তু এই অবিশ্রাম নৃত্যের উৎসাহে কিছুক্ষণের মধ্যে নটদিগের শরীর ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে ও তাহারা নাট্যশালার আলো নিবাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহে শয়ন করে। কিন্তু দেশের

লোকের সত্যকার ক্রন্দনধ্বনিতে অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত কাল্পনিক অশ্রুজল নহে,—মনুষ্যচক্ষু-প্রবাহিত লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সত্যকার অশ্রুধারায়, যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কেবল মাত্র শ্রোতৃবর্গের করতালি বর্ষণে তাঁহাদের সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের শান্তি নাই। তাঁহারা কাতরের অশ্রুজল মুছাইবার জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার অনায়াসে করিতে পারেন। তাঁহারা কাজ করেন।

যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিরূপ কাজ তাহার উপযোগী তাহা জানি না! অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের আর ঔষধ নাই—অবশ্য, রোগীর ধাত বুঝিয়া। যাহারা খৃষ্টান সভ্যতার ভাণ করিয়াও মনে মনে পশুবলের উপাসক, অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না, খেলাচ্ছলে কালো মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোন ঔষধ কি তাহারা মানে! স্নিগ্ধ কবিরাজি তৈল তাহাদের চরণে অবিশ্রাম মর্দ্দন করিয়া তাহার কি কোন ফল দেখা গেল! ইহাদের হিংস্র প্রবৃত্তি বোধ করি ব্যাঘ্রের মত ইহাদের হৃদয়ের ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, অবসর পাইলেই কাতরের মাথার উপরে অকাতরে লম্ফ দিয়া পড়ে।

ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিষ জাতি। তাহারাও খুনী, এই জন্য তাহারা খুনের মাস্টারটিংচার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা তাহাদের দুঃখ নিরাকরণের সহজ উপায় দেখে নাই, এই জন্য ডাকের পরিবর্ত্তে ডাইনামাইট-যোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে! Similia Similibus Curantur, অর্থাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, ইহা হোমিওপ্যাথিক বৈদ্যদের মত। কিন্তু আমরা ত খুনী জাত নহি, এবং ততদূর সভ্য হইয়া উঠিতে আমরা চাহিও না; মুষ্টিযোগ চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমাদের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই, এবং সে চিকিৎসা রোগীর পক্ষে শুভফলপ্রদ হইলেও চিকিৎসকের পক্ষে পরিণামে শুভকরী নহে। সুতরাং আমাদিগকে অন্য কোন সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরাজের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা দেশীয় লোকদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিব। দেশের লোকের জন্য কেবল জিহ্বা আন্দোলন নহে,

যথার্থ স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিব। বিদেশীয়ের হস্তে দেশের লোকের বিপদ নিজের অপমান ও নিজের বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিব। নহিলে একে, ইংরেজেরা আমাদের বিধাতৃ পুরুষ, মফঃস্বলে তাহাদের অসীম প্রভাব, তাহারা সুশিক্ষিত সতর্ক, তাহাতে আবার ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ইংরাজ জুরি তাহাদের বিচারক, কেবল তাহাই নয়, তাহাদের স্বজাতি সমস্ত অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান তাহাদের সহায়—এমন স্থলে একজন ভীত, ত্রস্ত, অশিক্ষিত, স্বদেশী-সহায়বর্জ্জিত, দরিদ্র কৃষ্ণকায়ের আশা ভরসা কোথায়!

আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate কর, অর্থাৎ বাক্‌যন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিও না। ইলবার্টবিল ও লোকাল্ সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল এই হইবে যে, লোকেদের মধ্যে পোলিটিকল্ এডুকেশন্ বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে লোকে তাহাই শিখিবে। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্ত্যবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কন্‌ষ্টিটুশনল্ হিষ্ট্রি-পড়া ইংরাজি বক্তৃতার শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে "পোলিটিকল্ এডুকেশন" প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। আমি বোধ করি, এসকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ক লাউ কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না! যতবার মফঃস্বলে একজন ইংরাজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা এক-পা করিয়া আরও নাবিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া। যাহার গৃহের সম্ভ্রম প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে, তুমি তাহাকে লোকল্ সেলফ্ গবর্ণমেণ্টের মাচার উপর চড়াইয়া কি আর রাজা করিবে বল! ঘরে যাহার হাঁড়ি চড়ে না, তুমি তাহার ছবির হাতে একটা টাকার তোড়া আঁকিয়া তাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা কিরূপে নিবারণ করিবে! যাহারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, শাসনকর্ত্তা-

দের ভয়ে যাহাদের অহর্নিশি নাড়ি ঠক্ ঠক্ করিতেছে, তাহাদের হাতে শাসনভার দিতে যাওয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা দিতে চাও ত এক কাজ কর, একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ কর, একবার সে বুঝিতে পারুক্ ইংরাজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে, একবার সে হৃদয়ের মধ্যে জয়গর্ব্ব অনুভব করুক, একবার তাহার হৃদয়ের ন্যায্য প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ হউক্! তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। সে জ্ঞান যদি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল না হয় তবে জাতির উন্নতি কোথায়! ইংরাজেরা যে আমাদের পশুর ন্যায় জ্ঞান করে, ও তাহা ব্যবহারে ক্রমাগত প্রকাশ করে, ড্যাম নিগর বলিয়া সম্বোধন করে, ও কটাক্ষপাতে কাঁপাইয়া তোলে, ইহার যে কুফল তাহার প্রতিবিধান কিসে হইবে! Agitate-করিয়া দরখাস্ত করিয়া একটা সুবিধাজনক আইন পাস্ করাইয়া যেটুকু লাভ, তাহাতেও এ লোকসান পূরণ করিতে পারে না। ইংরাজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে, ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান্ হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভ দিনই বা কখন আসিবে! যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চ্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীয়দের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদেশে প্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারিদিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারো সাহায্য পাই না, কেহ বলেন না মা ভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে

দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে যে জনমণ্ডলী দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয় পরিবার মনে করিতে হইবে! কেন করিতে হইবে! না সহরের কালেজ হইতে একজন ব্যক্তি আসিয়া অত্যন্ত উর্দ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এই জন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতে কলমে এক একজন করিয়া দেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর, হাই তুলিয়াছিল, তাহার পরে চোক বুজিয়া ঢুলিয়াছিল, ও অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যপীরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময় অকুল-পাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোন কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারিদিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশ-প্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে। তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব, স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়ের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কি, আস্ফালনই বা কি? আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা "agitate" করিতে যাইব?

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সঙ্কোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া যোড়হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারী করি, ও তাহার খানসামা রসুল বক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুসী করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারী বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেল গাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও বাবু অর্থে মসীজীবি ভীরু দাসকে বোঝে, ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাঁহাদের আহার্য্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবল মাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কি করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কি, আমরাও ঠিক অমনি করিব, ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; কিন্তু একটা constitutional সিংহ-চর্ম্ম পরিলেই কি খুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে! গল্প আছে একটা গরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটী লম্ফ ঝম্প করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্য খণ্ড খাইতে পাইত; গরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আটি নীরবে চর্ব্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই এক টুকুরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোল জিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়াদড়ি ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি গোষ্ঠ-

বিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল, কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিট-থাবড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাত যোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতর তামাসা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধূলা লইয়া যোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, "দোহাই সাহেব, দোহাই হুজুর, ধর্ম্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অতি পরিপক্ক কদলী-লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পার্শ্বে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব। যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্র-চিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতিদিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি ঝাঁটার অপমান-চিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যে পদ বৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদ শব্দ বেশী হয় বটে, কিন্তু সে জিনিষটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মত ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়াইলেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন ত ঘুচিল না; এই রূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনই কি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না পরের এমনিই কি মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্বভাষায় কথা কই না, স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া

দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তি-সুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষায়, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতি-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়ত সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাঁহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা করিতে থাকেন ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিবে! সে স্থলে স্বজাতি বলিতে বোধ হয় তাঁহারা আপনাদের গুটিকয়েককে বুঝেন, ও নিজেদের সামান্য অভিমানে আঘাত লাগাতে স্বজাতির অপমান হইয়াছে জ্ঞান করেন। আমাদের গলার শৃঙ্খলটা ধরিয়া ইংরাজ যদি আমাদিগকে তাঁহাদের ফাঁসিকাঠে অত্যন্ত উঁচু জায়গায় লট্‌কাইয়া দেয় তাহা হইলেই কি আমাদের চরম উন্নতি কি আমাদের পরম সম্মান হইল! যথার্থ স্থায়ী ও ব্যাপক উন্নতি কি আমাদের নিজের ভাষা নিজের সাহিত্য নিজের গৃহের মধ্য হইতে হইবে না! নহিলে পেটের মধ্যে ক্ষুধা লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইলে কিরূপ স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে! হৃদয়ের মধ্যে আত্মাবমান বহন করিয়া অনুগ্রহলব্ধ বাহিরের সম্মান খুঁটিয়া খুঁটিয়া ময়ূরপুচ্ছ বিস্তার করিলে মহত্ত্ব কি! যেমন তেলা মাথায় লোকে তেল দেয়, তেমনি টাকগ্রস্থ মাথা হইতে লোকে চুল ছিঁড়িয়া লয়। যে অবমানিত, তাহাকে আরও অবমানিত করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা ঘরে অবমানিত, সেই জন্যই আমাদিগকে পরে অপমান করে। সেই জন্য বলিতেছি, আইস আমরা ঘরের সম্মান রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই; স্বহস্তে আমাদের উৎকর্ষ সাধন করি; আমাদের গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করি; তবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বল সঞ্চয় হইবে। তখন এমন মহত্ত্ব লাভ করিব যে পরের কাছে সামান্য সম্মানটুকু না পাইলে দিন রাত্রি খুৎ খুৎ করিয়া মারা পড়িব না।

যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—ইংরাজেরা আমাদিগকে সম্মান করে না, তাহাদের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করে এই জন্য সর্ব্বত্র শ্বেত

বৃক্ষের প্রভেদ রাখিতে চায়। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সকলেই প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা ইংরাজের নিকটে খুব গলা ছাড়িয়া বলিতে থাকি, তোমরা আমাদিগকে হীন-জ্ঞান করিও না, তাহা হইলেই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিবে।

আমি বলিতেছি প্রথমতঃ এ প্রস্তাবটা অসঙ্গত, দ্বিতীয়তঃ, যদি বা ইংরাজরা আমাদিগের প্রতি সম্মানের ভাণ করে, তাহাতেই বা আমাদের লাভ কি! বিকারের রোগী কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছে দেখিয়া তুমি না হয় তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিলে কিন্তু তাহার রোগের উপায় কি করিলে! আমাদের দেশের দুরবস্থার কারণ তাহার অস্থিমজ্জার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, বাহ্যিক লক্ষণ যে সকল প্রকাশ পাইতেছে তাহা ভাল বই মন্দ নহে, কারণ, তাহাতে রোগের নির্ণয় হয়। আমি তাহার রীতিমত, চিকিৎসার জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। আর, রোগও ত একআধটা নহে; আমাদের দেশের শরীরং ত ব্যাধিমন্দিরং নহে এ যে একেবারে ব্যাধিব্যারাকং।

যদি আমার এই কথা কাহারো যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, যদি দৈবক্রমে আমার এ সকল কথা কাহারও হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায়, তিনি সহসা এমন স্থির করিতে পারেন যে, একটা সভা আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া দেশের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় তাহা নহে।

এখন আমাদের কি কাজ! এখন কি "সভা" নামক একটা প্রকাণ্ডকায় যন্ত্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব? মনে করিব যে, আমাদের স্বদেশকে একটা এঞ্জিনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিলাম, এখন এ ঊর্দ্ধশ্বাসে উন্নতির পথেই ছুটিতে থাকুক্! এখন কি Public নামক একটা কাল্পনিক ভাঙ্গাকুলার উপরে দেশের সমস্তই ছাই ফেলিবার ভার অর্পণ করিব, ও যদি তাহাতে ত্রুটি দেখিতে পাই, তবে সেই অনধিগম্য উপছায়ার প্রতি অত্যন্ত অভিমান করিয়া ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইব! অর্থাৎ, কর্ত্তব্য কাজকে কোন মতেই গৃহের মধ্যে না রাখিয়া অনা-

সশ্যাক জেঠাইমার মত অবসর পাইবামাত্র অতি সুদূরে গঙ্গাতীরে সমর্পণ করিয়া আসিব, ও তাহার পরম সদ্গতি করিলাম মনে করিয়া আত্ম-প্রসাদ সুখ অনুভব করিব! তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করি, Public কোথায়, Public কি! চারি দিকে মরুভূমির এই যে বালুকা-সমষ্টি ধুধূ করিতেছে দেখিতেছি, ইহাই কি Public! ইহার মধ্য হইতে কয়েক মুষ্টি একত্র করিয়া স্তূপ করিয়া একটা যে মূর্ত্তির মত গড়িয়া তোলা হয়, তাহাই কি Public! তাহারই মাথার উপরে আমরা যত পারি কার্য্যভার নিক্ষেপ করি, ও তাহা বার বার ধসিয়া যায়। তাহার মধ্যে অটল স্থায়িত্বের লক্ষণ কি আমরা কিছু দেখিতে পাইতেছি!

কথায় কথায় সভা ডাকিয়া Public নামক একটা কাল্পনিক মূর্ত্তির হৃদয় হাতড়াইয়া বেড়াইবার একটা কুফল আছে। তাহাতে কোন কাজই হইয়া উঠে না; একটা কাজ উঠিলেই মনে হয়, আমি কি করিব, একটা বিরাট সভা নহিলে এ কাজ হইতে পারে না! আমি একলা যতটুকু কাজ করিতে পারি, ততটুকুও কোন কালে হইয়া উঠে না। মনে করি, হয় একটা অত্যন্ত ফলাও ব্যাপার করিব, নয় কিছুই করিব না! ক্ষুদ্র কাজ মনে করিলেই হাসি আসে। তাহা ছাড়া হয়ত এমনও মনে হয়, সভা করিয়া তোলা সভ্যদেশ প্রচলিত একটা দস্তুর; সুতরাং সভা না করিয়া কোন কাজ করিলে মনের তেমন তৃপ্তি হয় না! ইহা ব্যতীত, নিজের উদ্যম, নিজের উৎসাহ, নিজের দায়িকতা, অতলস্পর্শ সভার গর্ত্তে অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়া আসা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কি, তাহাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। এখানে Public নাই। উপন্যাসের দুয়ারাণী যেমন কুলগাছের কাঁটায় আঁচল বাধাইয়া স্বামীকর্ত্তৃক অবরোধসুখ কল্পনা করিত, আমরা তেমনি কাপড়-চোপড় পরাইয়া একটা ফাঁকি পব্‌লিক সাজাইয়া রাখিয়াছি, কখন তাহাকে আদর করিতেছি, কখন তিরস্কার করিতেছি, কখন বা তাহার প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছি এবং এইরূপে মনে মনে ঐতিহাসিক সুখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখনও কি খেলার সময় ফুরায় নাই, এখনও কি কাজের সময় আসে নাই! মনে যদি কষ্ট হয় ত হোক্,

কিন্তু এই পুত্তলিকাটাকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এখন এই মনে করিতে হইবে, আমরা সকলেই কাজ করিব। যেখানে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিরুদ্যমী, সেখানে ব্যক্তিসমষ্টির কার্য্যতৎপরতা একটা গুজবমাত্র। আমি উনি তুমি তিনি সকলেই নিদ্রা দিব, অথচ আশা করিব "আমরা' নামক সর্ব্বনাম শব্দটা জাগ্রত থাকিয়া কাজ করিতে থাকিবে! সর্ব্বত্রই সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তি বিশেষ ও পরিণত অবস্থায় ব্যক্তিসাধারণ। প্রথম অবস্থায় মহাপুরুষ, পরিণত অবস্থায় মহামণ্ডলী। জলনিমগ্ন শৈশব পৃথিবীতেও আভ্যন্তরিক গূঢ়বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন উন্নত শিখর সকল জলের উপর ইতস্ততঃ জাগিয়া উঠিত। তাহারা একক মাহাত্ম্যে চতুর্দ্দিকের কল্লোলময় মহাপ্লাবনের মধ্যে জীবদিগকে আশ্রয় দিত। সমলগ্ন সমতল উন্নত মহাদেশ, সে ত আজ পৃথিবীর পরিণত অবস্থায় দেখিতেছি। এখনই যথার্থ পৃথিবীর ভূ-পব্লিক তৈরি হইয়াছে। আগে যেখানে ছিল মহাশিখর, এখন সেখানে হইয়াছে মহাদেশ। আমাদের এই তরুণ সমাজে, আমাদের এই ভাবিতে হইবে, কবে আমাদের সেই সামাজিক মহাদেশ সৃজিত হইবে! কিন্তু সেই মহাদেশ ত একটা ভুইফোঁড়া ভেল্কি নহে! সেই মহাদেশ সৃজন করিবার উদ্দেশে আমাদের সকলকেই আপনাকে সৃজন করিতে হইবে, আপনার আশ পাশ সৃজন করিতে হইবে। আপনাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকে উঠিব, প্রত্যেকে উঠাইব, এই আমাদের এখনকার কাজ। কিন্তু সে নাকি কঠোর সাধনা, সে নাকি নিভৃতে সাধ্য, সে নাকি প্রকাশ্য স্থলে হাঙ্গাম করিবার বিষয় নহে, সে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি, সে কঠিন কর্ত্তব্য বটে, অথচ ছায়াময়ী বৃহদাকৃতি দুরাশা নহে, এই নিমিত্ত উদ্দীপ্ত হৃদয়দের তাহাতে রুচি হয় না। এরূপ অবস্থায় এই সকল ছোট কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ডমূর্ত্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র! আমাদের চারিদিকে, আমাদের আশে পাশে, আমাদের গৃহের মধ্যে, আমাদের কার্য্যক্ষেত্র। সমস্ত কাজই বাকি রহিয়াছে, এমন স্থলে সমস্ত ভারতবর্ষকে একেবারে উদ্ধার করা, সে বরাহ বা কূর্ম্ম অবতারই পারেন; আমাদের না আছে নাশার পার্শ্বে তেমন দন্ত না আছে পৃষ্ঠের উপরে তেমন বর্ম্ম।

এখন আমাদের গঠন করিবার সময়, শিক্ষা করিবার সময়। এখন আমাদিগকে চরিত্র গঠন করিতে হইবে, সমাজ গঠন করিতে হইবে, পব্‌লিক গঠন করিতে হইবে। বিদেশীয়দের দেখাদেখি আগে ভাগে মনে করিতেছি, সমস্ত গঠিত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য গঠনশালার গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া কতকগুলি কুগঠিত কাঠ-খড়-বাহিরকরা অসম্পূর্ণ বিরূপমূর্ত্তি জন-সমাজে আনয়ন করিয়া আমরা তামাসা দেখিতেছি। শত্রুপক্ষ হাসিতেছে।

এতক্ষণে সকলে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন পব্‌লিকের উপযোগিতা স্বকার করি বলিয়াই আমি এত কথা বলিতেছি। এখন দেখিতে হইবে পব্‌লিক গঠন করিতে হইবে কি উপায়ে! সে কেবল পরস্পরকে সাহায্য করিয়া। হাতেকলমে প্রকৃত সাহায্য করিয়া। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করা চাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভর করা চাই। মমতাসূত্রে সকলের একত্রে গাঁথা থাকা চাই। নতুবা, কাজের বেলায় কে কাহার তাহার ঠিকানা নাই, অথচ বক্তৃতা করিবার সময় বক্তা ওঝা মহাশয় মন্ত্র পড়িয়া কোন্ বটবৃক্ষ হইতে যে পব্‌লিক ব্রহ্মদৈত্যটাকে সভা-স্থলে নাবান্ তাহা ঠাহর পাওয়া যায় না! পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, পরস্পরের মধ্যে মমতা, পরস্পরের প্রতি নির্ভর—এ ত চাঁদা করিয়া রেজোল্যুষণ পাস করিয়া হয় না। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র কাজের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। এবং সে সকল কাজ সকলেরই আয়ত্তাধীন। এখন সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা সকলে লক্ষ্য স্থির করিনা কেন! অর্থাৎ যেখানে বাস করিতেছি, সেখানটা যাহাতে গৃহের মত হয় তাহার চেষ্টা করি না কেন! নহিলে যে, বাহির হইতে যে-সে আসিয়া আমাদের সম্ভ্রম হানি করিয়া যাইতেছে; এমন একটু স্থান পাইতেছি না যাহা নিতান্ত আমাদেরই, যেখানে পরের কোন অধিকার নাই, যেখানে আত্মীয়দের স্নেহের অমৃতে পুষ্টিলাভ করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিদিন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে যাই, বাহির হইতে সঞ্চয় করিয়া যেখানে আনয়ন ও বিতরণ করি, আমাদের পিতামাতারা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আমাদের সন্তানেরা যেখানে আশ্রয় পাইবে বলিয়া আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, যেখানে কেহ আমাদিগকে হীন জ্ঞান করিবে না কেহ আমা-

দিগের প্রতি অবিচার করিবে না, কেহ আমাদিগের ম্লানমুখ নতশির সহ্য করিতে পারিবে না, যেখানকার রমণীরা আমাদিগের লক্ষ্মী-স্বরূপিনী আনন্দ-বিধায়িনী অন্নপূর্ণা, যেখানকার বালক বালিকারা আমাদেরই গৃহের আলোক আমাদেরই গৃহের ভাবী আশা, যেখানে কেহ আমাদের মাতৃভাষা আমাদের দেশীয় সাহিত্য আমাদের জাতির আচার ব্যবহার অনুষ্ঠানকে কঠোরহৃদয় বিদেশীয়ের ন্যায় অকাতরে উপহাস ও উপেক্ষা করিবে না। আর কিছু নয়, সেই গৃহ-প্রতিষ্ঠা, স্বদেশে সেই স্বদেশ-প্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের বাহু প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংরাজেরা আমাদিগকে সোহাগ করে কি না করে তাহারই প্রতীক্ষা করা তাহার জন্য আবদার করিতে যাওয়া—সেত অনেক হইয়া গেছে, এখন এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া দেখা যাক্ না কেন।

সোণার কাটি রূপার কাটি ।*

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্য এখানে আমারে মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাঁহার মুখ-মণ্ডলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় সোণার কাটি রূপার কাটির গল্পের মাঝে হুঁ না দিয়াছেন, কিম্বা সেই উপন্যাসের পৃষ্ঠে "তা'র পর তা'র পর" শব্দের চাবুক কখনো বা মৃদু-ভাবে কখনো বা সজোরে প্রয়োগ না করিয়াছেন ।

সাহসে ভর করিয়া তো বলিলাম, কিন্তু তবুও আমার মনোমধ্যে নানা প্রকার কিন্তু হইতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দী যেরূপ দ্রুত পদক্ষেপে ইংরাজী সভ্যতার লৌহ বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছে (ধন্য বলি তোমাদের দুই ভাইকে—বাষ্পীয় জলযান এবং স্থলযান!) তাহাতে এত দিনে বোধ করি "হাঁউ মাউ খাঁউ" জম্বুদ্বীপ হইতে শ্বেতদ্বীপে (ইংলণ্ডে) চম্পট প্রদান পূর্ব্বক "ভারতবর্ষের ছেলে-ভুলোনো উপকথা" নামক কোন একটি ইংরাজি পুস্তকের পরিশিষ্ট মহলের নোট x, y, বা z-কোটায় অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করিতেছেন; এবং দৈবযোগে তাহা আমাদের দেশের কোন কুমারী লীলাবতী (সংক্ষেপে Lilly) তর্কালঙ্কার M. A'র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে তিনি ঈষৎ মুখ মুচকিয়া তাঁহার সহাধ্যায়িনীকে বলিতেছেন "প্রিয় সখি! এই বইখানি প'ড়ে আমি অবাক্ হ'য়েছি! আমাদের দেশের আগেকার লোকেরা রাক্ষস্ বিশ্বাস ক'র্‌তো! ছেলেবেলা-থেকে মা'য়ের দুধের সঙ্গে কুসংস্কার গিলে গিলে না জানি বড় হ'লে তারা কি ভয়ানক অদ্ভুত জানোয়ার হ'য়ে দাঁড়া'ত! আমার এই বিশ্বাস যে, এখনো যদি আমরা আমাদের একরত্তি হাড় মেডিকেল্ কালেজে পরীক্ষার জন্য পাঠাই, তবে, নিশ্চয়ই তাহার মধ্য হইতে অর্দ্ধেকের বেশী কুসংস্কারের গাদ বাহির হইয়া পড়ে! তাই বলি প্রিয়সখি! আমি আমার নক্ষত্রকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি ইংরাজি ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

---

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর একটী শাখা সভার ৭ম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়।

আমি বলিতেছিলাম যে, "হাঁউ মাউ খাঁউ" নিশ্চয়ই শ্বেতদ্বীপে প্রস্থান করিয়াছে!—সেই শ্বেতদ্বীপ—সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী আলবিয়ন—যাহাকে ব্রিটানিয়ার পোষ্য-পুত্রেরা সম্প্রতি 'home" বলিয়া কপ্‌চাইতে সুরু করিয়াছেন—হাঁউ মাউ খাঁউ নিশ্চয়ই সেইখানে ডুব দিয়াছে! তাহা দেখিয়া শ্বেত দ্বীপ-হইতে Fie! Fo! Fee! Fum! I smell the blood of an Englishman! এই পাশ্চাত্য রাক্ষসী ভাষা বাষ্পীয়-যান-ভরে এ দেশে শুভাগমন পূর্ব্বক বোধ করি বা এতদিনে ঠাকুরাণী (অর্থাৎ Mistress) রতনলাল পরামাণিক গবর্ণেসের মুখকন্দর-হইতে প্রখর নকুণী-সুরে বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

যেরূপ এখন সুসভ্য প্রণালীতে আমাদের বালক-দিগের কুসংস্কারের মূলে কুঠার আঘাত করা হইতেছে, তাহাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে, ও তাহার সমস্ত গাঁথনি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। পিতা যখন বালককে কোন খাদ্য সামগ্রী দে'ন, তখন বাঙ্গালা-পড়া বালক বলে 'ধন্যবাদ বাবা"—ইংরাজি পড়া বালক বলে "Thank you pappa;" বালক যখন যুবা হইবেন, তখন পিতাকে বলিবেন "Governor;" যুবা যখন প্রৌঢ় হইবেন—যখন 'হ্যাট্‌কোটের তা' লাগিয়া লাগিয়া তাঁহার হাড় পাকিয়া উঠিবে—তখন পিতাকে বলিবেন "Old fool" বুড়া মূর্খ,—এইরূপ করিয়া যখন আমাদের দেশের সমস্ত কুসংস্কার একে একে তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন নবতম যুগের নবতম বিধানের নবতম জ্যোতিতে, সুবিখ্যাত রেম্ব্রাণ্টের চিত্রকর্ম্মের ন্যায়, আমাদের দেশীয় কালো মুখের অর্দ্ধভাগ সাদা-হইয়া উঠিবে—মুখমণ্ডলের যে পার্শ্বটা পূর্ব্বপুরুষ-ঘেঁসা সে পার্শ্বটা চিরকালই কালো থাকিবে, আর, যে পার্শ্বটা ইংরেজ-ঘেঁসা সে পার্শ্বটা সাদা হইবে, এইরূপে আমাদের দেশের মুখ অতি এক পরমাশ্চর্য্য দো-রঙা শ্রী ধারণ করিয়া জগৎ-শুদ্ধ লোকের বাহবা-ধ্বনি এবং করতালি আকর্ষণ করিবে।

আমি যেন চক্ষে দেখিতেছি যে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ অধীর হইয়া আমাকে এই কথাটি বলিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছেন যে "তোমার যদি এতই মনে ভয়—যে, কৃতবিদ্য লোকেরা তোমার অদ্ভুত

শিরোনামাটির অর্থ বুঝিবেন না (সত্য বলিতে কি—উহার অর্থ-না-জানা-দলের মধ্যে আমিও একজন, ও আমার বিশ্বাস এই যে, ও-সকল অলীক গল্প শৈশব কর্ণ হইতে যত দূরে থাকে ততই ভাল) তবে তুমি একটা কাজ কর না কেন—উহার একটা শক্ত সংজ্ঞা দেও—rigid definition দেও—তাহা হইলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইবে।" ইঁহার এই সংপরামর্শটি আমি মাথায় করিয়া গ্রহণ করিলাম—অতএব বলি শুন—

(১) যে কাটি ছোঁয়াইবা-মাত্র মৃত শরীরে জীবন-সঞ্চার হয়, তাহার নাম সোণার কাটী।

(২) যে কাটি ছোঁয়াইবা-মাত্র জীবন্ত দেহ মৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার নাম রূপার কাটি।

ইহার উপর তো আর কোন কথা নাই?

আমাদের দেশের কোন কোন মহাপুরুষ ধরা-কে এক পাক, আধ পাক, বা সিকি পাক, প্রদক্ষিণ করিয়াই তাহাকে সরার মত দেখিতে সুরু করেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যখন মাতাঠাকুরাণীর মুখে বা গৃহিণীর মুখে মাছের ঝোল রন্ধনের কথা শোনেন, তখন তাহার অর্থ কিছুতেই তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে—তাঁহারা চট পট্ অভিধান খুলিয়া সতেজে পাত উলটাইতে থাকেন; কিন্তু আমাদের শিরোনামাটির অর্থ আমি যখন ইউক্লিডের শক্ত নিয়মে আট ঘাট বাঁধিয়া প্রদর্শন করিয়াছি, তখন কেহ যে পাশ্চাত্য ফলাইয়া বলিবেন যে, "ওঃ বুঝিলাম! মেম্ সাহেব যে কাটি মাথার ঝুঁটিতে গুঁজিয়া সম্মান করেন, সেইটি! একটি সোণার আর একটি রূপার! যে দুই কাটিতে মোজা নির্ম্মাণ করেন—সেটি তো নয়? সেটি হইলেও হইতে পারে!" এরূপ যে বলিবেন, সে স্বর্গীয় সুখে এ যাত্রার মত তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল।

সমাজ-সম্মার্জক বক্তারা যখন বক্তৃতা-কালে মুখ-ব্যাদান করেন, তখন যদি সেই মুখদ্বারে অণুবীক্ষণ ধরা যায় তাহা হইলে এক জিহ্বার পরিবর্ত্তে দুই জিহ্বা স্পষ্ট দেখা দিয়া উঠে,—তাহাই সোণার কাটি রূপার কাটি; তেমনি আবার প্রত্যেক সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের কলম-দানে দুইটি করিয়া কলম থাকে,—তাহাও সোণার কাটি রূপার কাটি; একটি লেখনী বা রসনা

জ্যান্ত মানুষকে বা সমাজকে মারিয়া রাখিবার গুণ জানে—সেইটি রূপার কাটি, আর-একটি লেখনী বা রসনা মৃত মনুষ্যকে বা সমাজকে বাঁচাইয়া তুলিবার গুণ জানে—সেইটি সোণার কাটি।

আমাকে আপনারা কি ঠাওরা'ন বলিতে পারি না,—কিন্তু সত্য বলিতে কি—আমি সোণার কাটি রূপার কাটি ঝুলির ভিতর করিয়া আনিয়াছি। মা ভৈঃ আপনারা ভয় পাইবেন না—আমি কোন মনুষ্যের গাত্রে রূপার কাটি ছোঁয়াইব না। নীচত্ব বলিয়া একটা কদর্য্য পিশাচ আছে,—সেই মায়াবী পিশাচ কখনো বা উদারতার ছদ্মবেশে কখনো বা সুবিধার ছদ্মবেশে আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহারই গাত্রে আমি রূপার কাটি ছোঁয়াইব. আর. মহত্ত্ব বলিয়া একজন দিব্য মহাপুরুষ আছেন—তিনি হুজুকের ছাই-ভস্ম চাপা পড়িয়া সমাধিস্থ হইবার যোগাড় হইয়াছেন,—তাঁহারই গাত্রে আমি সোণার কাটি ছোঁয়াইব; আমার অভিপ্রায় এ ভিন্ন আর কিছুই নহে,—অতএব আপনাদের কাহারো কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

কেহ বলিতে পারেন যে, "আহা বেচারা নীচত্বকে সকলেই তিরস্কার-লাঞ্ছনা করে—সকলেই গলা ধাক্কা দেয়,—উহার উপর আর কেন! উহাকে কৃপাকটাক্ষে ক্ষমা করাই উচিত;"—এ কথাটা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত হইলে তাহার উপর আমি দ্বিরুক্তি করিতাম না.—কথাটা কিছু হাস্যজনক হইল—ক্ষমা করিবেন,—দ্বিরুক্তি করিব কি—উক্তিই তখন আমার ছিল না, শুধু তাহা নয়, যিনি উক্তি করিবেন তিনিও তখন অনুপস্থিত,—অতএব ও-কথা চাপা দেওয়া যাক্; ও-কথা বলিবার আমার এইমাত্র তাৎপর্য্য যে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে যাহাই হো'ক না কেন—এখন আর নীচত্বকে লাথি-ঝাঁটা বা গলাধাক্কার ভয়ে অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না,—এখন নীচত্ব দিব্য রথারোহণ করিয়া রাজপথে বিচরণ করে,—অতর্কিত-ভাবে রাজ-সভার অগ্রবর্ত্তী আসনে বসিতে পায়—এখন সে মনে করিলেই হাতে মাথা কাটিতে পারে এমনি তাহার প্রখর বীর্য্য—এমনি তাহার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ! নীচত্বকে বেচারা গরিব দীন হীন কৃপাপাত্র বলা এখন আর সাজে না;—এখন নীচত্ব আমাদের কাছে ক্ষমতাশালী বড় লোক, আমরা তাঁহার কাছে দীন হীন ক্ষুদ্র লোক,—বরং

তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিলে তাহাতে তাঁহার পৌরুষ আছে—আমরা যে তাঁহাকে ক্ষমা করি সে অধিকারই আমাদের নাই। দুর্ব্বলের ক্ষমা কাপুরুষতার আর এক নাম, বলবানের ক্ষমাই প্রকৃত ক্ষমা। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি ভয়ের উত্তেজনায় বলবানের অত্যাচার ক্ষমা করে, সে ব্যক্তির যেমন ক্ষমা, আর, যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বলবান্ শত্রু-পক্ষের সহিত বন্ধুতা পাতায়, তাহারো সেইরূপ বন্ধুতা; ওরূপ ক্ষমা—দেখিতে সুকোমল পুষ্পরাশি, কিন্তু উহার তলে তলে প্রতিহিংসারূপী কাল-সর্প দর্শনের অবসর খুঁজিয়া ছট্‌ফট করিয়া বেড়ায়! প্রজাপীড়ক রাজা যখন দুর্ব্বলের লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করেন ও বলবান্ শত্রুর গুরুপাপ স্বীয় উদারতা গুণে ক্ষমা করেন—সে ক্ষমা ঐরূপ বিষাক্ত ক্ষমা! সে বন্ধুতাও বড় ভাল গতিকের নহে—তাহা শত্রুতার গুপ্তচর। পরম সাধু শ্বেতাঙ্গ বণিক্ জনেরা দয়ার্দ্র হৃদয়ের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া যখন দেশ বিদেশে বন্ধুতা ছড়া'ন—সে বন্ধুতা ঐ ধরণের বন্ধুতা। পৃথিবীর সমস্ত রাজনীতি-মহলে রূপার কাটির সংস্পর্শে বন্ধুতা অনেক-কাল-যাবৎ মৃত হইয়া পড়িয়া-আছে ও স্বার্থ-সিদ্ধি তাহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া—অতিশয় সুশিক্ষিত পাকা-চালে পরের বসত-বাটীতে পদ-প্রসারণ ও ঘটী-বাটীতে হস্ত প্রসারণ এই দুই কার্য্য অতিরিক্ত মাত্রায় আরম্ভ করিয়াছেন! সেই স্বার্থ-মহাপুরুষ যখন উদার-ভাবে ক্রোড় প্রসারিত করিয়া ভিন্ন জাতিকে আলিঙ্গন করেন, তখন সে আলিঙ্গন ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন,—লোহার ভীম হইলেও সে আলিঙ্গনের যাঁতায় পরিপিষ্ট হইয়া নিতান্ত পক্ষেই ময়দা বনিয়া যায়। সকল-অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, সেই ময়দার পুতুলেরা উদারতা ও সমদর্শিতা ফলাইয়া ঐ প্রকার ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম ও সদ্ভাব বিস্তার কবিতে যা'ন—প্রেম বিস্তারের তাঁহারা আর স্থান খুঁজিয়া পান নাই!

প্রেম বিস্তারের একটি বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপুষ্ট হয় তাহার পরে তাহা বিস্তৃত হয়; প্রথমে প্রেম গৃহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা দেশে বিস্তৃত হয়; প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিদেশে বিস্তৃত হয়; অগ্নির ন্যায় প্রেমের স্বভাবই প্রসারিত হওয়া; তাহা ক-হইতে খ'য়ে ও খ-হইতে গ'য়ে প্রসারিত হয়, কিন্তু খ ডিঙাইয়া গ'য়ে প্রসারিত হয় না। আপনার দেশের প্রতি তোমার প্রেম যথোচিত পরিপুষ্ট

হইতে-না-হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাত সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া সেখানে আসর জমকিয়া বসে, তবে সে প্রেমের ভিতর কোন পদার্থ নাই—কোন রসকস নাই--তাহা অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর মাত্র। এ অকাল-পক্ক প্রেম হৃদয়-জননীর গর্ব্ভে পাঁচ মাস বাস করিয়াই রসনার বক্তৃতায় বা লেখনীর প্রবন্ধে ভূমিষ্ঠ হয়। এ প্রেম হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বেই দৌড়িতে ও লম্ফদিতে আরম্ভ করে! কথা কহিতে শিখিবার পূর্ব্বেই লেনিস্ গ্রামার পড়িতে আরম্ভ করে! আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে-না-পাইতেই অপর লোককে মা-বাপ বলিতে শেখে! এ প্রেম একটি মহাবীর,—যতক্ষণ না ইনি স্বীয় জন্ম-ভূমির ভাল মন্দ সমস্ত বস্তুকে পুড়াইয়া ছার খার করিতে পারেন ও সাত সমুদ্র পারে চকিতের মধ্যে আকাশ হইতে পড়িয়া সেই অজ্ঞাত অপরিচিত ভূমিতে নূতন গৃহ-প্রতিষ্ঠার পণ্ডশ্রমে ব্যাপৃত হইতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাকে ধৈর্য্যের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখাই দুষ্কর। এই রূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ বলেন সার্ব্বভৌমিক উদারতা, কেহ বলেন বিশ্বব্যাপী সম-দর্শিতা, —আমরা বলি গাছে-না-উঠিতেই-এক-কাঁদি উদারতা, ও ইঁচড়ে-পাকা-জ্যেষ্ঠতাত সমদর্শিতা। এরূপ উদারতা ও সমদর্শিতার গাত্রে রূপার কাটি ছোঁয়ানো অতীব কর্ত্তব্য।

প্রকৃত সমদর্শিতা কাহাকে বলে? না "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি" যিনি সর্ব্বভূতকে আপনার মত করিয়া দেখেন তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে দেখেন; এ সমদর্শিতা পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে যেমন ছিল এমন আর কুত্রাপি নাই; কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ব্বে উহা—যেমন জীবন্ত ছিল, এখন উহা—তেমনি মৃত হইয়া পড়িয়া আছে; যদি কাহারো গাত্রে সোণার কাটি ছোঁয়া-ইতে হয় তবে উহারই গাত্রে তাহা আগে ছোঁয়ানো কর্ত্তব্য। কিন্তু এখনকার যাঁহারা সমদর্শী তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ যে, পর-কে আপনার মত দেখা যদি সমদর্শিতা হয়, তবে আপনাকে পরের মত দেখা সমদর্শিতা না হয় কেন? ডাইন্ হস্ত বাম হস্তের মত ইহা বলাও যা, আর, বাম হস্ত ডাইন হস্তের মত ইহা বলাও তা'—একই কথা! কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, ডাইন্ হস্তকে বাম হস্তের মত বলিলে ডাইন হস্তের অপমান করা হয় ও বাম হস্তকে ডাইন্ হস্তের মত বলিলে বাম হস্তের মান বাড়ানো হয়, তখন তো আর "একই

কথা" বলিলে চলে না;—মান বাড়ানো এবং অপমান করা কিছু আর একই কথা নহে। এমনি আবার, "পর-কে আত্ম-তুল্য দেখিবে" বলিলে বুঝায় যে পর-কে এখন যত ভাল—বাসো তাহা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিবে, "আপনাকে পরের মত দেখিবে" বলিলে বুঝায় যে, আপনাকে এখন যত ভাল বাসো তাহা অপেক্ষা কম ভাল বাসিবে; কম ভালভাসা এবং বেশী ভালবাসা তো আর একই কথা নহে! যদি আপনাকে কম ভালবাসাই শ্রেয় হয়, তবে পর-কে আত্ম-তুল্য ভাল-বাসিতে গেলে পর-কেও কম ভাল বাসিতে হয়;—ইহাতে ভালবাসার মাত্রা-লাঘব ভিন্ন আর কোন ফলেই দর্শে না। এই রূপ যদি আমরা স্বজাতিকে আপনার নিকটতম জানিয়া তাহাকে রীতিমত ভালবাসা-চক্ষে দেখি, স্বজাতির পৈতৃক সংকীর্ত্তি সদাচার, সদ্ভাব, সম্মান, সমস্তই যদি আমরা অতি যত্নের সহিত রক্ষণ ও বর্দ্ধন করি, তবেই আমরা অন্যজাতির প্রতি ভালবাসা বিস্তার করিবার অধিকারী হই, আর, অন্যজাতিও আমাদের স্বজাতিকে একটা জাতির মত জাতি জানিয়া আমাদের সহিত বন্ধুতা করিয়া সুখী হয়। কিন্তু আমরা ইংরাজী পড়িয়া এরূপ হইয়াছি যে, আমরা স্বজাতির পৈতৃক কোন কিছুই দু-চক্ষে দেখিতে পারি না! আমাদের স্বজাতির শত্রুবর্গেরা যেমন আমাদের জাতির মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পায় না, আমরা নিজে আমাদের নিজের জাতিকে তাহা অপেক্ষাও বিষ-দৃষ্টিতে দেখি! আমরা আপনারা যাচিয়া আপনাদের শত্রুপক্ষের দলে মিশি, আপনারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদের পর হই! পরকে আপনার করিতে পারা যেমন একটি মহৎ গুণ,—আপনাকে পর করিয়া ফেলা তেমনি একটি মহৎ দোষ,—এ দুই বিরোধী বস্তুকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখা কিছু আর সমদর্শিতা নহে—কিন্তু যা'র পর নাই স্থূল-দর্শিতা। আমরা যদি ইংরাজদিগকে বাঙ্গালি করিতে পারি তবে তাহাতে আমাদের যেমন অসাধারণ ক্ষমতা ও পৌরুষ প্রকাশ পায়, তেমনি আমরা যদি এক-তুড়িতে ইংরাজ বনিয়া যাই, তবে তাহাতে আমাদের অসাধারণ কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের নাই বলিয়া কি শেষোক্ত অসাধারণ কাপুরুষত্বকে মাথায় করিয়া পূজা করিতে হইবে? ইহার তো কোন অর্থই বুঝিতে পারা যায় না!

কিন্তু আমাদের দেশে আজ কাল এমনি এক নূতনত্বের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে যে একজন বীর বক্তা স্বচ্ছন্দে টেবিলে এক চাপড় দিয়া বলিতে পারেন যে, লোকে বলে বেল পাকলে কাকের কি—আমি বলি যে, কাক পাকলে বেলের কি! শাস্ত্রে বলে যে, পর-কে আপনার মত দেখিবে, আমি বলি যে, আপনাকে পরের মত দেখিবে—এবং ইহাকেই আমি বলি প্রকৃত সমদর্শিতা। যদি সমদর্শী-হইতে চাও তবে আপনাকে একজন ইংরাজের মত দেখিবে, আপনার গৃহিনীকে মেম্ সাহেবের মত দেখিবে, আমাদের এ দেশ যদিও উষ্ণ-প্রধান তথাপি ইহাকে শীত-প্রধান ইংলণ্ড দেশের মত দেখিবে; আপনাকে একজন সাতপুরুষে গোরালোকের মত করিয়া দেখিবে, আর মনে করিবে যে তুমি কাল প্রত্যূষে সবে-মাত্র জাহাজ হইতে নাবিয়াছ—ইহার পূর্ব্বে তুমি কিম্বা তোমার কোন পূর্ব্ব-পুরুষ ভারতবর্ষের ত্রিসীমা মাড়ায় নাই; মনে করিবে যে, বাঙ্গালি ভদ্রলোক বলিয়া যে একটা শব্দ আছে, ইহার তুমি বাষ্পও জান না—সুতরাং বাঙ্গালিকে নিগর্ ভিন্ন আর যে কি বলিবে তাহা তুমি খুঁজিয়া পাইতেছ না! কাচ-পোকার আলিঙ্গনে গা ঢালিয়া দিয়া আর্স্‌লা যেমন কাচ-পোকা হইয়া যায়, সেইরূপ পরের অধীনতায় ঘাড় পাতিয়া দিয়া আপনি পর্য্যন্ত আপনার পর হইয়া মনুষ্য-জন্মের সার্থক্য সম্পাদন করিবে!

এরূপ সমদর্শিতার একটি প্রধান গুণ এই যে ইহা অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়; নূতন কিছুই গড়িবার প্রয়োজন হয় না—আপনাদের ভাল যাহা কিছু আছে তাহা ভাঙিয়া ফেলিলেই কার্য্য সমাধা হইতে পারে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-মহলে বহু-কাল ধরিয়া এই একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে প্রকৃতি শূন্য স্থান দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না Nature abhors vacuum; এ প্রবাদটি অতি কাজের কথা; ভিতর হইতে বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্বকে বা হিন্দুত্বকে যতই দূর করিয়া দিবে, উপর-হইতে ততই ইংরাজিত্বের গুরুভার অবতীর্ণ হইয়া তাহার স্থানে ঘুরিয়া বসিবে;—অতএব বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা পরিচ্ছদ, বাঙ্গালি জাতি-কুল-মান সমস্তকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া বক্তৃতার এক তোপে উড়াইয়া দেও, ও পথের ইংরাজদিগকে করযোড়ে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বল যে, "দেখ আমরা কি মহৎ

কার্য্য সমাধা করিলাম! কে বলে যে আমরা নিবীর্য্য বাঙ্গালি! আর কি তোমরা আমাদিগকে বাঙ্গালি বলিয়া—হিন্দু বলিয়া—উপেক্ষা করিতে পার! আর আমরা বাঙ্গালি নহি—আর আমরা হিন্দু নহি—আমরা এক এক জন এক এক উন্নতিশীল দেশহিতৈষী বীরপুরুষ!" যে-কোন জাতি হউক না কেন, সেই জাতিই এইরূপ সুলভ মূল্যে সমদর্শিতা ক্রয় করিতে পারে। ইংরাজেরা যদি ইচ্ছা করে তবে তাহারা স্বজাতির স্বজাতিত্বকে রসাতলে দিয়া রাতারাতি ফরাসীস হইয়া দাঁড়াইতে পারে; তখন যদি কোন বড়-লোক-ইংরাজকে তাঁহার ভৃত্য মোসিঁও বলিয়া সম্বোধন করিতে তিল-মাত্রও বিলম্ব করে প্রভু অমনি তাহাকে ঘুসার চোটে আদব-কায়দা শিখাইতে উদ্যত হইবেন; তখন সম্ভ্রান্ত ইংরাজদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা পরস্পরকে গুড্ মর্ণিঙ্ না বলিয়া বোঁজিওর মোসিঁও বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন; কিন্তু সে দিনের এখনো অনেক বিলম্ব আছে! বাঙ্গালির সহবাসের বাতাস লাগিতে লাগিতে যদি কোন সুদূর ভবিষ্যৎকালে তাহাদের কঠিন অস্থিতে নোনা ধরিয়া তাহা মোমের মত পরহস্ত-নম্য হইয়া উঠে—তবেই যাহা হউক,—কিন্তু কলিযুগের এদিকে তাহার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে আমি কেবল যদি'র কথা বলিতেছি,—যদি ইংরাজেরা কখনো সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের ন্যায় পরম দেশহিতৈষী হইয়া উঠেন, তবেই তাঁহারা স্বজাতির স্বজাতিত্ব লোপ করিয়া অন্য-জাতির স্বদেশকে আপনাদের হোম্ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিবেন, ও দূর-হইতে দূরবীণ কসিয়া, কোকিলের ন্যায় সেই পর-গৃহের গার্হস্থ্য সুখামৃত আস্বাদন পূর্ব্বক যার পর নাই কৃত-কৃতার্থ হইবেন; কিন্তু তাঁহারা তত দেশহিতৈষী হন'ও নাই তাহার কথাও নাই! অকর্ম্মণ্য দোষ-দর্শী লোকেরা বলিতে পারেন যে, "উহা তো আর সমদর্শিতা নহে—উহা ভিন্ন-জাতিকে আপনার জাতির মাথায় চড়ানো।" কিন্তু লোকের কথায় কি আসে যায়—বিশেষতঃ নিগর্ বাঙ্গালিদের কথায়! যদি সমদর্শী হইতে চাও তবে লোকাপবাদের ভয়কে অনেক হাত জলের তলে চাপা দিয়া রাখিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও—নচেৎ তাহাতে যাইও না—যাইও না—গেলে বিপদে পড়িবে!

অন্যান্য সভ্য জাতিরা স্বজাতির স্বজাতিত্ব রীতি-মত রক্ষা করিয়া ভিন্ন

জাতির সহিত ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দে মিলিত হয়; কিন্তু আমরা নাকি সকল-অপেক্ষা অধিক সভ্য,—মুসলমান জাতি বল—ফরাসিস্ জাতি বল—ইংরেজ জাতি বল—পূর্ব্বতন হিন্দু জাতি বল—সকলকার অপেক্ষা আমরা নাকি অধিক উন্নত, অধিক বিদ্বান্, অধিক বুজ্‌দার, তাই আজিও কেহ যাহা পারে নাই আমরা তাহা অম্লান বদনে করিতে যাইতেছি,—ইংরাজীতে যে একটি প্রবাদ আছে যে, fools rush in where angels fear to tread দেবতারা যেখানে পা বাড়াইতে শঙ্কা করেন, মূর্খ লোকেরা সেখানে হুড়্‌মুড়্ করিয়া ঢুকিয়া পড়ে, এই প্রবাদটিতে আমরা নূতন জীবন-সঞ্চার করিতেছি; আমরা স্বজাতির স্বজাতিত্ব একেবারেই লোপ করিয়া পর-জাতির আলিঙ্গনের জটিল নাগ-পাশে জড়াইয়া পড়িতেছি! মাকড়সার পা-গুলা বড় বড়, ইহা দেখিয়া মাছি মনে করিতেছে যে, মাকড়্‌সার কাছে কিছুদিন সাক্‌রেতি করিলেই, তাহারও ঐরূপ অসাধারণ পদ-বৃদ্ধি হইতে পারে, এই ভাবিয়া মাছিটি মাকড়সার অবারিত-দ্বার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে!

ভেক এবং সারসের ইতিহাস কাহারো অবিদিত নাই। একদল ভেক সারস-পক্ষীর সমীপে গিয়া তাহাকে যোড়-করে নিবেদন করিল যে, "হে উচ্চ-পদারূঢ় শুভ্রবর্ণ শুভ্রান্তঃকরণ সারস-পক্ষী, আমাদের রাজা এই একটা নির্জ্জীব কাষ্ঠ-খণ্ড—ইহা দ্বারা আমাদের কোন কার্য্যই হয় না, তুমি যদি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের রাজসিংহাসন অধিকার কর, তবে আমরা সকলে মিলিয়া যাবজ্জীবন তোমার জয়-জয়-কার করিব ও পরম সুখে কালযাপন করিব।" ভেকদিগের এরূপ শাঁসালো এবং রসালো আহ্বানে সারসের কর্ণ কখন বধির থাকিতে পারে না, তিনি আড়-চক্ষে ভেক-রাজ্যের চতুঃসীমায় একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই সিংহাসনের উপর ধীরে ধীরে এক চরণের পর আর-এক চরণ বাড়াইলেন—ও দুই চরণ যখন সেই ভিত্তি-মূলের উপর দৃঢ়রূপে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি প্রজাগণের ক্রন্দন জন্মের মত ঘুচাইবার জন্য টুপ্ টাপ্ করিয়া রাজ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; যতই দিন যাইতে লাগিল ততই প্রজাদিগের আনন্দের গগন-ভেদী উৎস শোকাশ্রুধারায় পরিণত হইতে লাগিল ও ঘরে ঘরে মড়াকান্না পড়িয়া গেল। আমাদের দেশের বক্-বক্-কারী ভেকের দল চাহেন যে, শুভ্র সারস-বৃন্দ একবার কৃপা-কটাক্ষে দেখুন

যে, আমাদের নিজের জাতি নাই, গৌরব নাই, পরিচ্ছদ নাই, আমরা অতি-ই অসভ্য অতি-ই বর্ব্বর,—তাঁহাদের আমরা একান্ত চরণাশ্রিত! আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, "আমরা যখন এত উদার হইতে পারিলাম যে, আমাদের জাতি-কুল-মান সমস্তই আমরা তোমাদের সভ্যতা সলিলে ধৌত করিয়া ফেলিতে একটুও কুণ্ঠিত লজ্জিত বা সন্তপ্ত নহি, তখন, তোমরা কি আমাদের প্রতি এ-টুকুও উদারতা প্রদর্শন করিতে পারিবে না যে, তোমাদের বাম-চরণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির এক পার্শ্বে আমাদিগকে একটু স্থান দিয়া আমাদের হিন্দু-নামের কলঙ্ক অপনয়ন করিবে! বাবু উপাধি আর তো আমাদের সহ্য হয় না! ধুতি-চাদর আমাদের গাত্রে রাই-শোর্শের বেলেস্তারা ঠেকে! ইজার-চাপকান্ আমাদের রোমে রোমে সূচি বিদ্ধ করে! জঘন্য বাঙ্গালি নাম, বাঙ্গালা ভাষা, হিন্দুনাম, হিন্দু ভাষা আমাদের কর্ণ-কুহরে বিষ বমন করে! অতএব হে শুভ্রবর্ণ শুভ্র-হৃদয় সারস-পক্ষী সকল! তোমরা এ অধীন ভেক-মণ্ডলীকে এ-সকল সমূহ দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর! তোমরা আমাদিগকে তোমাদের স্বজাতি বলিয়া নিদেন-পক্ষে ইউরেসিয়ান (অর্থাৎ ভেকসারস) বলিয়া তোমাদের বুট্-মণ্ডিত পাদপদ্মের আশ্রয়ে টানিয়া লও তোমাদের শ্রীচরণের পাদুকা-ই আমাদের ভবার্ণবের ভেলা—তোমরাই আমাদের বিপদ্-সাগরের একমাত্র কাণ্ডারী।"

শুভ্র সারস-পক্ষী যে অভিপ্রায়ে ভেকদিগের মধ্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে ভেকদিগের অত বেশী-মাত্রা অধীনতা স্বীকারের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই,—ভেকেরা যে কি উপাদেয় বস্তু সারসের তাহা সম্যক্‌রূপে জানা আছে—ভেকেরা কাকুতি মিনতি করিয়া অধিক কি জানাইবেন? বরং সারস পক্ষী ভেকদিগের বেশীমাত্রা বকাবকি ও কাপুরুষত্বে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে চরণের আশ্রয় না দিয়া চরণের ঠোকর দিবেন কি না তাহাই ভাবিতে থাকেন, পরে অনেক বিবেচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে চরণ সম্বরণ করাই কর্ত্তব্য। সারস ভাবেন যে, বকজাতি সকল পক্ষীজাতির মধ্যে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ,—আমরা সেই বক-জাতির বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কুল-শ্রেষ্ঠ সারস পক্ষী। সকল পক্ষীরাই জানে যে আমরা যেমন প্রজাবৎসল এমন আর কেহই নয়, অতএব

এই ভেক-গুলাকে হাতে মারাটা ভাল হয় না; তাহা হইলে লোকাপবাদের জ্বালায় পক্ষী মহলে আমাদের তিষ্ঠনো ভার হইবে, অতএব এ-গুলাকে ভাতে মারা-ই কর্ত্তব্য!" এই ভাবিয়া সারস-পক্ষী যখনই চঞ্চু-চালনা করেন, তখনই শ্বেত পক্ষ-দ্বয়ে চক্ষু আচ্ছাদন-পূর্ব্বক সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। এইরূপে সারস-পক্ষী স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম রীতিমত অনুষ্ঠান করিতেছেন ও জন্ম জন্ম করিবেন; ভেকের কর্ত্তব্য কার্য্য বক্ বক্ ধ্বনি করা,—ভেকেরা তাহা করিতেছেন এবং জন্ম জন্ম করিবেন; এইরূপে রাজা প্রজা উভয়েই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেশে—শ্রী-বৃদ্ধি সাধনের কোন দিকেই কিছু আর অবশিষ্ট রাখিবেন না—এক কপর্দ্দকও অবশিষ্ট রাখিবেন না।

ভেকেরা যদি স্বজাতিত্বের কোন-প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া তাহার ভিতর আপনাদিগকে কোন-মত-প্রকারে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে কাল-ক্রমে তাঁহারা আপনাদের জাতি-সুলভ উপায় অবলম্বন করিয়া বড় বড় সোণা ব্যাঙ হইয়া উঠিতে পারেন,—তাহা যদি তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটে, তবে তখন মণ্ডুক-গলাধঃকরণ সারসের পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই। কিন্তু ভেকেরা আপনাদের জাতি-সুলভ উপায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সারসের পরিচ্ছদ পরিয়া সারস হইবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন—এই এক নূতন রহস্য!

আমাদের নামের শিরোভাগে বাবু-শব্দ প্রয়োগ না করিয়া তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে ইস্কো-এয়ার-শব্দের লাঙ্গুল জুড়িয়া দেওয়া অতি সহজ কার্য্য—যে-সে লোক মনে করিলেই তাহা করিতে পারে, কিন্তু তত সহজে আপনার বা স্বদেশের উন্নতি-সাধন করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; আমরা মনে করিলেই এক লম্ফে গাছে উঠিতে পারি, কিন্তু সেরূপ করিয়া উন্নতি-সোপানে আরোহণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমরা এরূপ লঘু-চিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে, যে কার্য্য আমরা জগঝম্প বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, বীরত্ব ফলাইয়া এক লম্ফে সাধন করিতে পারি তাহা অতি যৎসামান্য হইলেও আমাদের চক্ষে তাহা অতি-বড় মহৎ কার্য্য বলিয়া প্রকাশ পায়; ও ধীর গম্ভীর ভাবে যাহার পর যেটি কর্ত্তব্য সেইটি সাধন না করিলে যে-কার্য্য সাধন করা যায় না

তাহা অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য হইলেও—অতি মহৎ-কার্য্য হইলেও—আমাদের চক্ষে তাহা অতি যৎসামান্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা ভাবি যে, আপনার দেশের গৌরব বাঁচাইয়া—মহত্ত্ব বাঁচাইয়া—রীতি-মত স্বদেশের উন্নতি-সাধন করা অনেক পরিশ্রমের কার্য্য—তাহা করিবার জন্য কাহার কি এত গরজ পড়িয়াছে! পৃথিবী-যোড়া উদারতা—জগৎ-যোড়া সমদর্শিতা—ইংলণ্ড-যোড়া খ্যাতি প্রতিপত্তি—এ-সকল তো আমাদের হাতের ভিতর রহিয়াছে,—উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই অনায়াসে আমরা তাহা করায়ত্ত করিতে পারি—অতি সুলভ মূল্যে মহাবীর উপাধি ক্রয় করিতে পারি। তাহার উপায় হচ্চে এই;—আপনাদের যাহা কিছু ভাল বলিয়া জানো—ভদ্র-রীতি বলিয়া জানো—দেশের গৌরব বলিয়া জানো—পিতৃপুরুষদের মহামূল্য দান বলিয়া জানো—তাহা সুগন্ধ পঙ্কজ-কানন হইলেও—উন্মত্ত হস্তিযূথের ন্যায় তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে লণ্ড-ভণ্ড করিয়া ফেল! স্বদেশীয় যে-কোন আলোক দেখিতে পাও—জ্ঞানের আলোকই হউক্—প্রেমের আলোকই হউক্—ধর্ম্মের আলোকই হউক্—বক্তৃতার ঝড়ে সমস্তই নির্ব্বাণ করিয়া ফেল; তাহার পর এরূপ একটা বৃহদাকার প্রদাহক ও প্রবর্দ্ধক কাঁচ প্রস্তুত কর যে, তাহা ইংলণ্ডের তিল-প্রমাণ বস্তুকে তাল-প্রমাণ করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ও তাহার মধ্য-দিয়া ইংলণ্ডের সমস্ত প্রতাপের আলোক আমাদের দেশের মস্তকের উপর কেন্দ্রীভূত হইতে পারে; সেই প্রতাপানলের উত্তাপে যখন আমাদের দেশের সমস্ত মস্তিষ্ক দ্রবীভূত হইয়া রাস্তা-ঘাটে গড়াইয়া যাইতে থাকিবে, তখন উদারতা-প্রভৃতি ধেড়ে ধেড়ে কতকগুলি শব্দের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া সেই জ্বলন্ত মস্তিষ্ক-রাশিকে সেই-সকল ছাঁচে ঢালিয়া স্বদেশের উন্নতির নানা প্রকার উপকরণ গড়িয়া তুলিতে থাকিবে, তাহা হইলে আপনার সার্ব্ব-ভৌমিক উদারতা-প্রকাশেরও অবশিষ্ট থাকিবে না, স্বদেশের উন্নতি-সাধনেরও অবশিষ্ট থাকিবে না।

আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশের মধ্যে এখনো এরূপ অনেক সদাচার আছে—সাধুতা আছে—ভদ্রতা আছে—বিনয় আছে—মনুষ্যত্ব আছে—যাহা অন্যত্র কোথাও সহসা পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা মনে ভাবি যে, ও-সকল তো আমরা চিরকালই দেখিতেছি—দেখিয়া দেখিয়া আমাদের হাড়

মাটি হইয়া গিয়াছে! আবশ্যক হইলেই যখন আমরা অন্যের ধন ভিক্ষা করিতে পারি তখন স্বীয় পৈতৃক ধন রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিবার কষ্ট শুধু শুধু কেন স্কন্ধে বহন করিব? অতএব পৈতৃক সদাচার জলে নিক্ষেপ কর, পৈতৃক সুরীতি, সৌজন্য, সুপরিচ্ছদ, সমস্তই জলে নিক্ষেপ কর,—এইরূপে ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া আম্রবৃক্ষের পরিবর্ত্তে ফল-রাণী ইষ্ট্রাবেরি (কিনা টেপারির বড় ভাই) রোপণ কর, শতদল শ্বেতপদ্মের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দল ইউরোপীয় লিলি রোপণ কর, বীণাপাণি সরস্বতীকে মিউসের মিউ-মিউ-ছন্দে আহ্বান কর, বেদীকে পুল্‌পিটের মত করিয়া গঠন কর, ও বক্তাকে শুভ্র পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে কালো গাউনে সজ্জিত কর; যাহা কিছু প্রবল-জাতির তাহার সাত খুন ক্ষমা কর—শক্তের গোলাম হও, ও যাহা কিছু স্বজাতির তাহার গাত্রে রূপার কাটি ছোঁয়াও—দুর্ব্বলের যম হও. এই সমস্ত উপায় অবলম্বন-পুরঃসর এক যৎ-সামান্য কাণাকড়ির মূল্যে জগদ্ব্যাপী উদারতা ও সমদর্শিতা ক্রয় করিয়া পুত্র-পৌত্রানুক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকহ।

আমরা এককালে বলবান্ জাতি ছিলাম—এখন দুর্ব্বল হইয়াছি, কিন্তু সূর্য্য যখন অস্ত যায় তখন তাহা সূর্য্যই থাকে—জোনাকি পোকা হয় না। পুরুরাজ আপনার অস্ত-গমনের সময় বীরকেশরী আলেক্‌জাণ্ডরকে মহত্ত্ব যে কি বস্তু তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন—দেখাইয়াছিলেন যে, পিঞ্জর-বদ্ধ সিংহও সিংহ! আলেক্‌জাণ্ডর যখন বন্দীকৃত পুরুরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার নিকট হইতে তুমি কিরূপ ব্যবহার আকাঙ্ক্ষা কর, পুরুরাজ বলি-লেন—"যেরূপ ব্যবহার রাজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য!" পুরুরাজ যদি আমা-দের ন্যায় উন্নতমনা হইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে "তোমরা আমাকে তোমাদের এক-জন জাতি-ভাই বলিয়া গ্রহণ করিলেই আমি পরম কৃত-কৃতার্থ হই।" আমাদের আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-দিগের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিতে যদি এতই আমাদের লজ্জা বোধ হয়—আপনার পিতাকে যদি গুরুপদে বরণ করিতে লজ্জা বোধ হয়, তবে যাঁহাদের আমরা রাশি রাশি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিতেছি, তাঁহাদের নিকট হইতেও তো তাঁহাদের মহত্ত্ব-টুকু আমরা শিক্ষা করিতে পারি—তাহাই বা করি কই? ইংরাজেরা তাঁহাদের দেশের আপামর সাধারণের উপকারার্থে স্বদেশীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা

করেন—বিশেষ কোন গুরুতর কারণ না থাকিলে অন্য দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন না,—এটি কেন আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে না শিখি?—আমরা তাঁহাদের এত এত বিদ্যা শিখিতেছি—কেবল ঐটি শিখিলেই কি আমাদের জাতি যায়! ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা বিদ্যা শিখিতেছি বলিয়াই যে, তাঁহাদের ভাষার জোয়ালে আমাদের ঘাড় পাতিয়া দিতেই হইবে—ইহার যে কি বাধ্য-বাধকতা তাহা তো দেখিতে পাই না। ইংরাজেরাও তো আমাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক পরোক্ষ সম্বন্ধে বীজগণিত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তা বলিয়া তাহারা কি আমাদের ভাষায় তাহার অনুশীলন করে? ইউরোপীয় জাতি উক্ত বিদ্যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আরব-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে—তা বলিয়া কোন্ ইউরোপীয় জাতি আরবী ভাষায় তাহার অনুশীলন করে? কলিকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত Science Association আমাদের না ইংরাজদের? যদি তাহা আমাদের হয়, তবে সেখানে-অন্ততঃ—কেন না আমরা আমাদের নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন করি? * আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিলে—তাহার তো কথাই ছিল না, তাহা হইলে এত দিনে আমরা জাতির মত জাতি হইতাম—মানুষের মত মানুষ হইতাম! কিন্তু অপার্য্যমানে আমরা বিদেশী ইংরাজদের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিলেও কতকটা আমাদের দাঁড়াইবার স্থান হয়। যে-পর্য্যন্ত না আমরা ইংরাজদের বহিঃপরিচ্ছদ ভেদ করিয়া তাহাদের দেশের মহত্ত্ব-টুকুর মর্ম্মে তলাইতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত তাহাদের বিদ্যা শিখিলেই বা কি আর শিল্প শিখিলেই বা কি—কিছুতেই কিছু হইবে না,—তাহাতে ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে। জঠরানল না থাকিলে যেমন অন্ন পরিপাক পায় না—মহত্ত্ব না থাকিলে সেইরূপ বিদ্যা পরিপাক পায় না;—নীচত্বের উপর যতই বিদ্যার জ্যোতি নিপতিত হয়, ততই—কোথায় তাহার আলোক বৃদ্ধি

---

* এখানে মনের অভিলাষ ব্যক্ত করা হইল মাত্র,—উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি দোষারোপ করা এখানকার তাৎপর্য্য নহে,—ব্যাপারটি অতি কঠিন—প্রতিষ্ঠাতা-মহাশয় যত দূর করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদের সকলকার ধন্যবাদের পাত্র, ইহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না।

পাইবে—না কেবল তমো-ই বৃদ্ধি পাইতে থাকে,—হিতে বিপরীত হয়! ইংরাজী পুঁথি-গত বিদ্যাটি ইংরাজদের নিকট হইতে আদায় করা খুব সুবিধা বটে, কিন্তু ইংরাজদের দেখাদেখি আমরা যদি স্বদেশীয় ভাষায় আমাদের শিক্ষিত বিদ্যার অনুশীলন করি, তবে তাহাতে আমাদের দেশে সুবিধার একটা আট্‌চালা শুধু নয়—কিন্তু মহত্ত্বের শৈল-দুর্গ—স্বাধীনতার ভিত্তিমূল—প্রতিষ্ঠিত করা হয়! হায়! আমরা কি কেবল আপাত-সুলভ সুবিধাই খুঁজিয়া বেড়াইব? ভাবী-মঙ্গলের নিদান যে, মহত্ত্ব, তাহার প্রতি কোন কালেই কি আমাদের চক্ষু ফুটিবে না? ইংরাজেরা তো সুবিধা-হস্তীর পদতলে স্বজাতির স্বজাতিত্বকে দলন করিয়া মারেন না! আমাদের দেশের লোকে যেমন সুবিধার কারণ দর্শাইয়া বিদেশীয় গলবস্ত্রকে স্বদেশীয় কণ্ঠের হার, বিদেশীয় কালো চোঙার টুপিকে স্বদেশের মাথার মুকুট করিতে তিলমাত্রও লজ্জা বা ঘৃণাবোধ করেন না, কোন্ ইংরাজ সেরূপ স্বজাতিত্বের অবমাননা আপনার গাত্রে এক মূহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারে? তাহা যদি পারিত, তবে আমাদের এই উষ্ণ দেশে উত্তাপের কারণ দর্শাইয়া স্বচ্ছন্দে তাহারা ধুতি চাদর পরিয়া শরীরের অর্দ্ধেক ভার লাঘব করিত—তাহাদের হাড়ে বাতাস লাগিত—এ যাত্রার মত তাহারা বর্ত্তিয়া যাইত!

ইংরাজদের এই যে একটি—রসনাগত নয়—কিন্তু—অস্থিগত—মজ্জাগত—মর্ম্মগত স্বদেশানুরাগ, এটি যদি আমরা তাহাদের নিকট হইতে শিখিতাম—তবে আজ আমাদের দেখে কে? তাহা হইলে এতদিনে আমাদের জাতির শ্রী ফিরিয়া যাইত,—কিন্তু তাহা আমরা শিক্ষা করিব না,—ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা পরিবার সাজ শিক্ষা করিব, চলিবার ঢঙ্ শিক্ষা করিব, কথা কহিবার ধরণ শিক্ষা করিব, টুপি হেলাইবার কেতা শিক্ষা করিব, পা নাচাইয়া শিশ্ দিবার ভঙ্গী শিক্ষা করিব, খঞ্জন পক্ষীর মত কোর্ত্তার ল্যাজ নাচাইয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতা করিবার হাব-ভাব শিক্ষা করিব, এইরূপ যত কিছু শিখিবার আছে সমস্তই মস্তিষ্ক-জাৎ করিয়া ডারূউইন্ সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আগামী সংস্করণের নূতন এক অধ্যায়ের উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকিব।

সুবিধা স্বতন্ত্র এবং মহত্ত্ব স্বতন্ত্র। আমার নিজের যথেষ্ট অর্থ থাকিতেও

ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা-কে আমি খুব সুবিধা মনে করিতে পারি, কিন্তু আমি সেরূপ কার্য্য করিলে আমার নীচত্ব আর কাহারো নিকটে অপ্রকাশ থাকিবে না;—যাঁহারা আপনার জাতি-কুল-মান বিস্মৃত হইয়া অন্যের দ্বারে জাতি-কুল-মান ভিক্ষা করিতে আদবেই লজ্জা বোধ করেন না, তাঁহাদের নীচত্বের চিহ্ন তাঁহাদের ললাট-ময় ফুটিয়া বাহির হয়; তাঁহারা আপনারা তাহা দেখিতে পা'ন না বটে, কিন্তু দেশ-শুদ্ধ আর সকল লোকেই তাহা দেখিতে পান;—দেখিয়া ভদ্রলোকেরা সত্য-সত্যই মনোমধ্যে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করেন। সে দিন লর্ড ডফ্‌রিন যে কথা গুলি বলিয়াছিলেন তাহা তিনি কম দুঃখে বলেন নাই;—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, লোকদিগকে এইরূপ বুঝানো হইতেছে যে, "ডফ্‌রিনের মত অতবড় একজন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ আমাদের এদেশে কখন পদার্পণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ! তিনি যা-ই বলুন আর যা-ই করুন্‌, স্বীয় অন্তঃকরণ-মধ্যে তিনি এটি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, বাঙ্গালিরা একবার যদি হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিতে শেখে তবে আর রক্ষা নাই! বাঙ্গালিরা হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিলেই তাঁহাদের বক্তৃতা-শক্তি আকাশ ছাপাইয়া উঠিবে—ইংরাজী সরস্বতী উপযাচিকা হইয়া তাঁহাদের রসনায় প্রবেশ ভিক্ষা করিবেন—ও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেও তিনি সেখান হইতে নড়িবেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নিশ্চয়ই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিনের মধ্যে একবার করিয়া প্রত্যহই হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিতেন—নহিলে তিনি কখনই অতবড় একজন দেশবিখ্যাত লোক হইতে পারিতেন না! এখনো যে, এদেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইউরোপে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ অন্বেষণ করিলে নিশ্চয়ই বাহির হইয়া পড়িবে যে, তিনি প্রত্যহ দ্বিপ্রহর রজনীতে অতি সংগোপনে অন্ততঃ একবার করিয়া হ্যাট্‌ কোট্‌-পরিধান পূর্ব্বক মস্তিষ্ক শানাইয়া ল'ন! বাঙ্গালিরা গোপনে হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিয়াই এই—প্রকাশ্যে হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিলে তাহারা কি আর রক্ষা রাখিবে! তখন তাহাদের আর এক ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া উঠিবে! সিক জাতি তখন আর তাঁহাদের সঙ্গে কোথায় লাগে!—তখন তাঁহাদের মুখের সাপটে ও পদের দাপটে হাইলাণ্ডরের রেজিমেণ্ট-কে-রেজিমেণ্ট ভয়ে কম্পমান হইয়া

ভূ-তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে! ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের এইরূপ আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া লর্ড্ ডফরিণের মত অতবড় একজন দূরদর্শী বিচক্ষণ-ব্যক্তির আর-কি চুপ করিয়া থাকা পোষায়?—কাজেই তিনি চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া গোটাকত কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু যাঁহারা লর্ড্ ডফরিণের মাথার ভিতর অত-টা তলাইতে পারেন নাই, তাঁহারা আমাদের ন্যায় সাদাসীধা বুঝিয়াছেন—তাঁহারা বলেন যে, লর্ড্ ডফরিন্ আপনি যেমন অন্য জাতির পরিচ্ছদ পরিয়া সঙ্ সাজিতে লজ্জা বোধ করেন—তাঁহার আপনার সেই মহদ্ভাবটি তিনি আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতেও প্রত্যাশা করেন। মহৎ লোক মাত্রেই ভদ্রবংশীয় লোকের নীচত্ব চক্ষে দেখিতে পারেন না। লর্ড্ ডফরিনের অপরাধ এই যে তিনি অরুচির কর্ণে সুরুচির গোটাদুই সৎপরামর্শ নিক্ষেপ করিয়াছেন—তাহা জীর্ণ হইবে কেন,—তাহা যেমন কর্ণে-যাওয়া অমনি কালো কালো পিত্তের সহিত বমন হইয়া রাজ্য-শুদ্ধ সংবাদ-পত্র ভাষাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছে।

ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে যাঁহাদের সাধ যায়, তাঁহাদের অনেকে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পূর্ব্ব-হইতেই অনেক-গুলি যুক্তি মুখস্থ করিয়া আসেন; কিন্তু সে যুক্তি-গুলি এরূপ উপহাসাস্পদ ও জঘন্য যে, তাহা উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। সে গুলির মধ্যে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, রেলওয়ে-রক্ষক হ্যাট্-কোটের ভেল্কি-বাজির চোটে বাঙ্গালি-দিগকে ইংরাজ মনে করিয়া তদুপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে। ইংরাজি, বাঙ্গালি, সংস্কৃত, আরবি, পারসি, সকল শাস্ত্রেই বলে যে, যে ব্যক্তি যাহা নয়—সে ব্যক্তি যদি তাহার মত ভান করে তবে তাহার সেরূপ কার্য্য চৌর্য্য-অপেক্ষাও অধম; আপনাকে চুরি করিবার ন্যায় অধম কাপুরুষত্ব জগতে নাই—তাহা অতি গর্হিত নীচ কার্য্য। কোন্ ভদ্রলোক (অথবা বাবু শব্দের ন্যায় ভদ্র-লোক শব্দের প্রতি কাহারো যদি কোন আপত্তি থাকে—তবে) কোন্ gentleman সুবিধার ছুতা করিয়া আপনার নাম ভাঁড়াইতে—বংশ ভাঁড়া-ইতে—জাতি ভাঁড়াইতে—পিতৃ-পিতামহ ভাঁড়াইতে—লজ্জিত না হ'ন! রেলওয়ে-রক্ষকের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহার নিকট হইতে বন্ধুতা আদায় করিলে, কিম্বা ভদ্রতার একটি নিদর্শন-পত্র বা certificate আদায় করিলে

যাত্রীর পক্ষে কতকটা সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সে সুবিধা এমন কোন অসাধারণ সুবিধা নহে যে, তাহার পদতলে হৃদয়ের মহত্ত্ব বিক্রয় না করিলে আর গত্যন্তর নাই। বিজেতা-জাতির নিকট বিজিত জাতিকে অনেক সময় অনেক প্রকার দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে হয়—ইহা খুবই সত্য, কিন্তু বিজিত জাতি আপনার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টায় প্রাণপণে নিযুক্ত হউন না কেন—তাহাই তো মনুষ্যোচিত কার্য্য! সেদিন বই নয়, কোন হিন্দুস্থানি খোট্টাকে রেলওয়ে কর্ম্মচারী কোন-প্রকার অপমান করাতে অনেক হিন্দুস্থানী এক-যোট হইয়া রেলগাড়িতে দ্রব্যাদি-সংক্রামণ বন্ধ করিল—অমনি রেলওয়ে কোম্প্যানি শশ-ব্যস্ত হইয়া হিন্দুস্থানী-জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আর পথ পাইল না। সে দিন ইটালীতে যখন বিদেশীয় রাজ-পুরুষেরা তামাকের উপর মাস্থল বসাইল, তখন ইটালীর লোকেরা কি করিল? আবেদনও করিল না, ও তাহার বিনিময়ে গলাধাক্কাও খাইল না,—তাহারা অতি-এক সহজ উপায় অবলম্বন করিল,—দেশশুদ্ধ লোক একাত্মা হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিল—চুরট্ খাওয়া বন্ধ করিল,—সুবিধাকে পদে দলন করিয়া মহত্ত্বকে আলিঙ্গন করিল! কিন্তু আমরা সুবিধার ঘরের একজন অধম কিঙ্করকে দেখিয়াছি কি—অমনি তাহাকে মহত্ত্বের মাথায় চড়াইয়া নৃত্য করাইতে সুরু করিয়াছি,—সত্য বলিতে কি এইটিই হ'চ্চে আমাদের ইংরাজি পড়া'র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল! যিনি রেলওয়ে-রক্ষকের সৌহার্দ্দের কাঙ্গালি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, "তুমি যদি আপনার জাতি-ভাঁড়ানোর নীচত্ব অষ্ট-প্রহর স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিতে পারিলে, তবে দুই মিনিটের জন্য রেলওয়ে-রক্ষকের কটু-কাটব্য শ্রবণাভ্যন্তরে গিলিয়া ফেলিতে তোমার এত ভয়ই বা কিসের—লজ্জাই বা কিসের—গ্লানিই বা কিসের!

ইংরাজী কোর্ত্তানুরাগীর আর-একটি যুক্তি এই যে, "আমাদের নিজের কখন কিছু ছিল-ও না—এখনো কিছু নাই,—আমাদের পরিচ্ছদ কপ্নি মাত্র—বড়-জোর ধুতি চাদর! মান্ধাতার আমল-হইতে আমরা অন্যের পরিচ্ছদ পরিয়া পরিয়া আমাদের হাড় পাকাইয়া তুলিয়াছি—আজ তুমি আমাদিগকে তাহা হইতে বিরত করিতে চাও! অনুকরণই আমাদের এক

মাত্র সম্বল—আমাদের চিরকেলে পেসা, তাহার সুবিধা হইতে আজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাও!" Prince Henry যখন Falstaff-কে বলিয়াছিল যে, "তুমি এই বলিলে—আর চুরি করিবে না, এখন যেই চুরির নাম শুনিয়াছ—আর অমনি নাচিয়া উঠিয়াছ, তোমার তো খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখ্‌চি!" Falstaff বলিল "'Tis my vocation Hal" চুরি হ'চ্ছে আমার পেসা—আমার ব্রত, "'Tis no sin to labour in one's vocation" ব্রত পালন করা তো আর পাপ-কার্য্য নহে? "অনুকরণ যে আমাদের ব্রত—তাহা কিরূপে আমরা লঙ্ঘন করিব? অনেকে অনেক স্থানে প্রবঞ্চনা-বলে ছুঁচ্ হইয়া প্রবেশ করে, ও তোপের বলে ফাল হইয়া বাহির হয়; আমরা বিদ্যা-বলে মাছি হইয়া ইংলণ্ডে প্রবেশ করি ও অনুকরণের বলে এক এক জন এক এক মহাবীর হইয়া বাহির হই;—ইহা দেখিয়া নিশ্চয়ই তোমার ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, নচেৎ তুমি কখনই আমাদের শুভ সংকল্পে ঠাণ্ডা জল নিক্ষেপ করিবার মানসে, cold water throw করিবার মানসে, আমাদের পথ রোধ করিয়া এখানে আজ দণ্ডায়মান হইতে না!"

"আমরা চিরকালই অনুকরণ করিয়া আসিতেছি" ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, আমরা মুসলমানদিগের দেখাদেখি সভ্য পরিচ্ছদ পরিতে শিখিয়াছি—তবে ও-কথাটির মূল যে, কোথায়, তাহা তো আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না! চক্ষে আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা তাহার অবিকল বিপরীত। আমাদিগকে যে কেহ বলে যে, "সূর্য্য যেহেতু পশ্চিম দিকে উদয় হয় এই জন্য আমি গঙ্গার পূর্ব্ব-ধারে বাড়ী করিয়াছি," তবে আমরা তাঁহাকে "বলিব যে, তোমার কথার বিস্‌মোল্লায় গলদ্; আমরা যাহা প্রত্যহ দেখি তাহা উহার অবিকল বিপরীত! তুমি বলিতেছ যে হিন্দুরা মুসলমানের অনুকরণ করিয়াছে—আমি দেখিতেছি মুসলমানেরা হিন্দু-দিগের অনুকরণ করিয়াছে!"

হিন্দু-স্থানী মুসলমান ছাড়া আর যে-কোন-দেশীয় মুসলমানকে দেখ না কেন,—ইরাণী মুসলমান, তুরাণী মুসলমান, আরবি মুসলমান, কাবুলি মুসলমান, যাহাকেই দেখ না কেন—দেখিবে যে, হিন্দুস্থানী মুসলমানদের পরিচ্ছদের সঙ্গে তাহাদের পরিচ্ছদের কোন সাদৃশ্য নাই; ইহাতে স্পষ্টই

বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এ দেশীয় মুসলমানেরা যেমন আমাদের বীণা ভাঙিয়া সেতার করিয়াছে, মল্লার রাগিণী ভাঙিয়া মিঞা মল্লার করিয়াছে, আমাদের দেশীয় ভাষা ভাঙিয়া উর্দু সৃষ্টি করিয়াছে, সেই-রূপ আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ ভাঙিয়া চাপ্‌কান পায়জামা প্রভৃতি, পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছে। যে জাতি একশত বিষয়ে আমাদের জাতির নিকটে ঋণী, সে জাতি যে-এক-শ-এক বিষয়ে আমাদের জাতির নিকটে ঋণী হইবে—ইহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। প্রথম প্রথম হিন্দু-মুসল-মানের মধ্যে পরস্পর কেবল মারামারি কাটাকাটিই চলিয়াছিল; অবশেষে রাজনীতিজ্ঞ আক্‌বর শা হিন্দুদিগকে ঠাণ্ডা করিবার মানসে হিন্দু সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন—ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। আবার আক্‌বারের সময় হইতে মুসলমান রাজারা যেরূপ জামা-জোড়া ও খিড়্‌কিদার পাগ্‌ড়ি ব্যবহার করিতেন সেরূপ পরিচ্ছদ ভারতবর্ষ-ছাড়া পৃথিবীস্থ আর কোন দেশেই প্রচলিত নাই—ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে সে পরিচ্ছদ-গুলি নিতান্ত-পক্ষেই ভারতবর্ষীয়; সে গুলি যদি মুসল্‌মানী হইত তবে তাহা ইরানে, তুরাণে, আরবে, বা অন্য কোন মুসলমানী দেশে অবশ্যই প্রচলিত থাকিত। আমাদের দেশের সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ব-বিৎ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জামাজোড়া ও খিড়্‌কিদার পাগড়ি আমরা মুসল্‌মানদিগের নিকট হইতে পাই নাই—মুসল্‌মানেরাই আমাদের নিকট হইতে পাইয়াছে। মুসল্‌মানেরা যখন হিন্দুদের শত শত বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছে, তখন, আমরা যদি এখন তাহাদের কোন কিছুর অনুকরণ করি তবে তাহাতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সৌজন্যের বিনিময় হয় মাত্র; কাহারো তাহাতে জাতির অগৌরব হয় না। পূর্ব্বে মুসলমানেরা আমাদের ধর্ম্মের প্রতিই খড়্‌গহস্ত ছিলেন, কিন্তু আমাদের জাতিকে তাঁহারা মাথায় তুলিয়াছিলেন; মুসলমান সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মানসিংহ, প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন তোদরমল, প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বীরবল, প্রধান গায়ক ছিলেন তান-সেন, ইঁহারা সকলেই জাতিতে হিন্দু। যে-জাতি আমাদের জাতির ভাষা ভাঙিয়া

আপনাদের উর্দু-ভাষা প্রস্তুত করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইল না, এমন কি, যে জাতি আপনাদের জন্মভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ভারতবর্ষকে স্বদেশ-রূপে বরণ করিল, সে জাতিকে কি আমরা আর পর বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি? তাহা যদি করি তবে তাহাতে আমাদের নিতান্তই অসৌজন্য প্রকাশ পায়—তাহা অত্যন্ত অভদ্রোচিত কার্য্য। বাঙ্গালি মুসলমানেরা ধুতি পর্য্যন্ত পরে—মুসলমানীরা সাড়ি পর্য্যন্ত পরে—তাহাতে তাহাদের জাতি যায় না। হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা ধর্ম্মেই কেবল মুসলমান—কিন্তু জাতিতে ভারত-বর্ষীয়। এখন আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জিত-জেতা সম্বন্ধ নাই—সুতরাং এখন মুসলমানেরা কোন হিসাবেই আমাদের পর নহে;—তাহাদের দেশ হিন্দুস্থান—ভাষা এবং পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী,—এবং উভয়েই আমরা জিত জাতি। হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা পূর্ব্বে আমাদের অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া এখন যদি আমরা তাঁহাদের কোন কিছুর অনুকরণ করি, তবে আমরা আপনাদের লোকেরই অনুকরণ করি—পরানুকরণ করি না। পরানুকরণ বলে কাহাকে? না যে-জাতি আমাদিগকে তাহার চরণের এক রেণু বলিয়াও গণ্য করে না—সেই জাতির অনুকরণই পরানুকরণ। সময়ে সময়ে আমরা মুসলমানদের বাহুবলে মর্দ্দিত হইতাম, ও সময়ে সময়ে আমরাও তাহাদিগকে তাহার প্রতিফল দিতাম,—এখন আমরা কাহারো বাহুবল-মর্দ্দিত হই না বটে—কিন্তু পদমর্দ্দিত যত দূর হইবার তাহা হইতেছি;—বাহুবলের পীড়নে লোকের প্রাণহত্যা পর্য্যন্তই হইতে পারে, পদমর্দ্দনে লোকের প্রাণহত্যা না হয় এমন নহে কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর একটি হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়—সেটি হ'চ্চে মান-হত্যা! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—মান, কনিষ্ঠ ভ্রাতা—প্রাণ; জ্যেষ্ঠ-টি চলিয়া গেলে কনিষ্ঠ-টির থাকা বিড়ম্বনা-মাত্র। যাঁহারা আমাদের কেবল প্রাণটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ধন এবং মানের প্রতি মর্ম্মভেদী কোপ-দৃষ্টির তোপ দাগিতেছেন, আমরা যদি তাঁহাদের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহাদের জাতি-মর্য্যাদার ভিখারী হই—ও আপনাদের নিজের জাতি-মর্য্যাদাকে চরণে দলিয়া ফেলি, তবে আমরা শুধু যে নীচ ভিক্ষা-ব্রত অবলম্বন করি তাহা নহে—কিন্তু নীচত্বকে আমরা আমাদের কণ্ঠের হার করি—মস্তকের মুকুট করি—অঙ্গের আভরণ করি,—নীচত্বের

আমরা মূল্য বাড়াইয়া তুলি—দর্প বাড়াইয়া তুলি! আমাদের দেখাদেখি লোকে সহসা মনে করিতে পারে যে, ইঁহারা এত পদমর্দ্দিত হইয়াও যখন এত পদ-লেহন করিতেছেন—তখন পদ-লেহন বোধ করি বা কোন অসাধারণ মহৎ কার্য্য হইবে—আমাদের বুদ্ধি অতি যৎসামান্য তাই আমরা উহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের কি নীচত্বের সীমা-পরিসীমা আছে? ইংরাজেরা আমাদিগকে নিগর বলে, তাহার দেখাদেখি আমরা আপনাদের জাতিকে নিগর বলি! ইংরাজেরা বাবু-উপাধিকে হেয় জ্ঞান করে, তাহার দেখাদেখি আমরাও বাবু-উপাধিকে হেয়-জ্ঞান করি! ইংরাজেরা আপনাদের দেশকে হোম্‌ বলে, আমরা তাহার দেখাদেখি তাহাদের দেশকে আমাদের হোম্‌ বলি! আমরা এমনি গড্ডলিকা প্রবাহ! আমরা তো এইরূপ ভক্তিতে গদগদ হইয়া ইংরাজের উচ্ছিষ্ট লেহন করিতেছি ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেছি, ইংরাজেরা ভিতরে ভিতরে আমাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখেন তাহার একটা সত্য-ঘটনা-মূলক গল্প বলি শ্রবণ করুন।—

একজন আফিসের সাহেবের নিকট দুইজন বাঙ্গালি কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের পিপাসার উদ্রেক হওয়াতে তিনি সাহেবের নিকট জল চাহিলেন,—সাহেব তখন কাচ-পাত্রের এক পাত্র জল তাঁহাকে দিতে অনুমতি করিল। অনন্তর সে ব্যক্তি জলপান করিয়া যখন বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল, সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই কাচ পাত্রটিকে ভূমিতে আছাড় মারিয়া চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেলিল; আর একজন কর্ম্মচারী যিনি উপস্থিত ছিলেন—তিনি তাহা দেখিয়া অবাক্‌; তাঁহারই মুখে আমি ঐ গল্পটি শুনিয়াছি। আমাদের প্রতি যাঁহাদের এইরূপ মনের সদ্ভাব—আমাদের এই উষ্ণদেশে যাঁহারা দোধুয়মান শোভন ধুতি চাদর বা ইজার চাপকান পরিধান করিতে মৃত্যুকে তাহা অপেক্ষা শ্রেয় বিবেচনা করেন,—এখানকার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে আমরা কি না সেই জাতির আঁটা সাঁটা ঘোড়ার সাজ ও উত্তাপ-গ্রাসী কালো রঙের শীত-বস্ত্রের বোঝা নিকৃষ্ট জন্তুর মত বহন করিব—অথচ এক নিমিষের জন্যও লজ্জা বা ঘৃণা কাহাকে বলে তাহা জানিব না! ধিক্‌! কাপুরুষত্ব আর গাছে ফলে না! ছিদ্র-দর্শী তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, তবে মোজা পরিও না—ইংরাজী জুতা

পরিও না, কিন্তু এ সকল তর্ক হৃদয়শূন্য বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাশ্মীরের লোকেরা শীত-দেশে কি জুতা-মোজা পরে না?—ইউরোপীয় লোকেরাই কেবল যে জুতা-মোজা পরিতে জানে—আমাদের দেশের লোকেরা তাহা কস্মিন্ কালেও জানিত না—ইহা তো আর নহে! মোজার গঠন সকল-দেশেই সমান—সুতরাং হাইলাণ্ডরের মোজার ন্যায় নিতান্ত চিত্র-বিচিত্রিত মোজা না হইলে তাহাতে জাতিত্বের পরিচয়-জ্ঞাপক কোন চিহ্নই বর্ত্তিতে পারে না; আবার, মাথার ও গায়ের পরিচ্ছদে যতটা জাতি-পরিচয় পরিস্ফুট হয়, পায়ের পরিচ্ছদে তাহার সিকির সিকিও হয় না।

নরমান এবং সাক্সনদিগের মধ্যে যেরূপ জিত-জেতা সম্বন্ধ ছিল, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেও সেইরূপ ছিল; নর্ম্মানদের সহস্র দৌরাত্ম্যের মধ্যেও ইংরাজদের সাকসন্ বনিয়াদ অটুট্ ছিল—মুসলমানদের সহস্র দৌরাত্ম্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের হিন্দু বনিয়াদি অভগ্ন ছিল; নরম্যানেরা যেমন ইংলণ্ডকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে ইংরেজ হইয়াছিল, এদেশীয় মুসল্মানেরা সেইরূপ হিন্দুস্থানকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে ভারতবর্ষীয় হইয়াছিল—ধর্ম্মেই কেবল মুসল্মান ছিল;—এই জন্য মুসল্মানেরা আমাদের দেশের পরিচ্ছদ-প্রভৃতি আত্মসাৎ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

মুসল্মানেরা যদিও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট-হইতে এ দেশীয় চাপ্কান বা চাপ্কানের আদি-পুরুষ আদায় করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতিত্ব-রক্ষার অনুরোধে বোদামের বা বন্ধনের দিক্ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এইরূপ আবার, ইংরাজ-ফরাসীদের মধ্যে যদিও উইলিএম-দি-কঙ্করের আমল-হইতে আদান প্রদান চলিয়া আসি-তেছে, তথাপি ইংরাজি-ফরাসিস্ পরিচ্ছদের মধ্যে এখনো এমন একটু প্রভেদ রক্ষিত হইয়া থাকে যে, ইউরোপীয় লোকদিগের নিকট কে ইংরাজ কে ফরাসিস্ তাহার পরিচয় পরিচ্ছদ-গুণেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কি ইংরাজ কি ফরাসীস্ সকল জাতিই স্ব স্ব পরিচ্ছদ-দ্বারা স্ব স্ব জাতির পরিচয় প্রদান করে; আমরাই কি কেবল এত নীচ হইব যে, চোর যেমন আপনার মুখে কালি মাখিয়া, মাথা কামাইয়া, কিম্বা পরচুলার দাড়ি-গোঁপ করিয়া আপনার নাম-ধাম গোপন করে, সেইরূপ

আমরা একজাতি হইয়া আর-এক জাতির পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক জাতি-ভাড়ানো ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব? আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-সন্তানদিগের শরীরে যদি একবিন্দুও ব্রহ্মতেজ থাকে—কায়স্থ-ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগের শরীরে একবিন্দুও ক্ষত্র-তেজ থাকে, বৈশ্য-সদ্গোপের শরীরে যদি পুরুষ-পরম্পরাগত সৎক্রিয়ার একবিন্দুও পুণ্য ফল অবশিষ্ট থাকে, শূদ্রসন্তানদিগের শরীরে যদি একবিন্দুও মহৎ-সেবার মহত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে, (ইহা কখনই নহে যে, শূদ্রেরা কোন কালে স্পার্টাদেশীয় হেলট্ ছিলেন বা আমেরিকা-দেশীয় নীগ্রো ছিলেন;—পুত্রেরা যেমন পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া মহত্ত্ব লাভ করে, সেনারা যেমন সেনাপতির আজ্ঞাপালন করিয়া মহত্ত্ব লাভ করে, লক্ষ্মণ যেমন রামচন্দ্রের সেবা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন—শূদ্রেরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই) আমি বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণ-হইতে শূদ্র-পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুজাতির শরীরে যদি একবিন্দুও পুণ্য-তেজ—মহত্ত্বের স্ফুলিঙ্গ—শৌর্য্যবীর্য্যের এক কণা—ভদ্রতার সূচ্যগ্র পরিমাণ অংশ—ইহার কোন একটু-কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাঁহারা আপনার জাতিকে ওরূপ নীচত্বের বেশে সঙ্ সাজাইবার অভিলাষ এইদণ্ডে মন-হইতে চিরকালের মত বিদায় করিয়া দি'ন! হিমালয়কে সাক্ষী করিয়া বলুন যে, তুমি যত দিন মর্ত্তে বিরাজ করিতেছ, পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে সাক্ষী করিয়া বলুন যে, তোমরা যত দিন স্বর্গে বিরাজ করিতেছ, ততদিন আমরা বিপদের দারুণ মহাপ্রলয়ের মধ্যেও আমাদের স্বজাতিকে ওরূপ আত্মাপহারী চৌর্য্যব্যবসায়-দ্বারা কলঙ্কিত করিব না; তাহার অগ্রে সমুদায় ভারতভূমির সহিত আমরা গঙ্গা-সাগরে ঝম্পপ্রদান করিব—তবু আমাদের স্বজাতির জাতি-মাহাত্ম্যকে ওরূপ জঘন্য নীচত্বে—কদর্য্য কাপুরুষত্বে—পর্য্যবসিত করিব না!

যাঁহাদের চক্ষুর কণামাত্র আছে, তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। যাঁহাদের চক্ষু আনুকরণিক ধূলি-মুষ্টিতে নিতান্তই অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সোণার কাটি যদি তাঁহাদের একজনের চক্ষেও অঞ্জন-শলাকার কাজ করে, তবে তাহার জন্ম সার্থক! কিন্তু সে সৌভাগ্য যে, তাহার ঘটিবে এরূপ আশা করা অতিশয় দূরে হাত বাড়ানো; তবে কি?

না যাঁহাদের চক্ষুতে সবে-মাত্র একটু ছানির দাগ দেখা দিয়াছে—ভরসা করি সোণার কাটির সংস্পর্শে তাঁহাদের চক্ষু একটু-না-আধটু ফুটিয়া থাকিবে, তাহাও যদি হয় তবু জানিব যে, সোণার কাটি রূপার কাটির মূল্যবান্ ধাতু-জন্ম নিতান্ত বিফলে অতিবাহিত হয় নাই।

শ্রোতৃবর্গের প্রতি আমার শেষ নিবেদন এই যে, অস্ত্র-চিকিৎসা-দ্বারা দেশের চক্ষু-রোগ ভাল করিতে গিয়া অনেকের হয় তো আমি মর্ম্মে আঘাত দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারি নাই। এখানে উপস্থিত বা অনুপস্থিত এমন অনেক মান্যগণ্য এবং সর্ব্বাংশে উপযুক্ত লোক আছেন—তা ছাড়া আমার এমন অনেক প্রিয়-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন আছেন—যাঁহাদের হৃদয়ে এক বিন্দু আঘাত দিতে আমার আপনার হৃদয়ে তদপেক্ষা শতগুণ আঘাত লাগে,—ইহা দেখিয়া শুনিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে এরূপ কার্য্যে হাত না দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে উল্লিখিত রোগটি যদি কেবল বর্ত্তমান রোগীর দলেই বদ্ধ থাকিত তাহা হইলে আমি এ কার্য্যে না যাওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিতাম; কিন্তু রোগটি যখন ক্রমশই সংক্রামক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, তখন তাহার প্রতীকারের কোন একটা উপায় অবলম্বন না করিলে—ব্যথার ব্যথী কোন ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ সুস্থির থাকিতে পারে না। যদি আপনারা আমার মনের প্রকৃত অভিপ্রায়টি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি অকৃত্রিম সরল ভাবে বলিতেছি যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। আপাত-সুবিধার অনুরোধে স্বজাতিত্বের অবমাননা একটি মহৎ দোষ,—সেই দোষটিই আমার একমাত্র লক্ষ্য,—যেখানে যে-কোন বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা তাহারই উপরে করিয়াছি। যদি কোন মহৎ-লোকের ঐ দোষটি থাকে, তাহা হইলেই যে তিনি মহৎ-শ্রেণী হইতে পতিত হইলেন—তাহার কোন অর্থ নাই,—কেননা "একো হি দোষো গুণ-সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" চন্দ্রের বহুসহস্র কিরণে যেমন তাহার কলঙ্ক ঢাকা পড়িয়া যায়, সেইরূপ অনেক মহৎ গুণের আবরণে এক-টি আধ টি দোষ ঢাকা পড়িয়া যায়,—কিন্তু তা বলিয়া গুণের সংসর্গ-গুণে দোষ কিছু আর গুণ হয় না—দোষ দোষই থাকে। দোষের প্রতীকারই

আমার উদ্দেশ্য - দোষাক্রান্ত ব্যক্তির গুণলাঘব আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিকারের পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে ক্রন্দন করিয়াছি—আজ প্রকাশ্যে ভ্রাতৃগণের সমক্ষে ক্রন্দন করিয়া হৃদয়ের চির সঞ্চিত বেদনার ভার-লাঘব করিলাম মাত্র। যাঁহারা আজ আমার হাস্যের ভিতর কিছু-মাত্র তলাইতে পারিয়াছেন—তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হাস্য কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র—গভীর হৃদয়-বেদনার উচ্ছ্বাস তাহার হাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে! তাহারই উত্তেজনায় আজ আমি অনেক প্রিয়-বন্ধুর মনে আঘাত দিলাম,- আঘাত না দিলে কোন কথাই আমার মুখ-দিয়া বাহির হইতে পারিত না।—কিন্তু তাঁহারা এটি জানিবেন সুনিশ্চিত যে, তাঁহাদের মনে আঘাত দেওয়াতে আমি আপন হস্তে আপনার মনে ততোধিক আঘাত দিয়াছি;—বহুকাল-বর্দ্ধিত হৃদয়ের বেদনা-লতাকে হৃদয় হইতে টানিয়া বাহির করা যে কি যন্ত্রণা, তাহা যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত আছেন, তাঁহারা আজ আমার শত-অপরাধ ক্ষমা করিবেন—এ বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই।

সোণায় সোহাগা।*

সমাজ-সংস্কারকদিগের, এই একটি সহজ সত্যের প্রতি, সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, সভ্য সমাজ মাত্রই ভাল মন্দে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য সমাজ নাই যাহার ষোলো আনাই মন্দ কিম্বা যাহার ষোলো আনাই ভাল। কোন সভ্য মনুষ্যেরই এমন কোন দায় পড়িতে পারে না যে, তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও আর-এক-জাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককালে ইংলণ্ডে নর্ম্মান্ জাতির কত বড় প্রতাপ ছিল! নর্ম্মানেরা মনে করিত তাহাদের আপনাদের রীতি-নীতি ষোলো আনাই ভাল ও সাক্‌সন্ রীতি-নীতি ষোলো আনাই মন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদান অধিকাংশই সাক্‌সন্—তাহার উপর কিছু কিছু করিয়া ফরাসিস্ রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রে "পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ" বলিয়া একটা মিশ্রণ-পদ্ধতি আছে;—যে-কোন ভূত হউক্ না কেন (যেমন জল কিম্বা বায়ু) তাহার নিজের আট আনা ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের দুই আনা দুই আনা করিয়া চারি-দুগুণে আট আনা—এই দুই আট আনার সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা পঞ্চীকৃত ভূত বলিয়া উক্ত হয় (যেমন পঞ্চীকৃত জল, পঞ্চীকৃত বায়ু, ইত্যাদি); তেমনি ইংরাজি সভ্যতাকে বলা যাইতে পারে যে, তাহা পঞ্চীকৃত সাক্‌সন্ সভ্যতা। ইংরাজি সভ্যতার আট আনা সাক্‌সন্ এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা লাটিন, দুই আনা গ্রীক্, দুই আনা ফরাসিস্, ও দুই আনা কেলট্। সাক্‌সন্ মূল উপাদান, ইংরাজি সভ্যতার কেন্দ্র বা পত্তন-ভূমিকে এমনি বল-পূর্ব্বক কামড়িয়া ধরিয়া আছে যে, তাহাকে রাজবংশের দিক্ দিয়া ফরাসিস্ টানিয়াছে, ধর্ম্ম-

---

* পূর্ব্ব প্রবন্ধের সহিত এ প্রবন্ধটির বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া এ স্থলে প্রকাশিত হইল।

যাজকের দিক্ দিয়া লাটিন্ গ্রীক্ টানিয়াছে, আদিম নিবাসীর দিক্ দিয়া কেলট্ টানিয়াছে—কেহই তাহাকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। নর্ম্মান্ কঙ্কেসটের গ্রন্থকার ফ্রীমান্ বলেন;—"ইংলণ্ড-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্মানেরা ব্যাপক রকমের এক বৈদেশিক অনুপান সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা এরূপ যে, কি আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি আমাদের রাজনিয়ম, কি আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তবুও তাহা অনুপান বই আর কিছুই নহে; পূর্ব্বতন দৃঢ়তর মূল উপাদানগুলি, তবুও, অব্যাহত-রূপে টেঁকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাক্কা সামলাইয়া চরমে সেগুলি আবার আপনাদের প্রাধান্য বলবৎ করিল।"* অর্থাৎ সাক্সন্ মূল উপাদান কিয়ৎকাল দমনে থাকিয়া আবার তাহা স্বকীয় মহিমায় প্রাদুর্ভূত হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভ্যতার মূল উপাদানগুলি অব্যাহত রাখিয়া তাহার সঙ্গে কিছু কিছু করিয়া অপর-জাতীয় সভ্যতা অনুপান-স্বরূপে মিশাইয়াছে, আমরা যদি সেইরূপ পঞ্চীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়,—তাহা হইলে আমাদের স্বজাতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর ইউরোপীয় সভ্যতার রাসায়নিক সার পতিত হইয়া তাহাকে শতগুণ উর্ব্বরা করিয়া তুলে, তাহাতে—সোণায় সোহাগা হয়; নচেৎ যদি স্বজাতীয় সভ্যতার সমস্তই উড়াইয়া দিয়া অপর-কোন-জাতীয় সভ্যতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই তবে আমাদের দেশের শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিকে রসাতলে দিয়া তাহার স্থান-টি অন্য দেশের কঠিন মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট্ করিবার জন্য বৃথা আয়াস পাই মাত্র, তাহাতে—হিতে বিপরীত হয়।

এড্ওআর্ড-দি-কন্ফেসর একজন স্যাক্সন্ রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন ছিল—সম্পূর্ণ ফরাসিস্। ফ্রীমান্ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন; "এড্ওআর্ড, সজ্ঞানেই হউক্ আর অজ্ঞানেই হউক্, নর্ম্মাণদিগের বিজয়ের পথ আরো নিষ্কণ্টক করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বদেশ উচ্চ-

* The Norman conquest brought with it a most extensive foreign infusion, an infusion which affected our blood, our language, our law, our arts, still it was only an infusion; the older and stronger elements still ived, and in the long run they again made good their supremacy.

পদের বা লাভের যেখানে যে-কিছু প্রাপ্তব্য স্থান, সমস্তই বিদেশীয় লোকের দ্বারা ক্রমাগত অধিকৃত হইতে দেখা ইংরাজদের চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া ঐ বিপত্তিটি তিনি ঘটাইয়াছিলেন। নর্ম্মাণদিগের কর্তৃক ইংলণ্ডবিজয়ের সূত্রপাত এড্ওআর্ড হইতেই হইয়াছিল।"* এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এডওআর্ড-দি-কনফেসর্ ইংলণ্ডের বিভীষণ ছিলেন। নর্ম্মাণ-কর্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের মূলই ছিলেন তিনি; তাঁহার মন্ত্রী গডওয়াইন আর-এক ধাঁচার লোক ছিলেন বলিয়া—তাই যা' একটু রক্ষা! ফ্রীমান্ বলেন,—"গডওয়াইন্ যে, সমস্ত ইংরাজি ভাবের প্রমাণ-স্থল ছিলেন, তিনি যে, সমস্ত জাতীয় আরম্ভোদ্যমের নেতা ছিলেন, তিনি যে আপনার অসাধারণ গুণগৌরবে অন্ততঃ তাঁহার নিজস্ব ভূমির প্রজাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা যার-পর-নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।" †

এখানে এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কেবল এইটি দেখানো যে, এডওয়ার্ডের ন্যায় বিদেশের টানে পড়িয়া স্বজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে আমরা আমাদের দেশের কোন উপকারেই আসিতে পারিব না,—লাভের মধ্যে তাহার পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়া দিব। গড্ওয়াইনের ন্যায়, স্বজাতীয় সভ্যতার পত্তন-ভূমি দৃঢ়রূপে রক্ষা করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য; তাহার উপরে অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী নানাজাতীয় সভ্যতা মাধুর্য্যের সহিত যথাকালে যথাদেশে যথাপরিমাণে ধীরে-সুস্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা আমাদের দেশে আবির্ভূত হইতে পারে—তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে সোণায় সোহাগা হয়।

এক ব্যক্তির হৃদয় খুব প্রশস্ত, কিন্তু তাঁহার কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই; আর-এক ব্যক্তির হৃদয় অতীব সংকীর্ণ, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার দৌড়

---

* Edward did his best wittingly or unwittingly, to make the path of the Norman still easier. This he did by accustoming Englishmen to the sight of strangers enjoying every available place of honor or profit in the country. * * * * With Edward then Norman conquest really begins."

† That Godwine was the representative of all English feeling, that he was the leader of every national movement, that he was the object of the deepest admiration of the men at least of his own earldom, is proved by the clearest of evidence.

অনেক দূর পর্য্যন্ত ;—যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা পা'ন, কিম্বা যদি শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির হৃদয় পা'ন, তবেই সোণায় সোহাগা হয়। আমাদের দেশের শক্তি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পদতলে—এবং আমাদের দেশের হৃদয় আমাদের স্বজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের পদতলে—বাঁধা রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, স্বজাতির স্বজাতিত্ব, অব্যাহত রাখিয়া ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোণায় সোহাগা করিয়া তুলে ; কিন্তু যদি আমরা আমাদের দেশের হৃদয়ের মূলোৎপাটন করিয়া ইংরাজ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি,—তবে যে-শাখায় আমরা উপবিষ্ট আছি সেই শাখা আমরা স্বহস্তে কর্ত্তন করি। আমরা আমাদের মূল আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে যদি বা ঝঞ্ঝা-বায়ুর তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম,—আপনাদের মূল আপনারা উচ্ছেদ করিয়া আমরা তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলি।

এক্ষণকার নব্য মহলে "চাই নূতন—চাই নূতন" "কই নূতন—কই নূতন" "এই নূতন—এই নূতন" বলিয়া এক তুমুল রব উঠিয়াছে,—জানেন না যে, পুরাতনে ঠেস্ না দিলে নূতন এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে ? ইতিহাসে কি দেখা যায় ? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূমি সমূলে উন্মূলন করিয়া "নূতন" যখনই ভুস্ করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা টুস্ করিয়া জল-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন ও ফরাসিস্ দেশে সাধারণ তন্ত্রের পতন ঐ কারণেই ঘটিয়াছিল। হৃদয়কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধিকে অতিমাত্র মার্জ্জিত করিতে গেলেই ঐরূপ হিতে বিপরীত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর অনেক ভাল ভাল রত্ন আছে, ফরাসিস্ বিদ্রোহি-দিগের মধ্যেও অনেক ভাল ভাল রত্ন ছিল,—কেবল একটি রত্নের অভাব ছিল, সেটি—হৃদয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে আত্ম-সংযম, তপস্যা, কঠোরতা প্রভৃতি ধর্ম্মের জন্য যাহা যাহা চাই সমস্তই আছে—কেবল একটির অভাবে সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া গেল,—সেটি ভগবদ্ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। ফরাসিস বিদ্রোহি-দিগেরও ঐ দশা হইয়াছিল। ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল-সিঞ্চন করিলে তাহা হইতে কিই-আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ?

হৃদয় যদি গেল তবে শুধু শক্তিতে কি হইতে পারে ? এক্ষণকার নব্য সমাজ হৃদয়শূন্য শক্তির এমনি ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, সামান্য সামান্য গার্হস্থ্যবিষয়েও তাঁহাদের মনের রুচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোন একটি সুসভ্য নব্য উদ্যানে প্রবেশ কর, তবে হৃদয়-স্নিগ্ধকারী মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে মস্তিষ্ক মন্থনকারী উদ্ভিদ-তত্ত্বেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইবে। সেখানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিলে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের জন্য তোমার মন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে—বড় বড় লাটিন্ নামধারী গন্ধহীন রঙচঙে ফুল তোমার চক্ষুশূল হইবে ও তাহাদের বড় বড় নাম তোমার কর্ণশূল হইবে। তখন তুমি ক্রোটন্ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিবে "হায়! ক্রোটন্ বৃক্ষ! তুমি পূর্ব্ব জন্মে কত না তপস্যা করিয়াছিলে! এই উদ্যানে, গ্রীষ্মকালে জুঁই বেল গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুলই প্রস্ফুটিত হইত—তাহারা উদ্যানের শ্রী সমুজ্জ্বল করিত ও দশ দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শীতল সুগন্ধ উপঢৌকন দিত,—তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! বর্ষাকালে কদম্ব কেতকী সেফালিকা নব-বারিধারায় প্রাণ পাইয়া উঠিয়া সৌরভের মাধুর্য্যে দিক্ আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! শরৎকালে প্রস্ফুটিত কামিনী-ফুলে বৃক্ষের আপাদমস্তক ভরিয়া উঠিত, ও তাহার মধুর সুগন্ধ জ্যোৎস্নাধৌত প্রাসাদ-বাতায়ন ছাড়াইয়া উঠিয়া ছাদ পর্য্যন্ত মাতাইয়া তুলিত, তাহাকে তুমি তাড়াইয়াছ,—ধন্য তোমার ইংরাজি পরাক্রম! বিদেশী বৃক্ষ দ্বারা উদ্যানের বৈচিত্র্য সাধন কর—তাহার বিরুদ্ধে আমারা একটি কথাও বলিব না,—কিন্তু পোনেরো আনা গন্ধহীন বিদেশী ফুল-গাছের একধারে পড়িয়া এক আনা সুগন্ধি দেশী ফুল যে, এই বলিয়া দুঃখের গীত সুরু করিবে যে, "এবার মো'লে ক্রোটন্ হ'ব" ইহা আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না! আমাদের মন্তব্য কথাটি এই যে, উদ্যানে জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ রীতিমত সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে যথা-স্থানে যথা-পরিমাণে ইংরাজি পুষ্প-বৃক্ষ সাজাও, কিম্বা আম্র কাঁটাল বট অশ্বথ তাল নারিকেল প্রভৃতি ফল-পুষ্প-ছায়া-প্রদ বৃক্ষ—সকল যথারীতি সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে যাহা আজিও হয় নাই) ওক্ অলিব্ সাইপ্রেস্ প্রভৃতি নানা-দেশীয় নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-

পূর্ব্বক, যথাস্থানে যথা-পরিমাণে বসাও—তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে, কিন্তু যদি ওকের খাতিরে বট-অশ্বত্থকে দূর করিয়া দেও, অথবা ষ্ট্রবেরি, পিয়ার, এবং আপেলের খাতিরে আম্র কাঁটাল আতা প্রভৃতিকে দূর করিয়া দেও, তবে তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে, একুল—ওকুল—দুকুল নষ্ট হইবে।

পুরাতনের ভিত্তি ভূমির উপর কিরূপে নূতনের মূল-পত্তন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের দেশেরই স্বর্গীয় মহাত্মারা—রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকেরা আমাদিগকে তাহার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সংস্কারক ছিলেন, পরম হিতৈষী ছিলেন, উচ্ছেদক ছিলেন না। তাঁহারা স্বজাতির হীনতা সূচক কুসংস্কারগুলিই কেবল মানিতেন না, তদ্ভিন্ন কেমন করিয়া স্বজাতির জাতি-গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন। ইঁহাদের একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে যখন ইংরাজেরা বড় বড় টাইটেল দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যে-টাইটেল আমার আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল্ তোমরা আমাকে দিতে পারিবে না। এই যে উপবীত দেখিতেছ—ইহার সমক্ষে রাজারা পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করে।" ব্রাহ্মণ্য ফলাইবার জন্য তিনি যে, ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার ও-কথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের দেশের পিতৃপুরুষদের নিকট—হইতে যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের নিকট পূজ্য—তোমরা আমাদের কে যে, তোমাদের নিকট হইতে উপাধি পাইয়া আমরা আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করিব!

এক্ষণে আমাদের দেশে ইংরাজ বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য-রক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে; কিন্তু কিরূপে সাম্য-রক্ষা করিতে হয়—আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই তাহা জানেন। সাম্য দুইরূপ (১) ভাব-সাদৃশ্য, (২) আকার-সাদৃশ্য; আকার-সাদৃশ্য এক তো অসম্ভব, তায় আবার, তাহাতে কাহারো কোন পুরুষার্থ নাই; অথচ আমাদের দেশের সাম্য-ভক্তেরা প্রায়ই বাহ্য আকার সাদৃশ্যের প্রেমে মজিয়া আর্য্যজাতি-সুলভ আন্তরিক ভাব-

সাদৃশ্যটি হেলায় হারাইয়া ফেলেন। ইংরাজ বাঙ্গালির মধ্যে বাহ্য আকার-সাদৃশ্য দুইরূপে ঘটিতে পারে,—(১) ইংরাজেরা ধুতিচাদর পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙ্গালিরা হ্যাট কোট পরিলে তাহা ঘটিতে পারে; এরূপ যখন,—তখন, উভয়-জাতির মধ্যে কোন-এক-জাতি যদি পর-পরিচ্ছদের কাঙ্গালি হয়, তবে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় যে, এক জাতি পরের সাজ সাজিতে লজ্জিত—আর এক জাতি তাহাতে কৃত-কৃতার্থ! এইরূপ হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাঁহারা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিতে যা'ন, তাঁহারা ফলে ঠিক্ তাহার উল্টা করিয়া বসেন,—বাহ্য আকার-সাম্য ঘটাইতে গিয়া আন্তরিক ভাব-বৈষম্য জাজ্বল্যরূপে সমর্থন করেন। আমরা যদি ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধির সাম্য, জাতি-গৌরবের সাম্য, বল-পৌরুষের সাম্য, উদ্যম উৎসাহের সাম্য, সংঘটন করিতে পারি, তবেই আমরা একটা কাজের-মত কাজ করি;—তুচ্ছ আকার-সাম্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। সহস্র সাবান মাখিলেও বাঙ্গালির গায়ের রঙ ইংরাজের মত উৎকট ধবল বর্ণ হইতে পারে না,—সহস্র কোট পরিলেও বাঙ্গালির স্নিগ্ধমূর্ত্তি বিকট উগ্র হইয়া উঠিতে পারে না! তাহা হইয়া কাজও নাই! অতএব বলি যে, "হে সাম্য-প্রিয় দেশ-হিতৈষি যুবা! বাহ্য আকার-সাম্য মন হইতে একেবারেই উঠাইয়া দেও,—আর্য্য জাতীয় ভাব-সাম্যের পথ অবলম্বন কর যে, অন্তঃকরণের মহত্ত্ব লাভে পুরুষার্থ লাভ করিবে!" একজন বাঙ্গালি ভদ্র লোক যদি নিখুঁত ষোল আনা ইংরাজ সাজেন, তথাপি দাঁড়াইবে যে, ইংরাজেরা আসল ইংরাজ—তিনি নকল ইংরাজ। আপন মনে তিনি ষোল আনা ইংরাজ হইতে পারেন, কিন্তু ইংরাজের নিকট তিনি অধম বাঙ্গালি—প্রসাদের কাঙ্গালি—পরিচ্ছদের কাঙ্গালি—অনুগ্রহের কাঙ্গালি—এ ছাড়া আর কিছুই নহে! ইংরাজেরা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্ততঃ চারি আনা ইংরাজ মনে করে, তাহা হইলেও কতক্‌টা রক্ষা,—কিন্তু তাহা হইবার নহে। ইংরাজ সাজিয়া ইংরাজের দলে মিসিতে গেলে—অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদেরই নিকট এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে হইবে যে, "নিদেন—তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর!" আমরা বলি যে, এরূপ যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ উপার্জ্জন

করিতে যাওয়ার অর্থই বা কি—প্রয়োজনই বা কি? বাঙ্গালির উচিত যে, যাহাতে স্বদেশীয় হৃদয়ের সহিত অল্পে অল্পে বিদেশীয় শক্তি-সামর্থ্য সংযুক্ত হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উপরে অন্ততঃ বারো আনা ভর দিয়া দাঁড়া'ন; ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ (অর্থাৎ বাহ্য আকার-পরিচ্ছদ নহে কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি বল-পৌরুষ, কার্য্য-নৈপুণ্য, কর্ম্মিষ্ঠতা, ইত্যাদি মনুষ্যোচিত গুণ) অল্পে অল্পে আত্মসাৎ করিতে থাকেন,—তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরব ও বজায় থাকিবে, তদ্ভিন্ন আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রী নূতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমরা বলি—সোণায় সোহাগা।

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না।*

হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ উচিত কিনা, এই প্রবন্ধের মীমাংসা করিতে হইলে, অনেক বিষয় অগ্রে পরিষ্কার করা উচিত।

ধর্ম্ম দেখিয়াই কোন বিষয় উচিত অনুচিত বুঝিতে হয়; প্রথমে দেখিতে হইবে হিন্দুরা ধর্ম্ম কি ভাবে দেখেন; তাহার পর বুঝিতে হইবে বিবাহ বলিলে হিন্দু কি বুঝেন।

জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানই দুইদিক্ দিয়া দুইভাবে দেখা যাইতে পারে। কেবল অনুষ্ঠান কেন, যাবতীয় পদার্থই দুইটি বিভিন্ন ভাবে দেখা যাইতে পারে। এই মনুষ্য,—খানিকটা অম্লজান, যবক্ষারজান, বায়ু বাষ্পের বিশেষ সমষ্টি,—রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জা, শুক্র শোণিতের অপূর্ব্ব তেরিজ,—বক্ষঃ মস্তক উদর, উরু পাণি পদ প্রভৃতি অবয়বের এক প্রকার জড় যোগ—বলিলেও চলে; আবার, জ্ঞানের গুরুভাণ্ডার বুদ্ধির লীলাপট, শ্রীর রঙ্গ ভূমি, ভক্তির অপূর্ব্ব আধার—বলিলেও চলে।—এই ছোট ফুলের গাছটি,—মূল, কাণ্ড, শাখা, উপশাখা, পত্র ফুল, এই সকলের সমষ্টি বলা যাইতে পারে; আবার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র, ঘ্রাণরঞ্জন সুগন্ধের খনি, হৃদয়উৎফুল্লকর কোমলতার ছবি, সদ্যোজাত শোভার সূতিকাগৃহ—এরূপ বলিলেও চলে। এই বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্র—কেবল মাত্র বিংশতি কোটি দাসের বাস ভূমি, আঠারটি ভাষার অধিষ্ঠান জন্য চারি লক্ষ বর্গ ক্রোশ ক্ষেত্র, গঙ্গা যমুনা সিন্ধু কাবেরী প্রভৃতির প্রবাহের স্থান, বিন্ধ্য হিমালয়াদির দাঁড়াইবার স্থল, শাল তাল তমালের বিস্তীর্ণ উপবন, ভারত সাগর, দক্ষিণ সাগর, আরব সাগর—ত্রিসিন্ধুর ত্রিবিক্রমের অভিঘাত স্থল-এভাবে বলিলেও চলে; আবার অন্যদিক দিয়া—বৈদিক দার্শনিক পৌরাণিক বৌদ্ধ,—নাস্তিক, বৈষ্ণব, ইসলাম, খ্রীষ্টান, ধর্ম্ম সকলের সম্মিলন স্থল, অনন্ত উৎসে উৎসারিত, কেন্দ্রাভি মুখে প্রসারিত জগদ্ব্যাপক

* ২৮শে বৈশাখ সন ১২৯২ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরির ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

ইতিহাস স্রোতের কেন্দ্রস্থিত জলপ্রপাত, অধর্ম্ম তাড়নায় ধর্ম্মের পরীক্ষা ভূমি, সহিষ্ণুতার আদর্শ ক্ষেত্র, ভবঘোর চক্রের লীলা রঙ্গের বিষম উত্থান পতনের ভীষণ নাগরদোলা, সমগ্র ইতিহাস ক্লক পরিচালনের মূলশক্তি স্বরূপ সুমহৎ পেণ্ডুলম, শৌর্য্য বীর্য্যের দোর্দ্দণ্ড ভূতকালের সহিত, কোমল হইতে কোমলতর ভক্তিভরা ভবিষ্যতের মিলন মন্দির;—ভারত ক্ষেত্রকে এরূপেও দেখা যায়।

সকল বিষয়ই এইরূপে দুই দিক দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়। মানবীয় সমস্ত অনুষ্ঠানেরই সুতরাং দুই পৃষ্ঠ আছে।

একটি ভাবকে স্বার্থের ভাব, জড়ের ভাব, ঐহিক ভাব, টাকা-আনা-পয়সার ভাব, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাব, আর অন্যটিকে ধর্ম্মের ভাব, আধ্যাত্মিক ভাব, পারত্রিক ভাব, হিত—মঙ্গল—ভালবাসার ভাব, মনোবিজ্ঞানের ভাব,—বলা যাইতে পারে।

ইংরাজি শিক্ষিতের পক্ষে এই দুইটি ভাব, বুঝিবার জন্য একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা বকল এইটি দেখাইয়া দেন। আডাম স্মিথের দুই খানি গ্রন্থ আছে। এক খানির নাম Wealth of Nations বা বিভিন্ন জাতির অর্থ সংস্থান, আর একখানি, Theory of Moral Sentiments ধর্ম্মনীতিতত্ত্বে মত ভেদ; প্রথম খানি অর্থ নীতির পুস্তক; তাহাতে ধন-সংস্থানের কথা আছে; দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ের নামগন্ধ সে পুস্তকে নাই; আডাম্ স্মিথ নিক্তিপাল্লা লইয়া প্রকৃত বণিকের মত জাতি সুলভ বণিগ্‌ভাবে, রতি মাসা খুঁটাইয়া ওজন করিতেচেন, আর পাকা মুহুরির মত বসিয়া, তাহারই কাণ ক্রান্তি হিসাব করিতেছেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই, হৃদয় বলিয়া ধুকধুকনির কোন সামগ্রী নাই চক্ষুলজ্জা নাই, ভাবুকতার নাম গন্ধ নাই। আবার সেই আডাম্ স্মিথই যখন ধর্ম্ম নীতির তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার আর এক মূর্ত্তি। মানব হৃদয়ের গূঢ় হইতে গূঢ়তর ভাবের, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর শক্তির বিচার করিতেছেন; তখন মানবের ধুক্ ধুকনির ক্ষুদ্র বস্তুটিই, তাঁহার এক মাত্র পুঁজি; তাই লইয়াই নাড়া চাড়া, তাই লইয়াই সুদে খাটান, চোটা চালান আসল, বাড়ান।

এই রূপ করিয়া দুই ভাবে না দেখিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত পর্য্যালোচনা

হয় না। সকম বিষয়ের এ পীঠ ও পীঠ, দুই পীঠই এই ভাবে দেখা আবশ্যক।

আজি কালি একটা বড় বিষম বাতাস উঠিয়াছে; অনেকেই অনেক বিষয় কেবল বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে উদ্যত; ধর্ম্মাধর্ম্মের, ভক্তি-ভালবাসার, দয়া-দাক্ষিণ্যের, হিতাহিত জ্ঞানের—বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে; স্পর্দ্ধা করিয়া মহামহা পণ্ডিতে বলিতেছেন, হিন্দুশাস্ত্র সমস্তই বৈজ্ঞানিক। এ বড় বিষম কথা! আমাদের যৎসামান্য ক্ষুদ্র শক্তি কেন্দ্রস্থিত করিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মতের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি।

কোন একটি তত্ত্বের বিজ্ঞান কেবল একটি পৃষ্ঠ দেখিতে পায় মাত্র। হিন্দুর মতে সেটুকু সামান্য অংশ, অত্যল্প বিস্তৃত ভাগ; সেটুকুর পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু গৌণ কল্পে; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বহু বিস্তৃত অংশের পর্য্যালোচনা করাই, অগ্রে কর্ত্তব্য, মধ্যে কর্ত্তব্য, শেষে কর্ত্তব্য, সেইটিই মুখ্য কর্ত্তব্য। উচিত অনুচিত বুঝিতে হইলে, কেবল ধর্ম্মের নিকষেই ঘষিতে হয়। এই সকল কথা বুঝিতে হইলে, অনেকগুলি কথা দেখিতে হইবে।

গুটি দুই উদাহরণ দিব;—

মনুষ্যের পক্ষে মাংসাহার করা উচিত কি না,—এ বিষয়ে তর্ক চিরদিনই আছে। বৈজ্ঞানিক প্রবর কোমৎ বলেন, যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয়, সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য; কেবল জিহ্বার শিরা বিশেষের তৃপ্তিজন্য কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। ইহাকেই বলে কেবল বিজ্ঞানের দিক্ দেখা।

ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা মধ্যে মহর্ষি মনু সুপ্রসিদ্ধ; ধর্ম্মের দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রখরা, অথচ তাৎকালিক বিজ্ঞানেও তাঁহার অবহেলা নাই। মাংসাহার সম্বন্ধে তিনি তৎকালের আচার ও বিজ্ঞানের পরামর্শ লইয়া এটি খাবে, এটি খাবে না, এই ভাবে মত দিয়াছেন; এই গুলি বৈধ, এই গুলি অবৈধ—বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শেষ মীমাংসা শুনুন;—

যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
সজীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥

যে অহিংসক জীবকে আত্মসুখের ইচ্ছায় হনন করে, সে কি জীবন্তে, আর কি মৃত্যুর পর, ইহকালে পরকালে কখনই সুখ পায় না।

কিন্তু ;—

যো বন্ধন বধক্লেশান্ প্রাণীনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সু, সুখমত্যন্ত মশ্নুতে॥

যে প্রাণীদিগকে বধ বন্ধনের ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করে না, সেই সর্ব্বহিতাভিলাষী ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভোগ করে।

এখন কথা হইতে পারে, যে, এই যে কথা, ইহার কি কোন যুক্তি নাই; বিজ্ঞানেরই যুক্তি আছে, ধর্ম্মের কি কিছু যুক্তি নাই? আছে বৈকি।

না কৃত্বা প্রণীনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ স্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ॥

প্রাণীহিংসা না করিলে কখনই মাংস পাওয়া যায় না, আর প্রাণিবধ কাজটা কিছু ভাল কাজ নহে, সুতরাং মাংস ত্যাগ করাই ভাল।

তার্কিকে এই স্থলে বলিতে পারেন, যে, ও আবার কি কথা হইল? 'প্রাণিবধ কাজটা ভাল কাজ নয়', সে আবার কেমন কথা হইল?"

এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর পক্ষ স্বরূপে মনু পরের শ্লোকে বলিতেছেন,—

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌচ দেহীনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্ততে সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥

জীবের শুক্রশোণিতে মাংসের উৎপত্তির কথাটা এবং প্রাণীগুলাকে বন্ধন ও বধ করিবার ক্লেশের কথাটা—বেশ করিয়া বুঝিয়া, সকল প্রকার মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।

অতএব মীমাংসা হইল যে,—

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

জীবগণের মাংসাহারাদি প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই মহা ফল। এইটি হইল ধর্ম্মের কথা। বিজ্ঞান আজি বলিতেছে গ্লূটেন-প্রধান খাদ্য ভাল, কালি বলিতেছে, ষ্টার্চ-প্রধান খাদ্য ভাল; বিজ্ঞান বা ইতিহাসের ভিত্তির উপর যে সকল ধর্ম্ম মত প্রচলিত আছে, তাহার এটিতে বলিতেছে শূকর মাংস নিষিদ্ধ, ওটিতে বলিতেছে, কুক্কুট মাংস অভক্ষ্য; কিন্তু ধর্ম্মের যে কথা, 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা,' সে কথা সকল স্থানেই সমান ভাব আছে। অর্থাৎ ধর্ম্মের টান, একটানা, একই দিকে চলিয়াছে; পদার্থ-বিজ্ঞানে জোয়ার ভাঁটা আছে।

আর একটি উদাহরণ দিব ;—

এক জন লোক নদীতে পড়িয়াছে, হাবুডুবু খাইতেছে। তুমি একজন পণ্ডিত লোক নিকটে তীরে, দাঁড়াইয়া আছে ; কথাটা মনে উঠিল, উহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে কি না ? বিজ্ঞান কি পরামর্শ দেন, দেখ,—বিজ্ঞান প্রথমেই বলিলেন, অগ্রে দেখ, উহাকে উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা কতটা আছে ; স্রোতের বেগের সহিত তোমার শরীরের বলের তুলনা কর ; তুমি বলিলে তা ত এখন হয়ে উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, "তাহার পর দেখ, উহাকে উদ্ধার করিতে গেলে, যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন, তোমার দেহের বল হইতে নদীর স্রোতের বেগ বাদ দিয়া, ততটা বল তোমার আছে কি না; তাহার পর দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তোমার প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা কতটুকু আছে। যদি সিকি সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে, তোমাকে আমি ঐ কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইতে বলি না, কেন না তুমি ঐ আসন্নমৃত্যু লোক অপেক্ষা চৌগুণের অধিক কৃতী। বিজ্ঞানের পরামর্শ মত কাজ করা তোমার পক্ষে অসাধ্য হইল ; এরূপে সম্ভাবনা অসম্ভাবনার ঠিক ফাজিল করিতে তুমি পারিলে না ; তখন ধর্ম্মের দিকে তুমি তাকাইলে, ধর্ম্ম বলিলেন, "কিসের গণনায় সময় নষ্ট করিতেছ ? তুমি সাহায্য করিলে, যখন লোকটা রক্ষা পাইতে পারে ; তখন তুমি আর নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া কেন ?" কথাটা তোমার প্রাণের ভিতরে টং করিয়া বাজিল ; ঘণ্টা শুনিলে যেমন দৌড়িয়া গাড়িতে উঠিবার জন্য আপনা আপনিই দ্রুতপদে চলিতে হয়, তেমনই ভাবে তুমি সেই প্রাণের ভিতরের আওয়াজে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে ; হঠাৎ তোমার চতুর্গুণ বল হইল ; লোকটি উদ্ধার করিলে।

ইহাতে এই বুঝা যায়, যে বিজ্ঞানের পরামর্শানুসারে কার্য্য করা অনেক সময় অসম্ভব ; ধর্ম্মের কথা সহজ, অথচ পরিষ্কার ; তবে যাজনা করা তত সহজ নহে। Practical নহে। Practical নহে, সুতরাং ধর্ম্ম পালনীয়ও নহে, এমনই একটা কথা আজি কালি শুনা যাইতেছে।

কথাটা উঠিয়াছে অনেক দিন, কিন্তু আর বৎসর রাজমুখে নিঃস্থতি পাইয়া বড়ই কলঙ্ক বহন করিয়াছে। সকল বিষয়েই লোকের এখন প্রাক্‌টিকাল হইবার বড় ঝোঁক। প্রাক্‌টিকাল হইবার না হৌক, প্রাক্‌টিকাল

কথটা লইয়া গণ্ডগোল করিবার বড়ই প্রবৃত্তি। যাহাতে টাকার ঝন্ ঝনানি, বা পদাঘাতের কন্ কনানি নাই, তাহাই প্রেক্টিকাল নহে। সুতরাং চাকুরি জিনিষটাই বিষম প্রাক্টিকাল। এভাব অনেক দিন উঠিয়াছে, অনেক দিন চলিতেছে; কিন্তু এখন রাজমুখে বিবৃত হইয়াছে, যে ধর্ম্ম যদি প্রাক্টিকাল না হয়, তবে তাহা ধর্ম্মই নহে। প্রাক্টিকাল বাদীরা বলেন, * যে সকল মত প্রাক্টিকাল নহে, তাহা যে গভীর ভাবে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। সেই সকল ধর্ম্মমত যদি কার্য্যে পরিণত করিতে যাই, তবে তাহাতে অনর্থ পাত হইতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, আমাদের সকলেরই মত যে আমাদের প্রতিবেশীগণকে আমাদের আপনার মত ভাল বাসা উচিত, কিন্তু কখন যে আমরা সেরূপ করিব, সে আশঙ্কা আমাদের নাই।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যাহা সহজে যাজনা হয় না, তাহা ধর্ম্মই নহে। এমন ঘোরতর সয়তানি মত, ধর্ম্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা—আর হয় না।

মানব চরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম ধর্ম্ম। আদর্শ বলিয়াই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব; এবং সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব বলিয়াই উহা আদর্শ।

কোন আদর্শেরই পূর্ণভোগ হয় না; সম্পূর্ণ আয়ত্তি হয় না; ধর্ম্ম কখন হস্তামলক হন না। কোণিক বক্ররেখা হাইপর-বোলার মধ্যস্থিত বজ্ররেখা-দ্বয়ের মত, সাধু চরিত্র চিরদিনই ধর্ম্মের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ ধর্ম্ম, মরীচিকার মত মিথ্যা মোহজ পদার্থ নহে; ধর্ম্ম মরীচিকার মত ধোঁয়া ধোঁয়া, ঘোলা ঘোলা জিনিশ নহে; ধর্ম্ম মরীচিকার মত পিছাইয়া যায় না; ধর্ম্ম মরীচিকার মত বৃথা আশায় আশ্বাসিত করিয়া হঠাৎ নিরাশার

---

* There are theories which are never serious, because they are not practical—We all hold theories which might be called dangerous if we ever thought of carrying them out; we all hold the theory, for instance, that we ought to love our neighbour exactly as ourselves, but no one seems afraid, that we shall ever do so.

কঠোরতায় আচ্ছন্ন করে না। ধর্ম্ম সত্য পদার্থ; নিত্য পদার্থ; উজ্জ্বল, শান্ত, ধীর, স্থির, আভা-ময়। ধর্ম্মের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই তুমি আশ্বস্ত হইবে, শীতল হইবে; যে ধর্ম্মের দিকে কিঞ্চিৎ মাত্রও অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকে কখনই ধর্ম্ম আর নিরাশে নিপাতিত করেন না; অথচ চিরজীবন, জন্মে জন্মে সাধুব্যক্তি ক্রমেই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, কখনই স্পর্শ করিতে পারেন না। সামীপ্য ক্রমেই গাঢ়তর হয়, অথচ সাযুজ্য অনন্তকাল সাধ্য।

লক্ষ্য স্থির, সম্মুখে উজ্জ্বল আভায় বিরাজমান, পান্থ ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন, ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, অথচ কখনই ধরিতে পারেন না; এই বিচিত্র জীবন্ত রহস্যেই ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মের গৌরব, ধর্ম্মের আদর্শভাব ও ধর্ম্মের উপকারিতা। যে, ধর্ম্মের এই গূঢ় রহস্য বুঝে নাই, সেই ধর্ম্মকে Practical বা পূর্ণায়ত্ত করিতে চায়। Practical ধর্ম্ম আর অশ্বডিম্ব সমান কথা। যাহা অদ্য unpractical আছে কাল তাহাকে practical করিবার চেষ্টার নাম বৈজ্ঞানিক চেষ্টা। আর যাহা আজি unpractical, কল্য unpractical, চিরদিনই unpractical থাকিবে, এরূপ জানিয়া শুনিয়া যাহার আমরা *practice* করিতে যাই তাহাই ধর্ম্ম।

এই দেবকন্যা বিদ্যুৎকে সম্বাদ বাহিকা করিব, এই বজ্রধর বাষ্পরাশিকে শকটচালক করিব, এই প্রশস্ত পর্ব্বত উড়াইয়া দিব, এই বিষম সমুদ্র শুষ্ক করিব, এই মহামরু শাহারায় সাগর তরঙ্গ খেলাইব, এ সকলই বৈজ্ঞানিকের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কীর্ত্তি।

আর, যে আপনাকে ভুলিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না, যে আপনাকে ভুলা অসম্ভব, ঘোরতর unpractical, সেই আপনাকে ভুলিবার চেষ্টা করিব; আপনাকে ভুলিয়া পরের সেবা করিব; আপনারই অন্নসংস্থান করিয়া উঠিতে পারি না, অথচ পরকে মুষ্টা দিতেই হইবে; নিজে রোগ শোকের জ্বালায় অস্থির, তবু পরকে সান্ত্বনা দিব; অনেক সময় হয়ত সত্য বলিতে গেলে প্রিয় হয় না, প্রিয় বলিতে গেলে সত্য থাকে না, ইহা জানিয়াও তবু কেবল সত্য কথা ও প্রিয় কথা বলিবার চেষ্টা করিব; যিনি অসীম, অনন্ত, কল্পনার অতীত, তাঁহার ধ্যান ধারণা, উপাসনা, আরাধনা সকলই অসম্ভব;

তথাপি তাঁহার উপাসনা আরাধনা সকল সময়েই করিব,—ধার্ম্মিকের, আশা এইরূপ, আকাঙ্ক্ষা এইরূপ, কীর্ত্তি এইরূপ। আপাতত অসম্ভবকে কালে সম্ভব করার নাম বিজ্ঞান; আর নিত্য অসম্ভবের যাজনা করার নাম ধর্ম্ম। সুতরাং practical ধর্ম্মের মত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম কথাটা নিতান্ত হাস্যকর শব্দসংযোগ।

ধর্ম্মের এই রহস্য ভাব আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কোন সদনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ যাজনা হয় না বলিয়া, সেই অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; যদি অনুষ্ঠান ভাল হয়, তবে কিসে তাহার সুচারু যাজনা হইতে পারে, তাহাই দেখা আমাদের কর্ত্তব্য। হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কি না? এই প্রশ্ন আর এক ভাবে বলিলে, এই বলিতে হয় যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়া কি না? বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যদি সদনুষ্ঠান হয়, তবে পালনীয় বটে; কঠোর হইলেও পালনীয়। সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব হইলেও, unpractical হইলেও, অবশ্য পালনীয়। তবে হিন্দু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সঙ্গত কি অসঙ্গত, ইহা বুঝিবার জন্য হিন্দু, বিবাহ বলিলে কি বুঝেন, তাহা অগ্রে বুঝা চাই।

সকল অনুষ্ঠানই যেমন দুইদিক্ দিয়া দুই ভাবে দেয়া যায়, হিন্দুর বিবাহও সেইরূপ দুই দিক দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়। এক ভাবে বলা যাইতে পারে, যে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। জড়দিক্ দেখিলে উদ্দেশ্য ঐ রূপই বটে। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি ঐ রূপই হইল, তবে আর অত বাঁধা ছাঁদা কেন? উপবিবাহইত যথেষ্ট। ইহার উত্তর স্বরূপে বলা হইয়াছে, যে, পুত্রের জন্য বিবাহ করা আবশ্যক। ভাল, পুত্রেরই বা প্রয়োজন কি? পিণ্ড প্রাপ্তির জন্য পুত্রের প্রয়োজন। পিণ্ড আত্মতোষণের উপকরণ, উহাতে আর 'কেন' এই শব্দটা উঠিবে না। আত্মপোষণ, আত্মতৃপ্তি, স্বার্থ রক্ষা, এই সকলের একটি না হয় আরটিই, এরূপ যুক্তির চরমপদ।

অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এ সিদ্ধান্ত—বিবাহের অতি নিকৃষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ,—দেখিয়াই হইয়াছে। হিন্দুবিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; সকল ব্যাপারেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

বিশাল হইতে বিশালতরে, বিশালতর হইতে বিশালতমে পরিণতি, অথচ বিলয়, ইহাই জগতের ক্রম, ইহাই জগতের নিয়ম, ইহাতেই জগতের সৌন্দর্য্য। এই ক্ষুদ্র মানবজীবনের বিশাল হইতে বিশালতমে পরিণতিই, ইহার পরমার্থ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার সুন্দর ক্রম আছে, সুচারু পদ্ধতি আছে। প্রথমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, তাহার পর পারিবারিক বা সাংসারিক উন্নতি; তাহার পর সামাজিক উন্নতি; সর্ব্বশেষে ঐশ্বরিক উন্নতি। জীবনের এই চারিটি ক্রমহইতেই চারিটি আশ্রম। দ্বিতীয় আশ্রমের; অর্থাৎ গৃহীর পারিবারিক জীবনের মূল গ্রন্থি গৃহিণী। গৃহিণী লইয়াই গৃহ। গৃহিণী না হইলে গার্হস্থ্য হয় না; গার্হস্থ্য আশ্রমের পরে না হইলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হয় না। সন্ন্যাসরূপ বিশালতর সামাজিকতা হইতে বিশালতম বিশ্বযোগ বা সমাধি। কাজেই পণ্ডিতে বলিয়াছেন, "হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি।" "বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী।" বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বন। "অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি" হন। হিন্দু বিবাহে পতিপত্নীর যেরূপ একত্ব হয়, "এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই।" "সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই।" "জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনই স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী তেমনই পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে।" "স্বয়ম্ভু নিজদেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভু প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে।" "স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্যত্ব সাধক।" হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য "এই মিশ্রণ এবং একীকরণ।"

একটি পুরুষের সহিত একটি স্ত্রীর একীকরণের নাম বিবাহ বটে, কিন্তু সেই পুরুষ আকাশবিক্ষিপ্ত প্রান্তরস্থিত কোন ব্যক্তি নহেন; তিনি একটি বিশেষ গোত্রের, বিশেষ প্রবরের, বিশেষ কুলের অন্তর্গত এবং অঙ্গীভূত ব্যক্তি। স্ত্রীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ হইতে হইলে অগ্রে তাঁহার গোত্রান্তর আবশ্যক;

হিন্দুর বিবাহ বিলাতের মত রূপজ, গুণজ মোহের মিলন নহে; নেড়া নেড়ির কাণ্ডও নহে। একটি পরিবারে দশটি স্ত্রীপুরুষ আছেন, আর একটি আসিয়া তাহাতে মিশিয়া যাইবে, তবে তাহার বিবাহ হইবে। সেই বিবাহের পর হইতে সেই পরিবার মধ্যে আর একটি সম্পূর্ণ পুরুষ হইল, একথা ঠিক, কিন্তু একে আর একে মিলনে যে এরূপ হইল, তাহা নহে, দশে আর একে মিলন হইয়া, তবে সেই সম্পূর্ণতা সম্পাদন হইল। অতএব, কেবল একে আর একে মিলনের নাম বিবাহ নহে, আধ খানিকে পূরা একখানি করিবার জন্য একটি পরিবার মধ্যে একটি নারীর আগম, মিলন, ও মিশ্রণই বিবাহ। বিবাহ—কুললক্ষ্মীর কুলে প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যদ্ গৃহিণীর গৃহে অধিষ্ঠান। বৈদেশিক বিবাহের পরই যুবক, যুবতী মধুমাস কুলভ্রষ্ট, গোষ্ঠীভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট হইয়া বাস করেন; আমাদের দ্বিরাগমনের নবোঢ়া সমস্ত পরিবারের সাম্রাজ্ঞী-সেবিকারূপে অর্দ্ধহস্ত গুণ্ঠনে গুণ্ঠিত হইয়া কুটনা কুটিতে বসিলেন। হিন্দুর বিবাহ একটি কুল-কর্ম্ম। আত্মকৃতি নহে।

অতএব বুঝিতে গেলে বলিতে হয়, একটি পরিবারের সহিত একটি হিন্দু কুমারীর বিবাহ হয়; কেবল একটি পুরুষের সহিত নহে। আমাদের লৌকিক কথায় ও ব্যবহারেও আমরা সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছি। "মেয়েটির কোথায় বিবাহ দিলেন মহাশয়?" "উত্তর, শ্রীপুরের চৌধুরীদের বাড়ী।" "ভাল বংশ বটে, ভাত কাপড়ের দুঃখ হবে না।" তাহার পরের প্রশ্ন "পাত্রটি কেমন"? "কালেজে লেখা পড়া করিতেছে।" তবেই মুখ্য কথাটা হ'ল, যে কুল কেমন? কেননা হিন্দু বুঝেন, বিবাহ কুলের সহিত, বিশেষ পুরুষ কেবল পাত্র মাত্র।

বিবাহের মন্ত্রে বর বারম্বার বলিতে থাকেন. ;—

ওঁ ধ্রুবা দৌঃ, ধ্রুবা পৃথিবী,
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ,
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে,
ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতি কুলে ধ্রুব।

কন্যা বলেন,—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং।
পতি কুলে ভূয়াসম্‌।

হে ধ্রুব নক্ষত্র; তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতি কুলে অচলা হই।

বর কন্যাকে বলিতেছেন;—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব,
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব,
ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী ভব,
সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।

শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও।

অতএব স্ত্রীকে কেবল The Empress of my heart হইলে চলিবে না, The Slave Empress of a whole family হওয়া চাই। 'যতগুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর তত গুলি সম্বন্ধ বা তত গুলি লোকের সহিত সম্বন্ধ," "হিন্দু পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচল ভাবে," ধ্রুব নক্ষত্রের মত, স্থির রাখিতে "আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান।*" হিন্দুর বিবাহে দুটি তারা দেখিতে হয়—একটি অরুন্ধতি, আর একটি ধ্রুবতারা। অরুন্ধতিকে সাক্ষি করিয়া, আদর্শ করিয়া, কন্যা বলেন, 'হে অরুন্ধতি আমি যেন তোমার মত পতিতে আবদ্ধ থাকি। (অরুন্ধতি বশিষ্ঠের জায়া, তিনি আকাশেও বশিষ্ঠের সহচরী) অর্থাৎ ইহকালে পরকালে যেন সমান আবদ্ধ থাকি। আর ধ্রুবকে সাক্ষি করিয়া বলেন, আমি যেন তোমার মত পতিকুলে চিরস্থির থাকি।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটিও কথা কহি নাই,

বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত উদ্ধৃত বাক্যই বাবু চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সাবিত্রী লাইব্রেরির পূর্ব্ব এক বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত, "হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ও বয়স" নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। বঙ্গদর্শনের সপ্তম খণ্ডের শেষ ভাগে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; যাঁহারা আমাদের এই প্রবন্ধের এতদূর পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সেই প্রবন্ধ এই সঙ্গে একবার পাঠ করিতে একান্ত অনুরোধ করি। হিন্দু বিবাহের ওরূপ পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই।

এখন একবার আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ কথাটা যেন কেমন কেমন লাগে না? ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিলে, হিন্দু নারীর বিবাহ যেরূপ পদার্থ, তাহাতে তাঁহার পুনর্বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না।

হিন্দু রমণী একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা, ও পরিণীতা হইয়াছে, সে কোন প্রকারেই আর সে কুল ত্যাগ করিতে পারে না। কুল-ত্যাগিনী, কুলটা ব্যভিচারিণী, আমাদের হিন্দুদের অভিধানে একই পর্য্যায় ভুক্ত। এই পরিভ্রাম্যমান জগতের মধ্যে এক মাত্র অচল, অটল পদার্থ ধ্রুব নক্ষত্রকে সাক্ষি করিয়া হিন্দু নারী বলিয়াছেন,—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং।
পতি কুলে ভূয়াসম্।

আমি যেন পতি কুলে অচলা হই; তবে আজি কোন প্রাণে সেই পতি-কুল ত্যাগ করিবেন? তবে যে ধর্ম্মের দিকে তাকাইবে না, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

তাহার পর আবার দেখ, বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায় মিল। হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাঁহার আত্মার ধ্বংশ হয় না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতি-ধর্ম্ম। এখন বলুন দেখি, হিন্দু নারী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে যাইবে? তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্বামী বিদেশে থাকিলে তো, তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহের দাবি চলিবে। পবিত্র সাবিত্রী নামে উৎসর্গীকৃত এই লাইব্রেরীর অধিবেশন অবসরে, এসকল কথা মুখে আনিতেও কুণ্ঠা হয়। সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর ব্রত কথার শিক্ষা আমরা ভুলিতেছি; শাস্ত্রের উপদেশ, যে, যিনি সতী, তিনি স্বয়ং যমরাজকেও ভয় করেন না, কৃতান্ত তাঁহাকে পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না! একথা আমরা বিশ্বাস করি, সতী কখন বিধবা হন না, স্বামী দেশেই থাকুন, আর বিদেশেই থাকুন, ইহ লোকেই থাকুন, আর পরলোকগতই হউন, দুই দিনের, দশদিনের, যুগের, মহাযুগের বিচ্ছেদ হইলেও তিনি স্বামীর; স্বামী তাঁহার; তবে সতী আর বিধবা হইলেন কৈ? সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর ব্রত কথার এই গভীর উপদেশ। যে নারী

এই মহৎ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চমৎকার উপদেশ! চমৎকার ধর্ম্ম!

দেখা যাইতেছে, যে দুইটি তারাকে সাক্ষি রাখিয়া হিন্দু নারী বিবাহিতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুই জনেই তাঁহার পুনর্বিবাহের একান্ত বিরোধী; অরুন্ধতি বলেন, 'তুমি যে আমার মত ইহকালে পরকালে স্বামী সহচরী থাকিবে বলিয়াছিলে, তোমার সে কথা থাকে কৈ?' ধ্রুব বলেন, 'তুমি যে আমার মত স্বামীকুলে অচল অটল থাকিবে বলিয়াছিলে, তোমার সে কথাটাই বা থাকে কৈ?' তবেত হিন্দু বিধবার আর বিবাহ করা হয় না? যদি নাই হয়, তবে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ 'নষ্টেমৃতে' শ্লোকের কি দশা হইবে? দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবও এক প্রকার বৈধ পুত্র, সে ব্যবস্থার কি হইবে?

আমার সুদীর্ঘ ব্যাখার প্রথমাংশ যদি আমি বিশদ করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে, আপনারা অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন, যে আমি এই তর্কের মীমাংসা জন্যই, মাংসাহার সম্বন্ধে মনুর মত সঙ্কলন করিয়াছি।

মাংস সম্বন্ধে হরিণটি, ছাগলটি,—কোন কোন স্থলে খাইতে পার বটে, কিন্তু—

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারিলেই ধর্ম্ম। এস্থলেও ঠিক তাই, 'নষ্টে' পারিবে, 'প্রব্রজিতে' পারিবে, ইত্যাদি কিন্তু—

প্রবৃত্তিরেষা নারীণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে দেবল, নারদ, পরাশর, মনু,—ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজক সকলেরই এই মত, সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের এই মত। নষ্টে মৃতের পরের শ্লোকটি পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। মনু যেমন পৌনর্ভবকে পুত্র মধ্যে ধরিয়াছেন, তেমনই কানীন ও গূঢ়োৎপন্নকেও পুত্র বলিয়াছেন। যদি পৌনর্ভবের পুত্রত্ব দেখাইয়া বিধবা বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত বলিতে পারা যায়, তাহা হইতে কানীন ও গূঢ়োৎপন্ন পুত্রের দোহাই দিয়া, পিনালকোর্ডের ধারাবিশেষের ধর্ম্মত সাফাই করাও চলে। না, শাস্ত্রের ওরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

আদর্শ সমাজের রীতি নীতি লইয়া শাস্ত্র নহে। ধর্ম্মের আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া, সমাজের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্করণ,—শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, যে দেশে বন্য বিন্ধ্যাচল-বাসী হইতে, বেদনিরত ব্রাহ্মণ,—চির দিনই আছেন, সে দেশে অষ্ট প্রকার বিবাহ, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, শতকর্ম্মে শত বিধ ব্যবস্থা থাকিবেই থাকিবে; অনন্ত থাকাই স্বাভাবিক; মাংসাহার প্রসিদ্ধ, আবার নিষিদ্ধ; যজ্ঞে পশুবধ শ্রেয়, আবার অহিংসা পরমধর্ম্ম, বিধবা বিবাহের নিষেধ, আবার বিধি; এ সকলই থাকিবে; তাই বলিয়া তাহার সকল কথাই কি ধর্ম্মসঙ্গত? কখনই কোন শাস্ত্রকার তাহা বলেন না। তাঁহারা সকলেই সকল কার্য্যে মুখ্য গৌণ ভেদ করিয়াছেন; যেটা হওয়া উচিত, কিন্তু পুরাপুরি হয় না, সেইটিই মুখ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং শাস্ত্রের মুখ্য বিধি গুলিই ধর্ম্ম। তবে আবার গৌণ ব্যবস্থা গুলি লইয়া আমার ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কোনটি উচিত, কোনটি অনুচিত,—ধর্ম্মের নিকষেই তাহা স্থির হয়; মুখ্য ব্যবস্থা দেখিয়াই ধর্ম্ম বুঝিতে হয়; 'নষ্টেমৃতে' ইত্যাদি গৌণ ব্যবস্থা লইয়া উচিত অনুচিত মীমাংসা করা যাইতে পারে না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র বিচার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে, হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ গ্রহণের কতটা সঙ্কেত পাই।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বিধিও শাস্ত্রে আছে, বিধবার সহমরণের বিধিও শাস্ত্রে আছে; মহাত্মা রামমোহন রায় বলেন, যে দুইরূপ বিধি থাকিলেও কেবল ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার অবলম্বনীয়। এই কথা লইয়া সে সময়ে ঘোরতর বিচার বিতর্ক হয়। মহাত্মা কিরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখুন;—

কোন কোন শাস্ত্রে আছে বটে, "যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে, তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয়" "কিন্তু বিধবা ধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে অনুধাবন কর।" "আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া সাধ্বী স্ত্রী কেবল ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক থাকিবেন।" কিন্তু সহমরণ সকাম কার্য্য, ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম ধর্ম্ম। "ভগবান্ মনু সর্ব্বাপেক্ষা

বেদজ্ঞ হয়েন; তেঁহ ঐ দুই শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির দুর্ব্বলতা স্বীকার পূর্ব্বক, নিষ্কাম শ্রুতির অনুসারে, পতি মরিলে, স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন।" যেহেতুক "ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ফল কামনাপূর্ব্বক কর্ম্মকে অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্মকে কাম্য কহা যায়, সে কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।" আর প্রতিবাদীরা যে লিখিয়াছেন, "কাম্য কর্ম্মের নিষেধ কোথাও নাই,—এ অশাস্ত্র; যে হেতুক কাম্য কর্ম্মের নিষেধক শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে, স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়।" * রাজা মহাশয় যদিও বৃহৎ গ্রন্থ লেখেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়, যে নিষ্কাম আশ্রম ধর্ম্মের যাজনা করাই হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ; সকাম কর্ম্মের নিষেধ শ্রুতি, স্মৃতিতে,—উপনিষৎ, গীতায়—সর্ব্বত্র সমান ভাবে আছে।

এখন মহাত্মার প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণ করিয়া হিন্দু বিধবার কোন পথ অবলম্বন করা উচিত তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন;—বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন, স্বামীসহমরণে তনুত্যাগ করিতে পারেন, আর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিপাত করিতে পারেন; মনে করুন শাস্ত্রে তিন পন্থাই দেখান আছে—তিনটিই কি উচিত? তাহা কখনই হইতে পারে না। কোনটি ত্যাজ্য, আর কোনটি অবলম্বনীয়, হিন্দু তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

স্বামীর পরলোকগতির পর, যে রমণী বিবাহ করেন, তিনি আপনার জন্যই বিব্রত; তাও আবার কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং তাহার কার্য্য, কাম্য মধ্যে ঘোরতম কাম্য। নিকৃষ্ট সমাজে এরূপ প্রথা তখনও ছিল; এখনও আছে। নাগকন্যা উলূপী, রাক্ষস-জায়া মন্দোদরী, বা বানরপত্নী তারা, পুনর্ভূ হয়েন; শ্রেণীবিশেষ মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল বলিয়াই শাস্ত্রে এরূপ কাম্য কর্ম্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু কাম্য কর্ম্মের নিষেধ, শাস্ত্রের প্রতি শাখায় প্রশাখায় দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরণও

*শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাত্মার গ্রন্থাবলি মধ্যে সহমরণ বিষয়ক "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ" হইতে উদ্ধৃত-বাক্যগুলি সমস্তই গৃহীত।

কাম্য কর্ম্ম; তবে পারত্রিক সুখভোগের কথাটা, স্বামীর ত্রিকোটি কুল উদ্ধারের কথাটা, উহার সহিত জড়িত থাকায়, এরূপ ঐহিক আত্ম-বিসর্জ্জন, কাম্য কার্য্য মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তবুত কাম্য বটে, সুতরাং হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয়।

পতি বিয়োগের পর স্বামীকে স্মরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক যাঁহারা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন, সকল সভ্য দেশেই এরূপ সাধ্বী নারী পুনর্ভূ অপেক্ষা সমধিক সম্মানিত এবং আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন যাপন করেন, এরূপ নরনারীর সম্প্রদায় প্রায় সকল সভ্য দেশেই আছে, আর সভ্য জাতি সেব্য সকল ধর্ম্মেই এরূপ ব্রহ্মচর্য্যের আদর আছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের য়ুরোপে, মুসলমান ধর্ম্মের আরব, পারস্য, তুরস্কে; বৌদ্ধ ধর্ম্মের চীন, জাপানে—আছে। কিন্তু হিন্দু মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য কেবল মাত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সেব্য নহে। প্রতি গৃহের ভিত্তিরূপে এবং ছাদরূপে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা! এই অধঃপতনের পূর্ব্বে এমন দিন ছিল, যখন সাধারণতঃ কৈশোরের ব্রহ্মচারী, যৌবনে গৃহী হইয়া আবার সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। যে জাতি সমগ্র মনুষ্য-জীবন, কেবল মাত্র একটি অনুদ্যাপনীয় অনন্ত ব্রত বলিয়া এখনও মনে করে, সে জাতির পক্ষে এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

হিন্দুর সতীত্ব ধর্ম্মের পরিষ্কার আদর্শ বলে, হিন্দুর সমাজ সংগঠনের আধ্যাত্মিক প্রণালী প্রযুক্ত, হিন্দুর ব্রতবেদীগৃহের নিয়ম অনুসারে, হিন্দু বিধবা আমরণ ব্রহ্মচারিণী। পতিভক্তি, পতি প্রীতি, পরকালে স্থিরতর বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থায় আন্তরিক শ্রদ্ধা, পারিবারিক নিষ্কাম ধর্ম্ম, এই সকল পবিত্র ভাব সংমিশ্রিত হইয়া হিন্দু বিধবাকে আমরণ ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখে। সাধারণত হিন্দু সমাজ মধ্যে যিনি হিন্দু বিধবার উপর বলব্যবস্থিত ব্রহ্মচর্য্যের (enforced widowhood) অত্যাচারের কথা বলেন, তাঁহার সহৃদয়তার প্রশংসা করিলে চলে, কিন্তু তিনি হিন্দুনারীর চিত্তক্ষেত্রের স্বচ্ছ, নির্ম্মল, পবিত্র, নিষ্ঠাশক্তি যে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

আধ্যাত্মিক আর্য্যধর্ম্মের মহিমা বলে, সর্ব্বজন পূজ্য মন্বাদি মহর্ষিগণের

ধর্ম্মসঙ্গত সুব্যবস্থার গুণে, বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগুরুগণের প্রতিভাময়ী সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আকর্ষণে, মহা মহা মুনি ঋষি প্রণীত পৌরাণিক উপাখ্যান সকলের অপূর্ব্ব উপদেশে, বহুকালের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষায়, সমাজের জলন্ত দৃষ্টান্তে, হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য—তাঁহার সহজ ধর্ম্ম, স্বভাব ধর্ম্ম, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হইয়াছে।

অথচ হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য, জগতের একটি দুর্ল্লভ পদার্থ। ছাদন দড়ি, গোদা নড়ীর মত এই পাতিব্রত্যে "যখন যার, তখন তার" ভাব আসিতেই পারে না। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার মূল মন্ত্র 'সোঽহং।' হিন্দুনারীর সতীত্বের মূলমন্ত্র 'সোঽহং।' হিন্দুর ধর্ম্মের মূলমন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ং, হিন্দুনারীর সতীত্বের মূল মন্ত্র, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং। হিন্দুনারীর সতীত্বের এই একমেবা দ্বিতীয়ং ভাব, যাঁহারা নষ্ট করিতে উদ্যত, আবার বলি, তাঁহাদের হৃদয়ের যে কোন ভাগের প্রশংসা করিতে হয়, কর, কিন্তু তাঁহারা যে হিন্দু সমাজের শক্তিতস্কর—একথা মুখে আনিও না।

হিন্দুনারী জানেন, কেবল একং এবং অদ্বিতীয়ং; কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী; সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী।

সেই মূর্ত্তি কি ক্ষেমঙ্করী, কেমন শান্তিময়ী; কেমন নিষ্কামে কার্য্যকরী; কেমন কোমলে কঠোর; যেন ইহকালে পরকালের ছায়া; সে সৌন্দর্য্যে বিলাস নাই; সে কোমলতায় আবেশ নাই; সে ললিত ভৈরবে গিট্‌কিরি কর্‌তপ নাই; সে বেহাগে "ঢলিয়া পড়ি, ধর ধর" নাই। সে মূর্ত্তি আপনাতে নির্ভর করিতে জানে, করিতে পারে; বিনা মূল্যে সংসারের সেবা করে; তাঁহার কাছে ভোগের সহিত সেবার বিনিময় নাই; তাঁহার কর্ম্মই—প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম; তাঁহার ধর্ম্মই প্রকৃত—হিন্দুধর্ম্ম; তাঁহার জীবন—মহাব্রত; তিনিই যথার্থ ব্রতধারিণী; ব্রহ্মচারিণী; তিনি নারী হইয়াও দেবী।

হিন্দু সমাজে, সধবার সন্তান-পালিনী, গণেশ-জননী মূর্ত্তি। সেই চোখে চোখে বজ্রহীন বিদ্যুতের ধীর, স্থির চালনা, সেই হৃদয়নিঃসৃত ক্ষীরের সহিত স্নেহ সঞ্চার, সে সকলই ভাল; সকলই সুন্দর; কিন্তু তবু তাহার অন্তরতম স্তরে এতটুকু 'আপনি' আছে; জননী আপনাকে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু

কেবল আপনারই জন্য; আপনার সন্তানের জন্য। য়ুরোপের কবিরা এই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছেন; য়ুরোপের ধর্ম্মশাস্ত্র এই দেবীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন; পূজা করিয়াছেন; অঙ্কে শিশু যিশু শোভিতা মেরী মূর্ত্তিই গনেশ-জননী। কিন্তু হিন্দু বিধবার সংসার-পালনী ধাত্রী মূর্ত্তি, ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি,—য়ুরোপের কবিরা বুঝেন নাই, য়ুরোপের শাস্ত্রজ্ঞেরা জানেন না। বিধবার মর্য্যাদা য়ুরোপ জানেন না। নন্নেরিতে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রংশীকরণ করিয়াছে। সংসার-স্থিতা ব্রহ্মচারিণীর সংসার-নির্লিপ্তা মূর্ত্তি, সংসার-সেবিকার সংসারকর্ত্রীর মূর্ত্তি, দাসীর দেবী মূর্ত্তি—এ বৈচিত্র, এ রহস্য, য়ুরোপ বুঝে না, জানে না; য়ুরোপের সহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্ম্মে নাই, সমাজে নাই। সেই রুক্ষ-কেশা, সামান্য-বেশা;—দেব-সেবানুরতা, ভোগ-রাগ-বিরতা,—অতিথি-সৎকার-কারিণী, পরিবার-প্রতিপালনী—সেই সেবার কর্ত্রী, সর্ব্ব-জনের ধাত্রী,—ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীইত এই বঙ্গ সমাজ রক্ষা করিতেছেন। তুমি, আমি—আমরাত সকলেই—এক দিকে উদরের দায়ে ব্যস্ত, অন্য দিকে পৃষ্ঠের ঘায়ে ত্রস্ত। গৃহিণী সন্তানগণের সৃষ্টি স্থিতি দায়ে বিব্রত। কেবল হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে। হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছে; নহিলে এত দিন, আমাদের নিত্যসেবা উঠিয়া যাইত, ঠাকুর ঘরে drawing room হইত, তুলসী মঞ্চে ক্রোটন বসিত, শালগ্রামে বিলিয়ার্ড হইত; গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্ত্তে ক্লবে ডিনর দিতাম, প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে, poor fund এ subscribe করিতাম, মুষ্টি ভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম। তাহা যে আজিও হয় নাই, চুণাগলি যে আজিও চুণাগলিই রহিয়াছে, এখনও রুই কাতলার রাস্তা হয় নাই,—সে কেবল ঐ বিধবার ব্রত পালনের ফলে। গৃহে গৃহে সেই নিষ্কাম ব্রত পালনের জলন্ত দৃষ্টান্ত এখনও আছে বলিয়া, এই ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে যেন আমরা একটু আলো দেখিতে পাইতেছি, আমরা এত যে মূর্খ হইয়াছি, তবু যেন একটা মহৎতত্ত্বের আভাস বুঝিতে পাইতেছি। এই ঘোর অমাবস্যার কোটালের প্রবল বানের তুফান তরঙ্গে পড়িয়াছি বটে, ভাসিয়াও যাইতেছি, তবু ঐ বেদ-ব্রাহ্মণ-অতিথি-পরিবারের সেবিকার মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, যে এ তুফান থাকিবে না, এই তরঙ্গ কমিবে, এ বান ফুরাইবে, এ জোয়ার থামিবে। আমরা আবার সেই অনন্ত

বাহিনী সুর-তরঙ্গিণীর মন্দ স্রোতে অনন্ত সাগরাভিমুখে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমত যাইতে পারিব।

বিনয়ে প্রার্থনা করি, হিন্দু সমাজের এখনকার দিনের এই একমাত্র জীবন্ত শিক্ষয়িত্রীকে, আপনারা ছলে, বলে, কৌশলে,—আইনে আন্দোলনে—সহৃদয়তায়, সভ্যতায়—তাঁহার পবিত্র বেদী হইতে অবতারিত না করেন। প্রকৃত শিক্ষকের অভাবে, আমাদের মধ্যে দিন দিন শিক্ষা-বিভ্রাট হইতেছে। স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা শিক্ষা দেন না, get up করেন ; পরীক্ষার জন্য ছাত্র গঠন করেন ; লড়াইয়ের জন্য মেড়া বানান। দীক্ষা গুরু মৃত মন্ত্র কানে দেন ; সে মন্ত্রের প্রাণ নাই, তাহা প্রাণে লাগিবে কেন? পুরোহিত ঠাকুর শিক্ষা দিবেন কি, নৈবেদ্যের গুরুত্ব বুঝিয়া নিবেদকের গৌরব করেন ; শিক্ষার ধার ধারেন না, ভিক্ষারই অবতার। তবে আর শিক্ষা দেবেন কে? এক শিক্ষা দিবে ইতিহাস ? তাহাত জানি না ; এক শাস্ত্র? তাহাত বুঝি না ; এক ধর্ম্ম ? তাহাত মানি না ; এক অন্যের কর্ম্ম ? তাহাত দেখিতে পাই না। ব্রত শিক্ষা দিতে, জীবনের মহাব্রত বুঝাইতে, বাঙ্গালা দেশে মানুষকে মনুষ্যত্ব শিখাইতে, বুঝাইতে, দেখাইতে,—এখনকার দিনে আছেন কেবল হিন্দুর বিধবা ; প্রার্থনা করি, তাঁহাকে তাঁহার এই গরীয়সী বেদী হইতে, মহীয়সী পরিচর্য্যা হইতে যেন পরিভ্রষ্ট না করেন।

হিন্দু সমাজের সহিত হিন্দু বিধবার, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সুখে, দুঃখে, শিরায় শিরায় জড়িত। যেমন, আতিথ্য, দেব সেবা,—ক্রিয়া কর্ম্ম,—শ্রাদ্ধ তর্পণ—প্রভৃতি লইয়া হিন্দু সমাজ বলিয়া, ইহার কিছুই ত্যাগ করা যায় না ; তেমনই বিধবার ব্রহ্মচর্য্যও এসমাজের নিতান্ত অঙ্গীভূত ; কাজেই অবলম্বনীয়। উচ্চতর হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ গরম গরম বরফের কুলপীর মত অতি উপাদেয় হইলেও, তাহা হয় না। গরম করিতে গেলে, বরফ থাকে না ; বরফ রাখিতে গেলে, গরম করা হয় না। উচ্চতর শ্রেণীমধ্যে বিধবার বিবাহ দিলে, হিন্দুয়ানি থাকে না, হিন্দুয়ানি রাখিতে গেলে বিধবার বিবাহ হয় না। বরফ গরম করিলে, গরম জল হয়, গরম জল অনেক কাজে লাগে ; কিন্তু তাতে ত প্রাণঠাণ্ডা হয় না। হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য বড় ঠাণ্ডা জিনিষ—প্রাণ শীতলকারী পদার্থ ; যেখানে তাহা আবশ্যক, সেখানে বিধবা বিবাহের উষ্ণতা

আনিলে চলিবে কেন? অবশ্য বলিতে পারেন, যে গরম জলও ত চাই? যেখানে চাই, সেখানে আছে; থাকিবেও। নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আছেও, বটে; থাকিবে ও বটে।

সুতরাং উচ্চতর সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করা, একরূপ অসম্ভবের সম্ভাবনা করা। হিন্দুর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দুর্দ্দশা দেখাইয়া, এ কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে; ত্রিশ বৎসর কেন বলি, সমস্ত কলিযুগ, বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতেছে। পরাশর ত কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক; কেবল কলির জন্যইত বিধবা বিবাহের নিয়ম আছে; তবে কলিতেই আবার বিধবা বিবাহ দেখি না কেন? তবে কি মুসলমানেরা বন্ধ করিয়াছিলেন? না তাহাত কেহই বলেন না। তবেই বলিতে হইতেছে, যে বিধবা বিবাহের আইন সমস্ত কলি কালেই আছে, তবে যেখানে খাটে, সেই খানেই খাটিতেছে।

বিধবা বিবাহের পূর্ব্ব পক্ষ, উত্তর পক্ষ তর্কবাদ করা, আমার সংকল্প নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে সকল কথা উঠে, প্রসঙ্গ ক্রমে আমি বোধ হয়, তাহার অনেক কথা বলিয়াছি; তবে সংক্ষেপে সেইগুলি এই সময় একবার ধারাবাহিক রূপে বলিলে ক্ষতি নাই।

ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতার কথা, ব্রহ্মাচারে ব্যভিচারের কথা, বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাতের কথা, অবিবাহিত পুরুষ সকলের বিবাহে সুবিধা হইবার কথা, এই সকল কথা নানা কারণে আমি এই স্থানে তুলিব না; যাঁহারা ইহার জন্য আমাকে অপরাধী করিতে চান, তাঁহাদের কাছে আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

কিন্তু ঐগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি কথা আছে;—একটি তর্ক আছে; তাহার মূল বিলাতী সাম্যবাদ। বিপত্নীক পুরুষ যদি আবার বিবাহ করিতে পান, তবে বিধবা কেন না পারিবেন? কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদীই, ইহার উত্তর দিতে পারেন; "যে তবে বিপত্নীকের পুনর্দার গ্রহণ রহিত হোক।" হিন্দু কিন্তু সে ভাবে উত্তর দেন না। হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না; হিন্দু মানেন অনুপাত-বাদ। ক খ যখন সমান নহে, তখন তাহারা সমান পাইবেও না;

ক যেমন, তেমনই ক পাইবে ; খ যেমন, তেমনই খ পাইবে। ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ ; কর ও খর স্বত্বাধিকার মধ্যেও সেইরূপ অনুপাত হইবে। হিন্দু এই অনুপাতবাদী। হিন্দু স্ত্রী পুরুষের সাম্য স্বীকার করেন না ; কাজেই হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করেন না। সাম্যবাদ হিন্দুর নহে। যাঁহারা সাম্যবাদী তাঁহারা আপনারাই বলিবেন, যে সাম্য হইতে বিধবার বিবাহ আসে না, বিপত্নীকের পুনর্ব্বিবাহ বারণ হয়।

আর এক কথা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অননুপালনীয়, unpractical, সুতরাং উহা ধর্ম্মই নহে। আমরা বিস্তারিত আলোচনায় দেখাইয়াছি, যে যাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, অথচ পালন করিতে হয়, যত পালন করা যায় ততই সহজ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সেই জন্য মহাধর্ম্ম।

শেষ কথা Individual Liberty, বা স্বানুবর্ত্তিতা। হিন্দু বলেন, সামাজিকতাই ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বই ধর্ম্ম ; আত্মচারিতা ধর্ম্ম নহে। ঘোরতর অধর্ম্ম। বিধবা বিবাহের পোষকতায়, যিনি সম্প্রতি বঙ্গসমাজে এই তর্কের উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন ; স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে আত্মচারিতা ধর্ম্ম নহে। আমরা কোন নাম নির্দ্দেশ না করিয়া পণ্ডিতবরের যুক্তির সেই ভাগ ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিলাম।

" I advocate it (widow marriage) on the broad ground of individual liberty of choice."

"I have no daughter. If I had the misfortune to have a young widowed one in my house, I would have certainly tried my utmost to get her remarried, but in that case, I would have thought of her and her only, and never cast a glance about the effect of her marriage on the community at large. In other words, I would have claimed my individual liberty, the liberty of choice of my daughter, and *not the claims of Morality.*"

লেখক স্পষ্টই বলিতেছেন, যে, যখন বিধবার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হই, তখন কেবল আত্ম-চারিতা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর দান করি, সমাজের দিকে তাকাই না, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখি না। হিন্দু বলেন, ধর্ম্মের দিকে,

সমাজের দিকে না তাকাইয়া, আত্ম ইচ্ছার চরিতার্থ করা—কেবল অধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এক্ষণে যে সব মহিলা সাবিত্রী লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রস্তাব অনুসারে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের দুইটি কথা আপনাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিব।

টাকী শ্রীপুরের শ্রীমতী পটেশ্বরী অধিকারী, অষ্টম বর্ষে বিধবা হন। তিনি বলেন;—"বাল্য বিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ।" আমরা বলি, এ কথা ঠিক; পুরুষের বাল্য বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য। আসুন না, সকলে মিলিয়া আমরা বালক-বিবাহের কার্য্যত প্রতিবাদ করি। করিলে, বাল বৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে; যাহার বিবাহ হয় নাই, সে বিধবা হইয়াছে, এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।

যদি কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহে হিন্দুসমাজ প্রশ্রয় দেন, তবে জানি না, কি বলিয়া সে সমাজ মজঃফরপুরের বহরমপুরার শ্রীমতী শিবদাস দেবীর যুক্তি খণ্ডন করিবেন, তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন;—

"প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই বিবাহ না হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হইল না। প্রথম বিবাহে আমাদের শাস্ত্রমতে পিতা কন্যাকে দান করিলেন, কিন্তু পিতার তো কাহাকেও কন্যার শরীর ভোগের অধিকার দিবার ক্ষমতা নাই। সে অধিকার আপনার ভিন্ন আর কাহারই নহে। ঘটনা বিশেষের পর স্ত্রীর সেই আত্মসমর্পণকে সেই জন্যই দ্বিতীয় বিবাহ বলে।

এই জন্য দ্বিতীয় বিবাহ না হইলে বিবাহ পূর্ণ নহে। দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্বে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, স্ত্রী মুক্ত হইলেন, তখন পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি আর নাই। তখন অবশ্যই তাঁহার অন্যকে আত্ম-সমর্পণ করিবার অধিকার হইল। যখন তাহার পূর্ণ বিবাহই হয় নাই, তখন কেন না সে বিবাহ করিতে পারিবে?"

এই প্রশ্নের কি সঙ্গত উত্তর আছে আমরা জানি না; শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন উত্তর পাই নাই। ফল কথা, যদি এস্থলেও নাম-মাত্র বিধবার বিবাহ দিতে হিন্দু সমাজের

আপত্তি থাকে, তবে বালক বিবাহের কার্য্যে প্রতিবাদ করা সকলের একান্তই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ঢাকার শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ, আমার শেষ কথা রূপে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। যে দেশের শিক্ষিতা রমণী এরূপ উচ্চতর ভাবে উদ্দীপিত, সে দেশে মোহকর সমাজ বিপ্লবের আশঙ্কা আমাদের না করিলেও চলে।

"বিধবা বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইলে, ইহাপেক্ষা অনিষ্টের পরিমাণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাঁহারা ধর্ম্মচারিণী হইয়া চিরকাল পরোপকার সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক নর নারীর যত্নবান হওয়া উচিত; যিনি একটি বিধবার জীবনও সৎপথে রাখিতে পারিবেন, তিনি হিন্দু সমাজের শত শত ধন্য বাদের পাত্র।

হিন্দু বিধবা রমণীগণ! আপনাদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন, এই যে, আপনারা বাল্য, যৌবন, কি বৃদ্ধ, যে কালেই বিধবা হউন না কেন, পরম যতনে ধর্ম্ম সাধন রূপ মহৎব্রতে জীবনটি ব্রতি করুন; যথা শাস্ত্র যে ব্যক্তির সহিত আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি পাপী থাকুন, আপনাদের প্রতি করুণা-শূন্য থাকুন, যাহাই হউন না কেন, তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া সেই মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন যাপন করুন; মৃত পতিকে বিস্মৃত হইয়া, কি অন্য পুরুষে প্রণয় স্থাপন করিয়া অধিক সুখী হইতে পারিবেন? কখনই না।

আপনাদের ভাল বসন ভূষণ, উত্তম আহারাদি ও সন্তান সন্ততি হইবে বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য জীবনের সার সুখ?

পত্নী বিয়োগে পুরুষগণ যেরূপ আবার বিবাহ করিয়া অনেক বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা পান, সেরূপ আপনারাও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে আপনাদের কি মহত্ত্ব হইল? বিবাহ না করিয়াও যখন ধর্ম্ম কার্য্যাদি আপনাদিগের আয়ত্তি রহিল, তখন পুরুষদের দাসীত্ব গ্রহণে কি ফল বুঝিতে পারি না।

মৃত পতির ধ্যানে জীবন যাপন করিলে, ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

আহা! যাহার সহিত একত্র চিরকাল ধর্ম্ম সাধন ও সাংসারিক সুখ ভোগাদি করিবেন বলিয়া, আপনারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশত যখন অকালে আপনাদের সেই জীবনসর্ব্বস্ব পতি সকল সাংসারিক সুখ ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আপনারা কোন প্রাণে পুনঃ স্বামী গ্রহণ করিয়া অসার সংসার সুখে মত্ত হইবেন? কোন প্রাণেই বা সেই মৃত স্বামীর প্রেম-মুখ বিস্মৃত হইয়া অন্য পতির প্রতি অনুরাগিণী হইবেন?

সেই মৃত স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া ধর্ম্ম সাধনায় রত হউন, ইহকাল ও পরকালে আপনাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

মৃত পতির পাদ-পদ্ম-ধ্যান-মগ্না ব্রহ্মচারিণী বিধবার মূর্ত্তি কি রমণীয়! তিনি কি শ্রদ্ধার পাত্রী! তাঁহাকে দর্শন করিলেও জীবন পবিত্র হয়; ধর্ম্মারাধনাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব; পশু পক্ষী আদিও ত অন্যান্য ইন্দ্রিয় সুখের অধিকারী; মানব জীবন ধর্ম্মারাধনাতেই সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়। আপনারা অন্যান্য সমস্ত সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মারাধনায় রত হউন। আপনারা লোকের কথায় উতলা না হইয়া, আপনাদের জীবনের যথার্থ সুখের পথ খুলিয়া লইয়া নিজেরাও সুখী হউন, সমস্ত হিন্দু সমাজকেও পবিত্র করুন; আবার ভারত রমনীর সতীত্বের মহিমাতে পৃথিবী মোহিত হউক, এই আমাদের এক মাত্র কামনা।

হিন্দুরীতিনীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে। *

আমরা দেশীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য রীতিনীতি অবলম্বন করিতে যত্নবান হইয়াছি। যিনি যত অধিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, তিনি তত অধিক পাশ্চাত্য রীতিনীতির ভক্ত হইতেছেন। যাঁহারা বিলাতে গিয়া অধিকতর বিদ্যালাভ করিতেছেন তাঁহারা এক কালে স্বদেশীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য রীতিনীতিপরায়ণ হইতেছেন। ইহার কারণ কি? নিতান্ত অসভ্যেরাও তো আপনাদিগের অবলম্বিত রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে চায় না। তবে আমরা এরূপ করি কেন? আমাদের কি কিছুমাত্র আত্মগৌরব নাই? তাই বা বলিব কি প্রকারে? এখনও তো কেবল মাত্র দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, অথবা কি দেশীয় কি পাশ্চাত্য কোন প্রকার শিক্ষা অপ্রাপ্ত এমন অনেকে আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্যগণকে অস্পৃশ্য মনে করেন। তবে, উহা কি পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ? যে ব্যক্তি বিদেশীয় বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাঁহারই কি স্বদেশীয় রীতিনীতির উপর অশ্রদ্ধা হয়? কৈ, যে সকল ইউ-রোপীয় ভারতীয় শিক্ষায় জীবনযাপন করিতেছেন তাঁহারত স্বজাতীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করেন না! যে সকল রীতিনীতি অতি অপকৃষ্ট বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন তাহাও যে তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। তবে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশীয় রীতিনীতির প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি কেন? ইহার কি কোন কারণ নাই? অবশ্য আছে। যে কারণে আমরা ঋষির সন্তান হইয়া মহামূর্খ হইয়াছি, যে কারণে আমরা বীরের বংশধর হইয়া নিতান্ত কাপুরুষ হইয়াছি, যে কারণে আমরা ধর্ম্ম-পরায়ণের পুত্র হইয়া মহাপাপে মগ্ন হইয়াছি সেই নিগূঢ় কারণেই আমরা একবারে অধঃপাতে যাইবার জন্য স্বজাতীয় রীতিনীতি, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় ভাষা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য আপনাদের অস্তিত্ব

* সন ১২৯২ সালের ৯ই চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৭ম বার্ষিক অধি-বেশনে শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

হারাইতে বসিয়াছি। ঐ নিগূঢ় কারণের প্রকৃত অনুসন্ধান অদ্যাপি হয় নাই। আমরা সেই কারণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

আমাদের অবস্থা নিতান্ত হীন। আমরা পরাধীন, নির্ধন, দুর্ব্বল ও মূর্খ। কিন্তু পাশ্চাত্যগণ স্বাধীন, ধনবান, বলশালী ও বিদ্বান্। ইংরাজ আমাদের রাজা, আমরা তাঁহাদের প্রজা। এ প্রভেদ কেন? ইংরাজও মানব, আমরাও মানব, তবে এত প্রভেদ কিসে? পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের পূর্ব্বে এ বিষয় এদেশীয়েরা আদৌ ভাবিতেন না। এখনও যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভে বঞ্চিত তাঁহারা ঐ সকল চিন্তা করেন না। কিন্তু যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করেন তাঁহারা উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করেন। এই জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার এত মান। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পান নাই, তাঁহারা অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও শিক্ষিত দলের মধ্যে গণনীয় হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহারাও শিক্ষিতদলের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। এটী পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণ বটে, পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া মানব কারণ-জিজ্ঞাসু হয়, তত্ত্বজ্ঞ হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই কারণ-জিজ্ঞাসা হইতে—সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে আমাদের স্বজাতিয় রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

আমরা যত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম, যত পাশ্চাত্যগণের রীতিনীতি ও কার্য্যপ্রণালী পরিজ্ঞাত হইতে লাগিলাম, ততই আমাদের বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, আমরা আমাদের কার্য্য-প্রণালীর দোষে, রীতিনীতির দোষে এরূপ অক্ষম হইয়াছি। আমাদের সংস্কার জন্মিয়াছে, আমাদের জাতিভেদ প্রথা, অন্তঃপুর প্রথা, বিবাহ প্রণালী, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার, সমাজের একাধিপত্য, আচার ও ধর্ম্মবন্ধন প্রভৃতি জাতীয় নিয়ম সকল আমাদিগকে এক কালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের সর্ব্বাঙ্গে নিগড় বন্ধন, নড়িবার চড়িবার যো নাই; যে স্বাধীনতা মানবের প্রধান সম্পত্তি ও সুখের একমাত্র হেতু সেই অমূল্য স্বাধীনতা আমাদের আদৌ নাই, কি প্রকারে আমাদের উন্নতি হইবে? ইত্যাদি ভাবিয়া আমরা জাতীয় রীতিনীতির প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়াছি এবং স্বাধীনতা ও উন্নতিজনিত সুখলাভের আশয়ে পশ্চিম ভূমির রীতিনীতি অবলম্বন করিতে ব্যগ্র হইয়াছি। আমরা একবারও নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা

করিয়া দেখি নাই, যে, পাশ্চাত্য রীতিনীতি আমাদিগকে আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রদান করিতে পারিবে কি না।

আমাদের রীতিনীতি ও আমাদের কার্য্যপ্রণালী যে নিতান্ত দূষিত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা কিরূপ দোষাশ্রিত হইয়াছে ও তাহার কিরূপ সংশোধন আবশ্যক তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাই আমরা জাতীয় রীতিনীতির সংস্কার-বিধানে যত্নবান না হইয়া পরিবর্ত্তন প্রয়াসী হইয়াছি, আমরা পাশ্চাত্য রীতিনীতি অবলম্বনে ব্যগ্র হইয়াছি। কেন? আমরা ত ভীল কুলি, কি সাঁওতালদিগের ন্যায় অসভ্য বর্ব্বর জাতি নহি যে, আমাদের কোন প্রকার জাতীয় চরিত্র নাই, তাই আমাদিগকে যে কোন সভ্যজাতির চরিত্র অবলম্বনে জাতীয় চরিত্রের গঠন করিতে হইবে। অথবা আমরা উনিশশতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী রোমরাজ্যের অধিকৃত বৃটনজাতিও নহি যে, আমাদিগকে রাজচরিত্র অবলম্বনে চরিত্র গঠন করিতে হইবে। আমরা প্রাচীনতম আর্য্যজাতির সন্তান। যে আর্য্যজাতি পৃথিবীর সকল জাতির গুরু সেই আর্য্য জাতির সন্তান। পৃথিবীর কোন্ জাতি তাহাদের তুল্য উন্নত, সভ্য ও দীর্ঘজীবী? মিসর, ফিনিসিয়া ও আসিরিয়া প্রাচীন জাতি বটে কিন্তু প্রাচীনকালেই তাঁহাদের লয় হইয়াছিল, গ্রীক ও রোম প্রভৃতি উন্নতি করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অতি অল্পদিনেই তাঁহাদের পতন হয়। ভারত কিন্তু সেরূপ নহে। কোন্ প্রাচীন কালে যে, ভারতের প্রথম উন্নতি হয় তাহা ইতিহাস অনুসন্ধান পায় না। ভারত উন্নত হওয়ার পর কত শত জাতির অভ্যুত্থান, উন্নতি ও পতন হইল কিন্তু ভারত অটল ভাবে রহিয়াছে। এখন ভারত নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বটে কিন্তু ভারতের পতন হয় নাই। এখনও ভারতের উন্নতির আশা আছে। যদি উন্নতি দেখিয়াই রীতিনীতির শ্রেষ্ঠতা স্থির করিতে হয় তবে সেই প্রাচীনতম সভ্যতম দীর্ঘজীবী হিন্দুজাতির রীতিনীতি শ্রেষ্ঠ নহে কেন?

বোধ হয় এই কারণে নবাশিক্ষিতেরা এক্ষণে প্রাচীন ভারতের রীতিনীতির নিন্দা করেন না। যত দিন তাঁহারা প্রাচীন ভারতের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই ততদিন তাঁহারা প্রাচীন ঋষিদিগকে নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য ভাবিতেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা

হইতে আরম্ভ হইয়া অবধি তাঁহাদের সে সংস্কার মন্দীভূত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের আর একটী ভ্রম হইয়াছে। তাঁহাদের সংস্কার জন্মিয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের রীতিনীতি আধুনিক রীতিনীতি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। পূর্ব্বে এদেশে জাতিভেদ-প্রথা ছিল না, অন্তঃপুর-প্রথা ছিল না, বিধবা বিবাহ নিষেধ ছিল না, বাল্যবিবাহ ছিল না, ভক্ষ্যাভক্ষের দৃঢ় নিয়ম ছিল না, গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপানও তখন নিষিদ্ধ ছিল না, স্ত্রী পুরুষের সম্মতি ভিন্ন বিবাহ হইত না, ইউরোপবাসীগণ যে যে রীতি অবলম্বনে উন্নত হইয়া আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন তৎসমস্তই তাঁহাদের ছিল। সুতরাং ইউরোপীয় রীতিনীতি সম্পন্ন হইলেই আমরা প্রাচীন উন্নত আর্য্য পিতামহগণের অবলম্বিত রীতিনীতি-সম্পন্ন হইব ও পুনরায় তাঁহাদের ন্যায় গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইব। শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে আজি কালি এই মতই সাধারণ্যে প্রচলিত। সুতরাং আমাদের পিতৃগৌরব-জ্ঞান আমাদিগকে স্বজাতিরীতিনিষ্ঠ না করিয়া অধিকতর পাশ্চাত্য রীতিনিষ্ঠই করিয়াছে। আমাদের পিতৃপুরুষগণ পাশ্চাত্যগণের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল রীতিপরায়ণ ছিলেন ইহা কি সত্য? আমাদের বোধ হয় নব্যগণের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আমাদের বোধ হয় উন্নত ভারতের রীতিনীতি কোন রূপেই পাশ্চাত্যগণের তুল্য ছিল না। প্রত্যুত উহা আধুনিক ভারতেরই অনুরূপ ছিল। তবে এক্ষণে তাহার অনেক বিকৃতি হইয়াছে।

সত্য বটে এক কালে ভারতে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য ছিল, গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হইত, মদ্য মাংস ভোজন প্রচলিত ছিল, সকল জাতির মনুষ্য একত্র ভোজন ও পরস্পর কন্যা পুত্রের বিবাহ দিত; কিন্তু সে কোন সময়? যখন এই সকল রীতিনীতি প্রচলিত ছিল তখন যে, ভারতে ইহা অপেক্ষাও শিথিল ও সম্পূর্ণ পাশবরীতি প্রচলিত ছিল। তখন ক্ষেত্রজ অর্থাৎ অন্য পুরুষের ঔরসোৎপন্ন পুত্র বিবাহিতের পুত্র বলিয়া গণ্য হইত, কি বলপূর্ব্বক কি প্রমত্তাবস্থায় কি নিদ্রিত অবস্থায় স্ত্রীতে উপগত যে কোন প্রকারে স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন হইলেই তাহা বিবাহ নামে গণ্য হইত, অধিক কি তখন যে কোন পুরুষ যে কোন নারীকে ইচ্ছা করিত তাহাকেই গ্রহণ করিতে পারিত। এই সকল পাশব আচার যে ভারতের উন্নতির সময়ে প্রচলিত ছিল না, তাহা

ভারতের প্রকৃত ইতিবৃত্ত থাকিলে অনায়াসে জানা যাইত। প্রাচীন গ্রন্থ সকলের আলোচনা করিলেও এবিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রন্থ সকলের কোন্ খানি কোন্ সময়ে রচিত তাহা ঠিক হইবার যো নাই। কিন্তু বেদ যে সর্ব্বপ্রাচীন এবং মনুসংহিতা রামায়ণ ও মহাভারত যে বেদের পরকালবর্ত্তী গ্রন্থ একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই স্বীকার করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ গুলির প্রাচীনতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থে তাৎকালিক রীতি নীতির বিষয় কিরূপ আছে জানিতে পারিলে আমাদের অভীষ্ট অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। মনুসংহিতা হইতে কএকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশং।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনোবশে ॥ ৯ অঃ ২
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ৩ ॥
কালেঽদাতা পিতা বাচ্যোবাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রস্তু বাচ্যো মাতুররক্ষিতা ॥ ৪ ॥
সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ ॥ ৫ ॥
ইমং হি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তোধর্ম্মমুত্তমং।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারোদুর্ব্বলাঅপি ॥ ৬ ॥"

অর্থাৎ পুরুষগণ স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা অস্বতন্ত্রা করিবেন, নানা প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া আপনার বশে রাখিবেন। কৌমার কালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বৃদ্ধকালে পুত্র তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, কোন সময়েই স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবেন না। অতিসূক্ষ্ম প্রসঙ্গ হইতেও স্ত্রীদিগকে রক্ষা করা উচিত, নচেৎ পিতা ও পতি উভয় কুলেই শোক উৎপাদন করে। ইহা সকল বর্ণেরই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অতি দুর্ব্বল লোকেরাও ভার্য্যা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন।

ইহা কি স্ত্রী জাতির অস্বাতন্ত্র্যের একান্ত পরিচায়ক নহে?

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ ৬৫ ॥

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মোবিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৬৬ ॥

বিবাহ মন্ত্রের কোন কথায় স্ত্রীর নিয়োগ বুঝায় না, বিবাহ বিধিরও কোন স্থানে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি নাই। এই বিগর্হিত পশুধর্ম্ম বেণ রাজার রাজ্যকালে বিহিত হইয়াছিল।

ইহা কি বিধবা বিবাহ নিষেধের স্পষ্ট বিধান নহে?

'সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণোবিদ্যাদ্বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈবতথা ভবেৎ ॥ ১০ অঃ ২
বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যাৎ নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তএব তে ॥ ৫ ॥'

ব্রাহ্মণ সকলের জীবিকার উপায় জানেন, তিনি সকলকে তাহা বলিয়া দিবেন, আপনিও নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। জন্মের উৎকর্ষ, প্রকৃতির উৎকর্ষ, নিয়ম পালন, ও সংস্কার—বিশেষ হেতু ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ, চতুর্থ এক জাতি শূদ্র। পঞ্চম বর্ণ আর নাই। অক্ষতযোনি তুল্য বর্ণের পত্নীতে জাত সন্তান সেই বর্ণেরই হইবে।

জাতিভেদ প্রথা ইহা অপেক্ষা আর কি রূপে অধিক দৃঢ়ীভূত হইবে?

মনু ৮ প্রকার বিবাহ বিধির উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পিতামাতা সৎপাত্র নির্ব্বাচন করিয়া যে বিবাহ দেন সেই বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ ও কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, অন্যরূপ বিবাহ স্পষ্টই নিষেধ করিয়াছেন যথা,—

'ব্রাহ্ম্যাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রাজায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ ॥ ৩ অঃ ৩৯
রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ ॥ ৪০ ॥

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ ॥ ৪১ ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪২
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং ॥ ৯ অঃ ৯০ ॥

পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণাদি চারি প্রকার বিবাহে বিবাহিত অর্থাৎ যে বিবাহ পিতার মতানুসারে পিতার বিবেচনায় হয় সেই বিবাহোৎপন্ন পুত্রই শিষ্টসম্মত, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, রূপগুণযুক্ত, ধনবান, যশস্বী, ভোগপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবি হয়। গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্য সকল প্রকার বিবাহোৎপন্ন পুত্র উৎকৃষ্ট হয় এবং নিকৃষ্ট বিবাহোৎপন্ন পুত্র নিকৃষ্ট হয়, এই জন্য অপকৃষ্ট বিবাহ নিষিদ্ধ। পিত্রাদি বিবাহ না দিলে কন্যা ঋতুমতী হওয়ার পরেও তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে বিবাহ করিবে।

বিবাহের বয়স সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন—

'ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥ ৯৪ ॥
উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্যথাবিধি ॥" ৮৮।

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশ বৎসরের এবং চব্বিশ বৎসরের পুরুষ অষ্ট বৎসরের মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করিবেন। উৎকৃষ্ট অভিরূপ সদৃশ বর প্রাপ্ত হইলে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেও কন্যার যথা বিধি বিবাহ দিবে।

ইহা কি পাশ্চাত্য মতের বাল্য বিবাহ নহে?

"পিতেব পালয়েৎ পুত্রান্ জ্যেষ্ঠোভ্রাতৃন যবীয়সঃ।
পুত্রবচ্চাপি বর্ত্তেরন্ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি ধর্ম্মতঃ ॥" ১০৮।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণও পুত্ররূপে জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবেন।

এই শ্লোক ও ধনবিভাগ প্রণালী পূর্ব্বকালে একান্নবর্ত্তীত্ব থাকার স্পষ্ট প্রমাণ।

মনুসংহিতার সর্ব্বত্রেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতেরও আদ্যোপান্ত ঐ সকল রীতিনীতির সম্পূর্ণ পোষক। অধিক কি প্রাচীনতম বেদেও ঐ সকল প্রথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদ সংহিতারও দশমমণ্ডলে জাতিভেদ প্রথার পোষক প্রমাণ আছে। প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি ভয়ে তৎসমস্ত প্রদর্শিত হইল না।

মহাভারত প্রভৃতিতে ঐ সকল রীতিনীতির বিপরীত প্রমাণও পাওয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই সকল গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে ঐরূপ রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। পুরাকালীন সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতির সময়ে গান্ধর্ব্ববিবাহ এবং নলরাজার সময়ে নারীজাতির পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী শ্বেতকেতু দীর্ঘতমা প্রভৃতির সময়ে ভারতে আরও অধিক শিথিল নিয়ম প্রচলিত ছিল। ঐ সকল ব্যক্তির উপাখ্যান বর্ণনকালে মহাভারতে তদানীন্তন ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বকালের সেই সকল রীতিনীতির দোষ অনুভব করিয়া পরবর্ত্তী মনীষীগণ যে তৎসমস্ত পরিবর্জ্জিত করিয়াছেন তাহা মহাভারত পাঠে জানা যায়। ইহার কএকটী উদাহরণ মহাভারতের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, আইস আমরা যাই। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্য ধর্ম্ম, গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না। ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্য মধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে।"

সম্ভবপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়।

অন্য একস্থানে আছে,—

"** দীর্ঘতমা পত্নীর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অভক্তি দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ। প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া, তাঁহাকে ভর্ত্তা এবং পতি বলিয়া থাকে, কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, তাহার কিছুই করিতে পার না, প্রত্যুত আমি তোমার ও ত্বদীয় পুত্রগণের চিরকাল ভরণ-পোষণ করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত পীড়িত হইয়াছি, অতএব অতঃপর আমি তোমাদিগের আর ভার বহন করিতে পারিব না। মহর্ষি পত্নিবাক্য শ্রবণান্তর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই অর্থ গ্রহণ কর; বলবতী অর্থস্পৃহানিবন্ধন তোমাকে ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রদ্বেষী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! দুঃখের নিদানভূত ত্বৎপ্রদত্তধনে আমার অভিলাষ নাই, তোমার যেমন অভিরুচি হয়, কর। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার ও তোমার সন্তানবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না। দীর্ঘতমা পত্নীর সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন এক মাত্র পতির অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে; পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই।" সম্ভবপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

আর একস্থানে আছে,—

"** মহানুভাব শুক্র সুরাপান-জনিত-অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অভিরূপ কচকে সুরা সহকারে উদরস্থ করিয়াছিলেন, এই বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বিপ্রগণের প্রিয় সম্পাদনার্থ কহিলেন, অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। আমি বিপ্রধর্ম্মের এই সীমা সংস্থাপন করিলাম। সম্ভবপর্ব্ব ৭ অধ্যায়।

এই সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য হউক আর না হউক অর্থাৎ শ্বেতকেতু একদিনে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিলেন, দীর্ঘতমা এক দিনে স্ত্রীজাতির পুনর্বিবাহ নিষেধ করিলেন, শুক্রাচার্য্য এক দিনে সুরাপান নিষেধ করিলেন

এ কথা সত্য না হউক ঐ সকল প্রথা প্রচলিত থাকার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া যে মনীষীগণ সে সমস্তের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বয়ম্বর প্রথারও দোষ মহাভারত ও মনুসংহিতাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যাঁহারা দ্রৌপদী, সীতা প্রভৃতির বিবাহকে স্বয়ম্বরের দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি হইয়াছে। কেননা ঐ সকল প্রকৃত পক্ষে স্বয়ম্বর নহে। ঐ সকলকে যদি স্বয়ম্বর বলিতে হয়, তবে এক্ষণে যে পিতা বলেন যিনি, বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা সর্ব্বপ্রথম হইবেন তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব, তাঁহার কন্যাকে ও স্বয়ম্বরা বলিতে হয়। জনক রাজা পণ করিয়াছিলেন যিনি হরধনু ভঙ্গ করিবেন তিনি সীতালাভ করিবেন, এবং দ্রুপদ রাজা বলিয়াছিলেন যিনি লক্ষ্যে মৎস্যবিদ্ধ করিতে পারিবেন দ্রৌপদী তাঁহারি গলে মাল্য প্রদান করিবেন। সুতরাং ইহাতে সীতা, দ্রৌপদী বা রাম, অর্জ্জুনের মতামত আদৌ গ্রহণ করা হইতেছেনা; পিতা আপনি রুচি অনুসারে পরীক্ষা করিয়া শ্রেষ্ঠ পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। ঐ পণ ধার্য্য করিবার সময় তাঁহাদের মত লওয়া হইয়াছিল এমন কোন কথা রামায়ণে বা মহাভারতে নাই। প্রত্যুতঃ পিতার মতে ধার্য্য হওয়ার বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সীতার ত অভিমতি দিবার উপযুক্ত বয়সই হয় নাই। কেননা তখন রামের বয়ক্রম ষোল বৎসর মাত্র।

ফলতঃ মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যে সময়ে ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল সে সময়ে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি ছিল না; তাহার পূর্ব্বে শকুন্তলা, দময়ন্তী, সাবিত্রী, শ্বেতকেতু, দীর্ঘতমা প্রভৃতির সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে ঐ সকল ছিল। কিন্তু এই উভয় কালের মধ্যে কোন্ সময়কে ভারতের সভ্যতার কাল বলিব? এ কথা পাশ্চাত্যগণই একরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বেদ বিশেষতঃ ঋক্‌বেদের সংহিতাভাগ ভারতের সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ভাগ বেদের পরবর্ত্তী; মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি তাহারও পরবর্ত্তী। তাঁহারা ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ঋগ্বেদের সময়ে ভারতে সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল মাত্র, সে সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি

আধুনিক নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কোন্ সময়ে ভারতের চরম উন্নতি হয় তাহা ঠিক হয় নাই বটে, কিন্তু তাহা যে বেদ ও বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালের মধ্যবর্ত্তী সে বিষয়ে তাঁহারা বড় সন্দেহ করেন না। কিন্তু দেখা যাইতেছে বেদের পর হইতেই আমাদের জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ভাগে জাতিভেদের দৃঢ়তার অনেক প্রমাণ আছে। মনু প্রভৃতির সময়ে ঐ সকল সমধিক দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহার পরবর্ত্তী সংহিতা ও অন্যান্য গ্রন্থে ঐ সকল সম্বন্ধে আরও দৃঢ় বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গ্রন্থের প্রাচীনত্বের প্রতি সন্দেহ জন্মে সে সকল ত্যাগ করিয়া, যে সকল গ্রন্থের কোনরূপ কাল নিরূপিত হইয়াছে সেই গুলি দেখিলেই আমাদের কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। সুতরাং পাশ্চাত্যগণের মতানুসারেই প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সময়ে ভারত অসভ্য ছিল, যে সময়ে সমাজ দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, যে সময়ে মানবের প্রকৃত উন্নতি হয় নাই, সেই সময়ে ঐ সকল স্বেচ্ছাচার নিয়ম সমূহ প্রচলিত ছিল; ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল, যত অসভ্য পাশব রীতি সকলের অনিষ্টকারিতা বুঝিবার শক্তি জন্মিতে লাগিল, ততই সে সকলের পরিবর্ত্তে সমাজের ও মানবের উপযোগী প্রকৃত উন্নতিকর নিয়মসকল প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে।

অদ্যাপি পৃথিবীতে যে সকল বন্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্ত জাতির মধ্যেই, প্রাচীন ভারতের ন্যায় রীতিনীতি সকল প্রচলিত আছে। ভীল, কুলি, সাঁওতাল, গারো প্রভৃতি সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যেই স্ত্রী স্বাধীনতা আছে, বিধবাবিবাহ আছে, স্বয়ম্বর প্রথা আছে, বিবাহ ভঙ্গ করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি সামাজিক দৃঢ়তা তাহাদের এক কালে নাই অথবা নিতান্ত অল্প পরিমাণে আছে। এই সকল জাতি যদি কালে সভ্য হয় তবে তাহারা যত সভ্য হইবে ততই তাহাদের ঐ সকল শ্লথ নিয়মের পরিবর্ত্তে সামাজিক দৃঢ়তা সংস্থাপক নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ হইবে। যে ইউরোপীয়গণের দৃষ্টান্তে আজি আমরা সমাজভঙ্গ করিতে বসিয়াছি, তাঁহাদের জাতীয় জীবন আলোচনা

করিলেও ইহা বিলক্ষণ রূপে বুঝা যায়। ১৯ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রিটন জাতির রীতিনীতি কি নিতান্ত শিথিল ও আধুনিক বন্যদিগের ন্যায় ছিল না? কিন্তু এখন সেই ব্রিটনের জাতিগত চরিত্রের কত উৎকর্ষ হইয়াছে। কালে যে আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু রীতিনীতি অভিমুখী হইবে তাহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জাতি ফ্রান্সের সহিত উহাদের রীতিনীতির তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ফ্রান্সের রীতি নীতি যে অনেক পরিমাণে ভারতীয় রীতিনীতির অভিমুখী তাহা দেখাইবার জন্য ফরাশি গ্রন্থকার কৃত Jhon Bull and his Island * নামক গ্রন্থের বাঙ্গালানুবাদ হইতে কএকটী স্থান উদ্ধৃত হইল।

"ইংলণ্ডে পঞ্চদশ বৎসরের বালিকা একাকী ভ্রমণ করে। বালিকারা স্কট্‌ল্যাণ্ডের উত্তর প্রদেশ হইতে লণ্ডনের স্কুলে একাকী পড়িতে আইসে। ফরাশী-দেশে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা নবীনারা বাটীর সম্মুখের দোকানেও চাকরাণী না লইয়া এক জোড়া দস্তানা পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে যায় না। * * * ইংরেজী আচার ব্যবহার অনুসারে অঙ্গীকারবদ্ধ বরকন্যা পরস্পরের প্রতি এত স্বাধীনতা লইতে পারে যে উভয়ের সম্মতি ব্যতীত কেহ আইনানুসারে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারে না। ভাবী বর, কন্যা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে কন্যা ডামেজ বা মান হানির নালিশ করিতে পারে। ফরাশী সমাজের স্বতন্ত্র নিয়ম। বিবাহের কথা স্থির হইয়া যদি বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ফরাশী-কন্যার কোন ক্ষতি নাই, কারণ বর কন্যা কখন নিভৃতে সাক্ষাৎ করে নাই। * * * ইংল্যাণ্ডে অবিশ্বাসী স্ত্রীর স্বামী ঘৃণার পাত্র নহে। কুচরিত্রা প্রমাণ করিলেই স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক ঘুচিল। স্ত্রীর গুপ্ত প্রণয়ী ধরা পড়িলেও স্বামী তাহার সহিত মল্ল যুদ্ধে নিযুক্ত হয় না, ইংরেজ-স্বামসীতে সে

* কাহারও কাহারও মত উক্ত ফরাশী গ্রন্থকার উল্লিখিত পুস্তকখানি কতকটা বিদ্বেষবশতঃ এবং কতকটা রহস্যচ্ছলে লিখিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য পুস্তক হইতেও আমরা ইংরাজদের রীতিনীতির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে রহস্য বলিয়া অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই। এবং যিনি ঐ পুস্তকে ইংলণ্ডের উৎকৃষ্ট রীতিনীতি কয়টির শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন, তিনি যে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ইহা আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

কবিত্ব টুকু নাই, ইংরেজ-স্বামী ফরাশী স্বামীর ন্যায় ততদূর নির্ব্বোধ নহে।"

আর একটী বিষয় আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক। দেখা যাইতেছে যে, যে সকল রীতিনীতির জন্য হিন্দুসমাজ দূষিত হইতেছে, অতি অসভ্যেরাও সে দোষে দোষী নহে। কি অসভ্য কি সভ্য সকল জাতির রীতিনীতির সহিত হিন্দুর রীতিনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; একা হিন্দুই একঘরে। কেবল হিন্দুরই স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য নাই, কেবল হিন্দুরই বিধবাগণের বিবাহ হয় না, কেবল হিন্দুর মধ্যেই জাতিভেদ প্রথার প্রবলতা, কেবল হিন্দুই চিরবিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, কেবল হিন্দুই ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার করে, কেবল হিন্দুই নানা প্রকার আচারপরতন্ত্র হয়। আর কেহ অর্থাৎ ভীল কুলী হইতে ইংরাজ ফরাশি পর্য্যন্ত কোন জাতিই ঐ সকল নিয়ম পালনে বাধ্য নহে। কেন? হিন্দু কি পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট? পৃথিবীর সর্ব্ব প্রাচীন সভ্য জাতি কি ভীল কুলীদিগের অপেক্ষাও নীচ? জানি না কোন্ অকাট্য যুক্তি ইহার প্রবল পোষক। জানি না কোন্ সুদৃঢ় যুক্তির বলে স্থির হইয়াছে যে, যে পাশ্চাত্য রীতিনীতি নিতান্ত অসভ্যদিগের সহিত তুলনীয় তাহা শ্রেষ্ঠ এবং যে হিন্দু রীতিনীতি অসভ্যদিগের বিরুদ্ধ তাহা অপকৃষ্ট। আমরা কি এতই অসার হইয়াছি, যে, বিচার না করিয়া অসভ্য জাতির বিরুদ্ধ প্রাচীন সভ্যহিন্দুর নীতি অপেক্ষা অসভ্য জাতির সমজাতীয় নবীন সভ্য ইংলণ্ডীয়দিগের রীতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তদবলম্বনে ব্যগ্র হইব? না, নব্য শিক্ষিতেরা তাহা করেন না; তাঁহারা বিচার না করিয়া স্বদেশীয় রীতিনীতিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের বিচারের মূল ভিত্তি নিতান্ত অসার। মূল স্বতঃসিদ্ধ (Axiom) ভুল হইলে যে তদবলম্বন-প্রতিপন্ন সিদ্ধান্ত ভুল হইবে তাহাতে আর কথা কি? নব্য শিক্ষিতগণের মূল স্বতঃসিদ্ধ (Axiom) সাম্য ও স্বাধীনতা। ঐ মূলের উপরেই তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি স্থাপিত। কিন্তু সাম্য ও স্বাধীনতা কাহাকে বলে? তাঁহারা যাঁহাদিগের নিকট এই সত্য শিক্ষা করিতেছেন তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সাম্য ও স্বাধীনতাসম্পন্ন কি না তাহাও তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। ইংলণ্ডীয়গণের আচরণ দেখিলে কি তাঁহাদিগকে সাম্য ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী বলা যায়? কখনই

না। প্রত্যুত আমাদের বোধ হয়, তাঁহারা সম্পূর্ণ শক্তি-বাদের ও বৈষম্য-বাদেরই পরতন্ত্র। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ নীচের এত প্রভেদ যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইংলণ্ডের নিম্ন শ্রেণীর সহিত উচ্চশ্রেণীর প্রভেদের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, Survival of the fittest বাক্যই তাঁহাদের মহামন্ত্র। স্বাধীনতাও তাঁহাদের ঐরূপ। তথায় কাহারও এমত সাধ্য নাই, যে, কেহ সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনিয়মের কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথাচরণ করেন। সামান্য শ্যালিকা-বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিবারও সাধ্য এপর্য্যন্ত কাহারও হইল না। ইচ্ছানুসারে বিধর্ম্ম গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইবারই সাধ্য কাহারও নাই। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপণ রোমান কাথলিক বলিয়া তাঁহার ভারতে নিয়োগের পক্ষেই কত বাধা ঘটিয়াছিল। আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে, তথায় তাহা নহে; তথায় জয়েণ্টষ্টক কোম্পানিই অধিক। বহুলোকের অর্থ একত্রিত করিয়া বৃহৎ কার্য্য করা, তথাকার রীতি। বৃহৎ কার্য্য করিতে হইলে বহুতর বেতনভোগী লোকের প্রয়োজন হয়। যন্ত্র সৃষ্ট হইয়া তথায় আরও দাস সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় স্বাধীন ভাবে তন্তুবয়ন করিত, এক্ষণে তাহাদের স্থানে ৫।৭ টী কোম্পানি সহস্র সহস্র বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। রেলওয়ে কোম্পানি, ষ্টিমার কোম্পানি, মিল কোম্পানি প্রভৃতিও এইরূপ দেশে দাসত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কোন ব্যক্তিই আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধপাত্রে কন্যার বিবাহ দেন না। কোন উচ্চবংশীয় লোক কোন নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত একত্র ভোজন ও পুত্র কন্যার বিবাহ দেন না। তবে তথায় নিম্নশ্রেণীর লোক উন্নত হইলে কালে উচ্চশ্রেণীর সহিত মিশিতে পারে বটে কিন্তু তাহাও নিতান্ত সহজ নহে। অন্তঃপুর প্রথার দৃঢ়তা না থাকিলেও তথায় স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য নাই, প্রত্যুত তথায় স্ত্রীজাতি অত্যন্ত নিগৃহীত হয়। John Bull and his Island গ্রন্থের এক স্থানে আছে—

"* * * লণ্ডনের গাড়োয়ান অশ্বের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করে, স্বীয় স্ত্রীর প্রতি যদি সেইরূপ সদাচার করিত তাহা হইলে আমি তাহাদের সহৃদয়তা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার সহৃদয়তা তুরক দেশীয় লোকের কুকুর প্রিয়তার ন্যায়।" * * * "বিবাহিতা নারী সমাজে বাজে লোকের মধ্যে পরিগণিত। চুয়াড়দের মধ্যে স্বামী পাঁচ টাকা, পাঁচসিকা বা এক গ্লাস বিয়ারের জন্য স্ত্রীকে বন্ধক দিয়া থাকে। প্রতিদিন পুলিসের রিপোর্টে স্ত্রীজাতির প্রতি ভয়ানক অত্যাচারসংক্রান্ত যথেষ্ট মকর্দ্দামা দেখা যায়।"

যতদূর আলোচনা করা গেল তাহাতে বুঝা গেল, যে অসভ্যদিগের রীতি, পাশ্চাত্যগণের রীতি ও হিন্দুরীতি পরপর হয় উন্নত না হয় অবনত। পাশ্চাত্য রীতি উভয়ের মধ্যগত অর্থাৎ অসভ্য রীতি একান্ত শিথিল ও ভারতীয় রীতি দৃঢ়রূপে নিয়মাবদ্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য রীতি না একবারে শিথিল না দৃঢ়রূপ নিয়মবদ্ধ। তাঁহাদের কোন রীতি নিতান্ত শিথিল, কোনটী বা অপেক্ষাকৃত নিয়মবদ্ধ ও কোনটী অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ। নিতান্ত অসভ্যদিগের আদৌ কোন প্রকার নিয়ম নাই, তাহাদের সমস্ত আচরণই পশুদিগের তুল্য শিথিল। ইংলণ্ডীয়গণের খাদ্যাখাদ্যের নিয়ম নিতান্ত শিথিল অর্থাৎ যে পদার্থ মুখরোচক ও পুষ্টিকর তাহাই তাঁহাদের খাদ্য। জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতি নিয়মবদ্ধ বটে কিন্তু তাহাতে অনেক শিথিলতা আছে ; কিন্তু তাঁহাদের আর্থিক ব্যাপারের নিয়মসকল অত্যন্ত দৃঢ়। সে সকল নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যভিচারে ভয়ানক দোষ। যে সময়ে যে কার্য্য করিবার কি কাহারও সহিত দেখা করিবার জন্য স্থির হয় তাহার এক মিনিটও অগ্র পশ্চাৎ হইবে না ; নিয়মিত কালের এক-দিন অতিক্রান্ত হইলে কাহারও অভিযোগ শুনা যাইবে না, কাহারও বিষয় বিক্রয় বন্ধ হইবে না ; একটা কথার কোনরূপ দোষ বাহির হইলে বড় বড় দলিল বড় বড় উইল অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে ; মূর্খ বলিয়া - আইন জানি না বলিয়া কেহ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায় না ; কেহ স্বত্বরক্ষা করিবার সহায়তা পায় না ; রোগী বাঁচুক আর মরুক ডাক্তারের সম্পূর্ণ ফি দিতে হইবে, মকর্দ্দামা হার আর জেত উকীলের সম্পূর্ণ ফি দিতে হইবে। বিষয়-ঘটিত নিয়ম তাঁহাদের এমনই দৃঢ় যে তাহার অপালনের প্রায়শ্চিত্তও নাই। হিন্দুর সমস্ত বিষয়ই নিয়মাধীন ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন কিন্তু তীব্র নহে। স্বাভাবিক

নিয়মই এই যে যে জাতি যত অসভ্য সে জাতি তত বিশৃঙ্খল, যে জাতি যত সভ্য সে জাতি তত সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন। তাই হিন্দুর সকল বিষয়ে এত বাঁধা-বাঁধি—ইংরাজগণের আর্থিক ব্যাপারের ন্যায় বাঁধাবাঁধি। ঐ সকল প্রকৃত স্বাধীনতার বিরোধী নহে। কেন না পাশ্চাত্যগণ যে সাম্য ও স্বাধীনতার প্রচার করিতেছেন তাহা স্বাধীনতা নামেরই যোগ্য নহে। উহা আপাত-সুখকর বটে কিন্তু ভয়ানক পরিণাম-বিরস।

আপন ইচ্ছা অনুসারে বিচরণ করিতে পারার নাম স্বাধীনতা। আপন ইচ্ছা বলিলে নির্দ্দিষ্ট কোন-এক বা কয়েক প্রকার মাত্র ইচ্ছা বুঝায় না। কেন না আমরা যে সকল ইচ্ছা করি তৎসমস্ত আমাদের ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিগণের মতানুসারে করিয়া থাকি। যখন যে ইন্দ্রিয়, যে বৃত্তি উদ্রিক্ত হয় তখন তাহারই প্ররোচনা অনুসারে ইচ্ছা জন্মে। আমাদের অনেক বৃত্তি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং যখন আমরা উদ্রিক্ত বৃত্তিবিশেষের প্ররোচনা অনুসারে কার্য্য করি তখন তাহার বিপরীত বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে হয় ত সেই বিপরীত বৃত্তি উদ্রিক্ত হইয়া তদ্বিপরীত কার্য্য করিতে বলে ও পূর্ব্বকৃত কার্য্য করা হেতু অনুতাপ আনয়ন করে। সুতরাং ইচ্ছামাত্রের পরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করাতে সুখ হয় না; উহাকে প্রকৃত স্বাধীনতাও বলে না প্রত্যুত উহা সম্পূর্ণ অধীনতা। যে বৃত্তি যাহা বলিল তাহাই যদি আমরা করিলাম, তবে তাহাতে আমাদের কর্ত্তৃত্ব থাকিল কৈ? তাহার নাম যদি স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্য হইল তবে মানবের সত্তা কোথায়? মানবের বুদ্ধিরই বা প্রয়োজন কি? এবং বুদ্ধিই মানবের শ্রেষ্ঠতার হেতু কেন? যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত স্বাধীন। সুতরাং সমস্ত বৃত্তির উপর বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্থাপনই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়। সংযমই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়। ঐ সংযম শিক্ষা করিবার জন্য ভারতবাসী পিতামাতার অধীন, গুরুর অধীন, ভ্রাতার অধীন, সমাজের অধীন ও শাস্ত্রের অধীন হয়। শিশু যেমন অভাব জনিত দুঃখ নিবারণ ও ভাবী উন্নতি সাধন করিবার জন্য পিতামাতা প্রভৃতির সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করে, মানবগণও সেইরূপ রিপুর অধীনত্ব দূর করিয়া স্বাধীন হইবার শক্তিলাভ করিবার জন্য শাস্ত্র ও গুরু প্রভৃতির অধীন হয়।

সকলের বুদ্ধি ও সামঞ্জস্য করিবার শক্তি সমান নহে, এইজন্য বুদ্ধিমানগণের নিদেশবর্ত্তী হওয়া মানবের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান, মানব-প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ও মানব মহত্ত্বের প্রকৃত পরিচয়জ্ঞ তাঁহারা বুদ্ধি সামঞ্জস্যের যে উপায় নির্দ্ধারণ করেন তদনুসারে চলিলে সকলেই নিয়মিত হইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের মতানুসারে চলাকে অধীনতা বলে না। যদি উহাকে অধীনতা বলিতে হয় তবে ইন্দ্রিয় সংযমকারী স্বীয় বুদ্ধির অধীনতা-কেও অধীনতা বলিতে হইবে। ভারতীয় সমস্ত রীতিনীতিই মানবকে নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং তৎসমস্ত স্বাধীনতার বিরোধী নহে। ইংরাজ প্রভৃতিরা বিবাহ করেন, রিপু চরিতার্থ প্রভৃতি স্বার্থ সাধনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। যিনি বিবাহের বড় পবিত্র ভাব বর্ণন করেন তিনি প্রণয়ের দোহাই দেন; উহা অপেক্ষা পবিত্র ভাব আর তাঁহারা জানেন না। কিন্তু যে প্রণয়কে তাঁহারা অতি পবিত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের রুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যিনি অত্যন্ত প্রণয়াস্পদ তিনিও মনের মত কার্য্য না করিলে প্রণয়াস্পদ থাকেন না। তাই ইউরোপে পতিপত্নী নির্ব্বাচনের এত ধুমধাম, Divorce প্রথার এত বাড়া-বাড়ী। ঐরূপ ভোগ-সুখ-লালসা এবং ইন্দ্রিয় ও রিপুর তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য তাঁহাদের উপার্জ্জন; যিনি যেমন উপার্জ্জন করিবেন, তিনি সেইরূপ সুখী হইবেন, সেইরূপ মনোমোহন ভোগ্য আহরণ করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ চরি-তার্থ করিবেন; যিনি তাহা পারিবেন না তাঁহার অদৃষ্টে কোন সুখই নাই, তাই তথায় স্বাধীনতালাভের এত চেষ্টা এবং আর্থিক বিধানের এত বাঁধা-বাঁধি। তাই ইংরাজ উপার্জ্জনের নানা পথ বাহির করিয়াছেন, নানা প্রকার প্রবঞ্চনা, অদ্ভুত রকমের বিজ্ঞাপন ও অকর্ম্মণ্য চাকচিক্যশালী পদার্থ প্রস্তুত প্রভৃতি দ্বারা নিয়ত পরের অর্থ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। কন্যা পুত্রের সহিতও তাঁহাদের ধনগত অসৌজন্য। John Bull and his Island গ্রন্থকার বলিতেছেনঃ—

"আমার এক সাহিত্যানুরাগী স্কচ্ বন্ধু প্রতিবৎসর এক মাস করিয়া বাটিতে গিয়া থাকেন। তাঁহার পিতা একজন খ্যাতনামা প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী উপাচার্য্য। আমার বন্ধু যে দিন বাটী হইতে বিদায় লইয়া আই-

সেন, সেই দিন প্রাতে বালভোগের সময় পুত্রের নিকট এক খানি পাট্ পিট করা কাগজ পান তিনি পিতৃগৃহে যে সকল দ্রব্যাদি আহার করিয়াছেন, এই কাগজ ত াহারই ফর্দ্দ।” যেমন বাপ তেম্নি বেটা—দফায় দফায় হিসাব না মিলাইয়া ঠৈক্‌টি না দেখিয়া উপুর হস্ত করেন না।

“ইংল্যাণ্ডে বিবাহের পর কন্যা পিতার গৃহে অতিথি মাত্র। পিতা মাতা তাহাকে দেখিলে বড় সুখী হন, কিন্তু পরিবারের অন্তরস্তরে তাহার আর প্রবেশাধিকার থাকে না। অপরাপর অতিথির ন্যায় কন্যারও ভিজিটের হিসাব থাকে।”

আর্য্য ঋষিগণের অমূল্য বিধান গুণে হিন্দু উক্তরূপ পশু প্রকৃতি হইতে পারেন নাই। তাই হিন্দু স্বার্থপরতার অবতার নহেন। তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন তাহা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, দৌহিত্র প্রভৃতি পরিবার ও স্বজনবর্গের প্রতিপালন, অতিথিসেবা, দরিদ্রদিগকে দান প্রভৃতি নিঃস্বার্থ সমাজহিতকর কার্য্যে ব্যয় করেন। অতি ধনবান ব্যক্তিও আপন সুখের জন্য অধিক ব্যয় করিতে পারেন না। সামান্য পরিচ্ছদ, সামান্য গৃহোপকরণ ও সামান্য ভোজনেই তুষ্ট থাকেন। এই জন্য ভারতের নিম্নশ্রেণীয়গণ উচ্চশ্রেণীর প্রতি হিংসাপরায়ণ না হইয়া ভক্তিই করিয়া থাকে; কেহই উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয় না। হিন্দু-সন্তান শৈশবকাল হইতে সংযম শিক্ষা করেন। জ্ঞানবান পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু প্রভৃতির আজ্ঞাবহ হইয়া শিক্ষা ও সংযম করিতে থাকেন; যে বৃত্তি উদ্রিক্ত হয় তাহা চরিতার্থ করিতে পারেন না। যত দিন বৃদ্ধির পরিপক্কতা না জন্মে ও তজ্জন্য স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বৃত্তি সামঞ্জস্য করিতে অসমর্থ থাকেন, ততদিন গুরুজনের উপদেশ অনুসারে বৃত্তি সামঞ্জস্য করেন। গুরু বাক্য শিরোধার্য্য এই জ্ঞান থাকায় যে বৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিলে গুরুবাক্য অন্যথা করিতে হয়, তাহা করিতে পরাঙ্মুখ থাকেন। বাল্যকাল হইতে এইরূপে সংযম হইতে অভ্যস্ত হইয়া অনেকেই সচ্চরিত্র হয়েন। ঐ সঙ্গে সাধুগণের প্রদর্শিত আচারসম্পন্ন হইয়া হিন্দু আরও সংযমী হন। প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্য ভোজন করিতে পারিবে না, গুরুজনকে সম্মান করিতে হইবে, অতিথিকে অন্ন ও ভিক্ষুককে

ভিক্ষা দিতে হইবে, যথাসময়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হইবে, তিথি বিশেষে উপবাস বা অল্প ভোজন করিতে হইবে, ইত্যাদি আচারপরায়ণ হইয়া হিন্দু উত্তমরূপে সংযত হন। ক্ষুধা, নিদ্রা, লোভ, কাম, অহঙ্কার প্রভৃতি পাশব বৃত্তি সকল দমিত এবং বিনয় ধৈর্য্য, দয়া, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তি সকল উত্তেজিত হইতে থাকে।

বিবাহ ব্যাপারেও হিন্দুর ইন্দ্রিয় ও রিপু পরিচালিত হয় না। তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যগণের ন্যায় রমণী-নির্ব্বাচন করিবার জন্য যুবতীগণের রূপ লাবণ্য পরীক্ষা করিতে গিয়া মোহিত হইতে হয় না। হিন্দুর বিবাহ অতি পবিত্র; কোন প্রকার অপবিত্রতা, কোন প্রকার ইন্দ্রিয় ও রিপু পরিচালন, কোন প্রকার পশুভাব তাহাতে নাই। প্রত্যুত: উহা একটী যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বিশেষ বলিয়া অনুভূত হয়। পিতা মাতা অনুরূপ কন্যা বা পাত্র স্থির করিয়া এমন ভাবে পুত্র কন্যার বিবাহ দেন, যে, তাহারা বুঝিতে পারে যে পশু-বৃত্তি চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। বিবাহ দিনে বর ও কন্যা উভয়েই অতি পবিত্র ভাবে অবস্থিতি করেন, পিতৃপিতামহ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহাদের পবিত্র নাম স্মরণ করেন, অভীষ্ট দেব দেবীর পূজা করেন, পূর্ব্ব দিন হইতে সংযত থাকিয়া বিবাহ দিনে উপবাস করিয়া ইন্দ্রিয় ও রিপুর দমন করেন, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে ভোজন প্রদান, দরিদ্রদিগকে অর্থ দান, নানা প্রকার হিতকর কার্য্যের সহায়তা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে সুন্দর বেশ ধারণ করিয়া নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম সহকারে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। যেন একটী মহোৎসব—যেন অতি পবিত্র ধর্ম্ম কার্য্য। সেই দিন হইতে নব-দম্পতী মিলিত হইয়া একীভূত হয়েন সেই দিন হইতে তাঁহারা পরস্পর অকাট্য সম্বন্ধযুক্ত মনে করেন। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি যেরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট দম্পতী-সম্বন্ধ তাহা হইতে কিছুতেই কম বোধ হয় না। গো, অশ্ব, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি যেরূপ রুচি অনুসারে পছন্দ করিয়া লইতে হয়, বিষয় ক্রয় কালে বা সামান্য বৈষয়িক কার্য্য করিবার সময়ে যে রূপ চুক্তিপত্র রেজিষ্টরি করিতে হয় হিন্দুর কাছে পতি পত্নীর সম্বন্ধ সেরূপ নয়। যাহার সহিত বিবাহ হইল তিনি ভালই হউন আর মন্দই হউন তাহা না

দেখিয়া পরস্পর প্রীতি স্থাপন করিতে হইবে। এই জন্য ইন্দ্রিয় প্রবল যুবক যুবতীর প্রতি দয়িত নির্ব্বাচনের ভার না দিয়া জ্ঞানবান্ সর্ব্বদর্শী পিতার উপরেই অর্পিত হইয়াছে। যুবক যুবতীর নির্ব্বাচন অপেক্ষা তাঁহাদের নির্ব্বাচন সমধিক উপযোগী ও হয়। বিশেষতঃ কন্যাকে স্বামী ও শ্বশুর কুলের সম্পূর্ণ অনুরাগিণী করিবার জন্য কোন সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইবার পূর্ব্বে অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ হয় বটে, কিন্তু বিবাহের পর অধিক দিন শ্বশুরালয়ে থাকিতে পায় না। সন্তান জননের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহেই অধিকাংশ সময় অবস্থিতি করে। ইউরোপীয়গণের ন্যায় বিবাহের পর হইতেই স্ত্রীপুরুষ একত্রিত থাকে না।

যাঁহারা অন্তঃপুরকে অবরোধ বলেন, তাঁহারা দেশের কিঞ্চিন্মাত্র অবস্থাও পরিজ্ঞাত নহেন। নগরবাসিনী রমণীগণকে কিয়ৎ পরিমাণে অবরুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতে হয় বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পল্লীগ্রাম-বাসিনীরা স্বতন্ত্র আবাসে অবস্থিতি করেন বটে কিন্তু তাঁহারা কোন মতে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা আবশ্যক মত পল্লীস্থ সকল স্ত্রী সমাজেই গমনাগমন করিতে পারেন। তবে তাঁহারা কোন পুরুষ-সমাজে যাইতে পারেন না। অন্তঃপুর-প্রথার প্রধান উদ্দেশ্যই স্ত্রীপুরুষ মিশ্রণ নিবারণ করা। ইচ্ছামত স্ত্রী পুরুষ সকল কার্য্য করিলে, স্ত্রীপুরুষ-মিশ্রণ নিবারিত হয় না, স্ত্রীগণ পুরুষের ন্যায় সকল কার্য্য করিতেও পারে না, তাই পুরুষগণ একবিধ কার্য্য ও স্ত্রীগণ অন্যবিধ কার্য্য করেন। যে সকল কার্য্য অধিক শ্রমসাধ্য তৎসমস্ত পুরুষগণের প্রতি ও যে সকল কার্য্য স্ত্রীজাতির কোমলতা প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের উপযোগী সেই সকল স্ত্রীগণের প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হাট, ঘাট, মাঠ, বাজার, রাস্তা সর্ব্বত্রই পুরুষের কার্য্য-স্থান, এই জন্য স্ত্রীগণের পক্ষে সেই সকল স্থানে গমনাগমন নিষিদ্ধ; বন্দী বলিয়া নিষিদ্ধ নহে। পুরুষ বাহিরের কার্য্য ও স্ত্রী গৃহের কার্য্য করায় সকল প্রকার কার্য্যেরই সুশৃঙ্খলা হয়। পুরুষেরা বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া যে সময় নিতান্ত দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া ম্রিয়মাণ হয়, সে সময়ে স্ত্রীর সামান্য যুক্তি ও সান্ত্বনা বাক্য তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে। যদি পুরুষের ন্যায় স্ত্রীও বাহিরের যন্ত্রণায় অস্থির হইত, তাহা হইলে মানবের দুঃখের পরিসীমা

থাকিত না। অন্তঃপুর-প্রথা না থাকিলে মানবের গার্হস্থ্যই হইতে পারে না। এই সকল কারণে ও যে কারণে অর্থাৎ যে ব্যভিচার নিবারণ জন্য অশ্লীল বাক্যাদির কথন ও উলঙ্গ থাকা নিষেধ আবশ্যক হইয়াছে, সেই কারণে স্ত্রী-পুরুষ-মিশ্রণ নিষেধ ও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছে। অন্তঃপুর মধ্যে রমণী বন্দিনী নহেন, তিনি গৃহকর্ত্রী—কর্তার কর্ত্রী বা সমগ্র গৃহস্থের দেবীরূপে অধিষ্ঠিতা। হিন্দুর সংসাররূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কেবল সেই দেবীরই অনুগ্রহে পালিত হয়। পাশ্চাত্যগণ বলেন একথা হিন্দুর মৌখিক মাত্র, কার্য্যে হিন্দুমহিলা দাসী। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতির ব্যভিচারে অধিক দোষ ও বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ এই দুইটী দৃষ্টান্ত তাঁহাদের কথার প্রধান পোষক। এক বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যভিচার সমান দোষাবহ বটে অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-ভঙ্গ দোষ ও চরিত্র-গত দোষ উভয়েরই একরূপ বটে, কিন্তু স্ত্রী জাতির ব্যভিচারে যে একটী ভয়ানক দোষ আছে পুরুষের ব্যভিচারে সে দোষ নাই। স্ত্রী জাতি গর্ভধারণ করে, সুতরাং তাহার ব্যভিচারে জারজ সন্তান জন্মে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে স্বামীকে ঐ স্ত্রীর ব্যভিচারোৎপন্ন জারজ সন্তান পালন করিতে হয়, কিন্তু পুরুষের ব্যভিচার নিবন্ধন স্ত্রীকে সেরূপ কোন অন্যায় ভারগ্রস্ত হইতে হয় না। এই জন্য পুরুষের ব্যভিচার অপেক্ষা স্ত্রীর ব্যভিচার অধিক দোষাবহ। মনু বলিতেছেন।—

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন হি রক্ষতি॥ ৭॥
পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥ ৮॥
যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥ ৯॥

জায়া রক্ষা করিলে স্বভাব, চরিত্র, কুল, ধর্ম্ম ও আত্মার রক্ষা সম্পাদিত হয়। পতি জায়াতে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই জন্য স্ত্রীর নাম জায়া। স্ত্রী যেরূপ পুরুষ ভজনা করে সেই রূপ সন্তান প্রসব করে। অতএব পুত্রের বিশুদ্ধি জন্য যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীকে রক্ষা করিবে।

এই সকল কারণে সমাজ স্ত্রীর প্রতি অধিকতর কঠিন হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উভয়ের পক্ষে সমান। শাস্ত্রকারগণ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ব্যভিচারে সমান পাপ বলিয়াছেন। সুতরাং উহা বৈষম্য বিধায়ক নহে। বিধবা-বিবাহ নিষেধেরও ঐরূপ অনেক বিশিষ্ট কারণ আছে। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইতেছে, উহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কোন উপকারও দর্শিবে না, সুতরাং ঐ বিষয়ের আলোচনায় কাজ নাই।

উপার্জ্জন কার্য্যেও হিন্দুর অন্যায় পথে চলিবার যো নাই। ইচ্ছা করিলেই কেহ জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না। হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা সমূহ কল্যাণ-কর। উহা যেমন আত্মাকে সংযত করে সেইরূপ সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উন্নত করে। ইহা দ্বারা সকল মনুষ্যের অভাব পুরিত হয় ও সমাজের সকল প্রকার কার্য্যেরই উন্নতি হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা সকল কার্য্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক কোন দুই প্রকার কার্য্যের সম্যক্ উন্নতি হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অবস্থা, শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য অবলম্বন করিয়া বাল্যকাল হইতে নিবিষ্টচিত্তে সম্পন্ন করে, তাহা হইলে সমস্ত কার্য্যেরই যথোচিত উন্নতি হয়। আবার ঐ অবলম্বিত কার্য্য যদি বংশানুক্রমিক হয় তাহাতে আরও সুবিধা। পুত্রে পিতৃপটুতা সংক্রামিত হয়, অতি শৈশব কাল হইতে পিতার নিকট কার্য্য শিক্ষা করিয়া ও তাঁহার চেষ্টিত সকল অবগত হইয়া সহজে সুশিক্ষিত হইতে পারা যায়; কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিলে অধিকতর সুখী হইব তাহা ভাবিতে ভাবিতে বৃথা সময় নাশ, দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অনধিকারচর্চ্চা বা বৃত্তি-নির্ব্বাচন দোষে কষ্ট পাইতেছি ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ অবলম্বিত বৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতে বা অনুতাপান্বিত হইয়া কাহাকেও দুঃখ পাইতে হয় না। অপিচ পিত্র্যবলম্বিত কার্য্য জন্মাবধি কালের প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের অনুকূল হওয়ায় সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে দৃঢ়তার সহিত তৎসম্পাদনে প্রবৃত্ত থাকে। সুতরাং সকলেরই কার্য্যে বিলক্ষণ পটুতা জন্মে। সকল প্রকার কার্য্যই যদি ঐরূপ বিভাগানুসারে সম্পন্ন হয়, যদি সমগ্র মানবকুলের বুদ্ধি, উদ্যম প্রভৃতি বিদ্যা-শিক্ষা বা তথাবিধ কোন এক প্রকার কার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া সকল প্রকার কার্য্যের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় তাহা হইলে সকল

কার্য্যেরই যথাযথ উন্নতি হইয়া সমাজ পূর্ণাবয়ব হয়। প্রতিযোগীতা স্বজাতি মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তীব্রত্ব দোষশূন্য হইয়া সুন্দর ফল-প্রসূ হয়। সমগ্র দেশীয় লোকের সহিত বিলক্ষণ সহৃদয়তা থাকে। এই নিয়ম অনুসারে চলায় কেহ কাহারও জীবিকা হরণ করিতে পারে না; কাহাকেও চিরকাল দুরাকাঙ্ক্ষা বা কেবল মাত্র উপার্জ্জন করিবার চিন্তা করিতে করিতে সমুদায় জীবন পর্য্যবসিত করিতে হয় না। সকলেই মানবীয় অন্য বৃত্তি সকল চরিতার্থ করিবার সময় পায় ও মানব নাম সার্থক করিতে পারে। ভারতে যে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরও অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে, সকলেই যে কিয়ৎ পরিমাণেও নীতি পরায়ণ এবং ত্যাগ-শীল এই জাতি ভেদ প্রথাই তাহার প্রধান কারণ। ঐ জন্যই ভারতবর্ষে সর্ব্ব-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম ধর্ম্মের এত চর্চ্চা। ইহার কল্যাণে এক সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের ও সমাজের সুখ, ধর্ম্ম ও উন্নতিলাভ হয়, সুখের সহিত ধর্ম্মের ও ব্যক্তি বিশেষের (Individual) সহিত সমাজের বিরোধ হয় না। সুতরাং জাতিভেদ-প্রথা অতি কল্যাণ কর। ইহা বৈষম্য-বিধায়ক নহে, প্রত্যুতঃ যথা সম্ভব সাম্যেরই কারণ। কেন না, উচ্চ শ্রেণীদের যে অবস্থার অভাবে কষ্ট হয়, নিম্ন শ্রেণীদের তাহা হয় না। অভ্যাসই বলবান্। যাহার যেমন অবস্থা তাহার তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষা।

সুতরাং যাহার যেরূপ অভাব ও আবশ্যক তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবস্থা করার নামই সাম্য। মনু মানবের অবস্থানুসারে দণ্ডবিধান ও কর্ত্তব্য বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন তবে কি নিম্নশ্রেণী মানবের উন্নতি হইবে না? তাঁহাদের এ কথার উত্তর অল্প কথায় হইতে পারে না। তাঁহাদিগকে আমাদের কেবল ইহাই জিজ্ঞাস্য, যে, ঈশ্বর কি নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য পৃথিবী হইতে উঠাইয়া দিবেন না? উন্নত শ্রেণীর অবনতি নিবারণের কি কোনও উপায় হইবে না?

হিন্দু এইরূপে সকল বিষয়ের সুনিয়ম স্থাপন করিয়া আপন আপন সুখ ও দেশের উন্নতি সাধন করিতেছিলেন। ভারত সমাজ একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ যন্ত্রের ন্যায় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ একমনা হইয়া বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিতেছিল, ক্ষত্রিয় রাজ্য বিস্তার ও প্রজা পালন

করিতে ছিল, স্ত্রী গৃহকার্য্য ও পুত্র কন্যাদির লালন পালন করিতেছিল, মানব জাতির যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমস্তই পরস্পর বিভাগ করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে পটুতার সহিত সম্পন্ন করিতেছিল। সকল কার্য্যই সকলের নিত্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল, সেই জন্য ভারতে সকল বিষয়েরই উন্নতি হইয়াছিল। কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, কৃষি, শিল্প, বীরত্ব প্রভৃতি সকলেরই যথোচিত উন্নতি হইতেছিল। যে ব্যক্তির সমুদায় অঙ্গ, সমুদায় ইন্দ্রিয়, সমুদায় বৃত্তি বিবেকের অধীন হইয়া চলে, কোন বৃত্তিরই এক কালীন ধ্বংশ বা অতিশয় বৃদ্ধি না হয় সেই ব্যক্তিই যেমন মানবাগ্রগণ্য, সেইরূপ যে সমাজের ব্যক্তি-বর্গ সমাজের অধীন হইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করে, কোন কার্য্যেরই এক কালীন লোপ ও কোন কার্য্যের আতিশয্য না হয়, সেই সমাজই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হয়। হিন্দু সমাজ ঐরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। ঐ ভাবে চলিয়া আসিলে আজি ভারত উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ভারত আকাশে কাল মেঘের উদয় হইল। সেই মেঘ হইতে যে ঝড় উঠিল তাহাতেই ভারতসমাজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণীভূত হইল। এত দিন ধরিয়া গঠিত হইয়া যে সমাজ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিকলাঙ্গ হইল। বৌদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, সংসার দুঃখময় ও অহিংসা পরম ধর্ম্ম, নির্ব্বাণই আমাদের একমাত্র উপায়, অতএব আইস ভাই সকল জাতি বিচার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ-পদ লাভের চেষ্টা করি—আইস ব্রাহ্মণ, আইস ক্ষত্রিয়, আইস বৈশ্য, আইস শূদ্র, আইস কর্ম্মকার, আইস চর্ম্মকার তোমাদের সকলেরই মুক্তিপদ পাইবার অধিকার আছে। বুদ্ধের এই সুমধুর বাক্যে সকলেই মোহিত হইল, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ত্যাগ করিল, বৈশ্য বাণিজ্য ত্যাগ করিল, কৃষক কৃষি ত্যাগ করিল, শিল্পী শিল্প ত্যাগ করিল, সকলেই নির্ব্বাণ পদের আকাঙ্ক্ষী হইয়া অহিংসাপরায়ণ হইল, সকলেই গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইল। একমাত্র নির্ব্বাণ পথে সকলেরই মন ছুটিল। মানবের একটী অঙ্গ কি একটী বৃত্তির অতিশয় বৃদ্ধি হইলে যে দশা প্রাপ্ত হয়, ভারত সমাজের তাহাই হইল। মস্তকাদি উত্তমাঙ্গই হউক আর দয়াদি উৎকৃষ্ট বৃত্তিই হউক একমাত্রের আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইলে মানব যেরূপ কুৎসিৎ ও অকর্ম্মণ্য হয় ভারত সমাজের তাহাই

হইল। যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি প্রয়োজনীয় নানাবিধ কার্য্যের উন্নতি করিতে-ছিল, তাহারা এক্ষণে এক নির্ব্বাণ পথেরই অনুসন্ধান করিতে লাগিল—ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও উৎসাহশালী ব্যক্তি মাত্রেই ঐ পথের পথিক হইলেন। যাঁহারা বুদ্ধের মতানুবর্ত্তী হইলেন না তাঁহারাও সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের সহিত কূট ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাজরক্ষার জন্য যে সকল কার্য্য নিতান্ত আবশ্যক তৎসমস্ত এককালে বিলুপ্ত হইতে চলিল।

এই প্রকারে বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবে হিন্দুসমাজ চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। যদিও হিন্দুধর্ম্মের অমোঘ শক্তিপ্রভাবে পরিশেষে হিন্দুধর্ম্মের জয় হইয়াছিল কিন্তু সে শৃঙ্খলা আর হইল না। সেই অবধি ভারতে কেবল ধর্ম্মেরই চর্চ্চা হইতে লাগিল—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মেরই চর্চ্চা হইতে লাগিল। কালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইল বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব যে অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন তাহা আর নিবিল না। শত শত বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শত শত শৈব সম্প্র-দায়, শত শত শাক্ত সম্প্রদায় এবং নানকপন্থি, ব্রাহ্ম প্রভৃতি শত শত অন্য সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া ভারতকে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট করিল। কত চর্ম্মকারই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইল। যে কোন ব্যক্তি বুদ্ধি, সহিষ্ণুতা ও উৎসাহ-শালী হইলেম, তিনিই নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন বা ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে আপ-নার সমস্ত শক্তি পর্য্যবসিত করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না; সকল ধর্ম্মের মূল প্রাণ হইল ঈশ্বরোপাসনা। স্বর্গ, ঈশ্বর-সাযুজ্য ও মোক্ষ প্রভৃতিই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। বর্ণধর্ম্ম অর্থাৎ আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদনরূপ ধর্ম্মের আর শ্রেষ্ঠত্ব থাকিল না। সকলেই আপন আপন কার্য্য ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের মর্ম্ম বুঝিতে লাগিল, সকলেই ধার্ম্মিক হইল। ব্রাহ্মণকে আর কে মানে? ব্রাহ্মণ বিষহীন ফণির ন্যায় নিস্তেজ হইলেন। ব্রাহ্মণের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি উঠিয়া গেল, আহার চলে না, আহার উপার্জ্জনের কৌশল আবিষ্কার করিতে বসিলেন। বিশ্বহিতৈষণার পরিবর্ত্তে প্রতারণা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ অধঃপাতে গেল, সকল জাতিই অধঃপাতে গেল। বিদ্যা গেল, বলবীর্য্য গেল, শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ভিক্ষুকের দল বাড়িল। একা ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক ছিলেন, এখন বৈষ্ণব ভিক্ষুক, শৈব ভিক্ষুক, ব্রাহ্ম ভিক্ষুক। দলে দলে সন্ন্যাসী, দলে দলে

বৈরাগী। ঈশ্বরের প্রকৃত মর্ম্ম কেহই বুঝিল না, লাভে হইতে ধর্ম্ম বিশ্বাস এক কালে দূরীভূত হইল, ধর্ম্মের নামে প্রতারণা আরম্ভ হইল। এই অত্যাচারে হিন্দুর চিরন্তন অস্থিমজ্জাগত আতিথ্যব্রতেরও লোপ হইল, 'অন্যে পরে কা কথা'। ইহাতেও যদি ভারতের অবনতি হইবে না, তবে আর কিসে হইবে? এরূপ অবস্থাতেও যদি বিদেশীয় শত্রু আমাদিগকে পদ-দলিত করিবে না তবে আর কোন্ অবস্থায় করিবে?

বড় আক্ষেপের বিষয় যে অদ্যাপি আমরা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না,—কর্ত্তব্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। যে কারণে আমাদের এই অভাবনীয় পতন হইয়াছে তাহারই পুনরভিনয় করিতে বসিয়াছি—তাহাই বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনাই আমাদের একমাত্র কার্য্য নহে, ঈশ্বর এমন উপাসনাপ্রিয় নহেন যে, তিনি কেবল আমাদিগকে উপাসনা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্ম্মই তাঁহার অভিপ্রেত, এই পৃথিবী আমাদের কর্ম্মভূমি। যথানিয়মে ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসকলের সামঞ্জস্য করিয়া শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিতে পারিলেই আমাদের ধর্ম্ম করা হইল। এই জন্য প্রাচীন ঋষিগণ বর্ণ ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জাতীয় বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন, সংযমন ও যথাবিধানে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনই প্রকৃত ধর্ম্ম। ভগবদ্গীতাকার বলিতেছেন—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। ৩১।
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাজনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি। ২০।
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ৩৫।

হে অর্জ্জুন! তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকার বিকম্পিত হইবে না; ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম নাই। জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অতএব অন্ততঃ লোকরক্ষণজন্য তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

আপন ধর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাহা পরধর্ম্ম অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্ম পালন করিতে গেলে যদি মৃত্যু হয় তাহাও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে।

প্রত্যক্ষ দেখিয়াও আমরা ইহা বুঝিতেছি না। এখনও যদি আমরা প্রাচীনগণের পদবী অবলম্বন করিয়া আমাদের জাতীয় রীতিনীতি সংশোধন করিতে মনোযোগী হই, এখনও যদি আমরা কেবল চাকরি এবং পুস্তক ও পত্রিকা লেখা প্রভৃতি কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া যথা বিধানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হই, তাহা হইলেও আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হইতে পারে। আমাদের সমস্ত রীতিনীতিই ভয়ানক দূষিত হইয়াছে। সমস্ত গুলিরই রীতিমত সংশোধন আবশ্যক।

যাঁহারা বলেন প্রাচীন ভারতের নিয়ম আর চলিবে না, সে আশা বৃথা, এক্ষণে নূতন ধরণে সমাজের গঠন করিতে হইবে; আমরা তাঁহাদিগকে বলি ভারতের আর উন্নতি হইবে না, সে আশা বৃথা, ভারতসমাজ ধ্বংশে পরিণত হইবে। ইউরোপে যে ভাবে উন্নতি হইতেছে ভারতে তাহা সম্ভবে না। বালকের বৃদ্ধভাব সম্ভব হইতে পারে কিন্তু বৃদ্ধের বালকত্ব সম্ভবে না। ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষা যে-সে-রূপে লিখিলে চলে বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহা চলে না। ইচ্ছামত সংস্কৃত লিখিবার চেষ্টা করিলে ঐ ভাষার যেমন দুর্দ্দশা হয়, ভারত সমাজ ইচ্ছামত গড়িলেও সেইরূপ হইবে। ইংরাজি ভাষার ন্যায় ইংলণ্ডীয় সমাজ আজিও স্থির হয় নাই, তাহাদের আজিও স্থায়ী সম্ভ্রম ও অভ্যাসজনিত প্রকৃতি হয় নাই, এখনও উচ্চ নীচ হইতেছে, নীচ উচ্চ হইতেছে, এখনও পরীক্ষা চলিতেছে; প্রতিদিনই সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাই তথায় স্বেচ্ছাচার শোভা পায়। ভারতসমাজ সংস্কৃত ভাষার ন্যায় সম্পূর্ণ. সকলেই যথোচিত মর্য্যাদা ও অভ্যস্ত-প্রকৃতি সম্পন্ন। ইহাতে যথেচ্ছাচার শোভা পায় না। অধঃপাতে না গেলে কোন্ সম্ভ্রান্তবংশীয় ইচ্ছা পূর্ব্বক নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য করিতে স্বীকার করিবে? যাহারা চিরকাল নীচ তাহারা উচ্চপদ গ্রহণ করিবে আর চির সম্ভ্রান্তগণ নীচ পদবী গ্রহণ করিবে? ভারত সমাজে এরূপ চেষ্টা করা ও দেশ উৎসন্ন দেওয়ার চেষ্টা করা একই কথা। নিম্ন শ্রেণীরগণের সহিত অযথা বিবাদে অতএব সমাজ এক কালে উৎসন্ন হইবে। ইউরোপীয়গণেরও আর অধিক দিন উক্তরূপ নিয়মে চলিবে

না। এক্ষণে তাঁহারা নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন ও নানা দেশ অধিকার করিয়া পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোকের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের নিম্ন শ্রেণীর অবস্থা কি শোচনীয়! তাঁহাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের নিম্ন শ্রেণীয়গণ কিছুতেই মানব নামের যোগ্য নহে। নিম্ন শ্রেণীর লোকের দুরবস্থা দেখিলে অশ্রুবর্ষণ হয়, মানব নামে ঘৃণা জন্মে, সভ্যতা ও উন্নতির প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। কি জন্য ধনী-প্রধান ইংলণ্ডের এই দশা? যে দেশে শত শত ব্যক্তির বিংশতি কোটী মুদ্রা বার্ষিক আয় তথাকার নিম্ন শ্রেণীর এ দশা কেন? উচ্ছৃঙ্খল রীতিই যে উহার এক মাত্র কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের সম্পত্তি হরণ করিয়াও যে কার্য্য-প্রণালীর দোষে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের কতিপয় সংখ্যক লোকের জীবনোপায় হইল না, সেই কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিলে বিংশতি কোটী মানবের নিবাসভূমি ভারতের সম্পোষ্য হইবে?

বড় আক্ষেপের কথা যে, আমরা এই সকল না দেখিয়া বালকের মত পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে মোহিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের অমূল্য নিধি পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছি। কাচের লোভে হীরক পরিত্যাগ করিতেছি, অথবা "কাচ মূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া।"

বিষয়টী অতি গুরুতর, সংক্ষেপে যাহা বলিবার তাহাই বলা হইল। এই গুরুতর বিষয়ের প্রকৃত আলোচনা করিতে হইলে এক খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ভবিষ্যতে ইহার প্রকৃত আলোচনা করিবার আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিল। এই প্রবন্ধ পঠিত হইলে ইহার বিরুদ্ধে কএকটী আপত্তি উত্থিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইলে বোধ হয় সে আপত্তি গুলি উঠিত না। আমরা প্রধান আপত্তি কয়েকটীর সম্বন্ধে গুটি কতক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে ভারতে বিলক্ষণ উন্নতি দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকেই ঐ উন্নতির কারণ বিবেচনা করেন, আমাদের বোধ হয় তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। কেন না বৌদ্ধধর্ম্ম বিদেশীয় ধর্ম্ম নহে—বিদেশ হইতে আগত নহে। উহা হিন্দু ধর্ম্মের একটী অংশ মাত্র। হিন্দু ধর্ম্মেরই একটী অংশ

লইয়া হিন্দুই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত উহার প্রধান প্রভেদ এই যে, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ, বৌদ্ধধর্ম্ম একাঙ্গবিস্তৃত। ঐ একাঙ্গের প্রাধান্যস্থাপন জন্যই বুদ্ধ বেদ মানেন নাই। বুদ্ধ বিদেশ হইতে কিছু আনেন নাই। কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি বিজ্ঞান, বুদ্ধের সকলই ভারতের। যদি ভারত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলন সময়ে প্রকৃত উন্নত না থাকিত তাহা হইলে কখনই বুদ্ধের উন্নতি লক্ষিত হইত না। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যে, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথার শিথিলতা সম্পাদন ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অন্য কোন রূপ পার্থিব উন্নতির (যদি বাস্তবিক ঐ সকল উন্নতির কারণ হয়) উপায় হয় নাই। যাহা হইয়াছিল সে কেবলই আধ্যাত্মিক কিন্তু কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে পার্থিব উন্নতি হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে বুদ্ধের পর ভারতের ঈদৃশ পতন হইত না। কেন না বৌদ্ধের পরে ভারতের সকল শ্রেণীর লোকই আধ্যাত্মিক চিন্তাতে মগ্ন ছিল। ৺অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত "উপাসক সম্প্রদায়" পাঠ করিলে জানা যায় যে, বৌদ্ধের পর হইতে কত শত ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভারতে উত্থিত হইয়া আধ্যাত্মিক চিন্তা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেই সময়ই আমাদের অবনতির সময়। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতির পার্থিব উন্নতিবিধায়ক কোন শক্তি ছিল না। তবে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সময়ে উন্নতি হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার অনেক কারণ আছে। পরে আমাদের তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলেই যে সমগ্র ভারতবাসী বৌদ্ধ হইয়াছিলেন এবং হিন্দু রীতিনীতি সকলের এককালীন ধ্বংস হইয়াছিল তাহা নহে; বুদ্ধ যে অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন তাহা সমগ্র ভারতকে অল্প দিনে ছারখার করিতে পারে নাই, তাই অশোক প্রভৃতির সময়েও ভারতের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। ঐ সকল উন্নতি হিন্দু সভ্যতা-সমুৎপন্ন। যত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইতে লাগিল, তত তাহার নাশ হইল—তত ভারত শক্তিশূন্য হইল। যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য থাকিত তাহা হইলে কখনই এত অল্প দিনে উহা ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইত না। চীন প্রভৃতির উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রমাণ করিতে চাহেন তাঁহাদের ভুল। কেন না বৌদ্ধ ধর্ম্ম কুধর্ম্ম নহে, উহা হিন্দু ধর্ম্মের কাছেই কুধর্ম্ম। পূর্ব্বের

নিকট অংশ যেরূপ হীন, হিন্দু ধর্ম্মের কাছে বৌদ্ধধর্ম্ম সেই রূপ হীন। পূর্ব্বাবয়ব ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার অনিষ্টকারী বলিয়া অপর দেশে অনিষ্টকারী নহে, প্রত্যুত বিশেষ উপকারী। অন্য সকল দেশ নিতান্ত অসভ্য ছিল, সে সকল দেশবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসাদে ভারতীয় জ্ঞানালোক পাইল। তাহাতে তাহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইল। ধনীর যে অবস্থা দারিদ্র-ব্যঞ্জক দরিদ্রের তাহা ধন-প্রকাশক। তাই বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীন প্রভৃতি দেশের হিতকর ও ভারতের অহিতকর। ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করিব।

অনেকের মত এই যে এক্ষণে জাতিভেদ প্রথা প্রচারিত থাকিলে কায়স্থ, তেলি, সদ্গোপ প্রভৃতি যেরূপ উন্নত হইয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন তাহা করিতে পারিতেন না, প্রত্যুত ঐরূপ চেষ্টাকারীদের জিহ্বাচ্ছেদ হইত। যাঁহারা শাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্র মর্ম্মও জানেন না তাঁহারাই এইরূপ কথা বলেন। কেন না ভারতে কোন জাতিরই বিদ্যাশিক্ষা করিতে নিষেধ ছিল না, শূদ্র এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই বিদ্যাশিক্ষা করিবার অধিকার ছিল, কেবল একমাত্র বেদ পাঠে একমাত্র শূদ্রের অধিকার ছিল না। কিন্তু আজিকালি কয়টী ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করেন? বেদ পাঠ করিতে না পারিলে কি উন্নতি হয় না? যে সকল ব্যক্তির উন্নতির কথা বলা হইল তাঁহাদের মধ্যে কে বেদ পাঠ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তাঁহাদের জিহ্বাচ্ছেদ হইত। বিশেষতঃ তাঁহারা যে সকল জাতির কথা বলিতেছেন তাহার একটী ও শূদ্র নহে—সকলেই দ্বিজ-সন্তান কায়স্থ বঙ্গের ক্ষত্রিয় এবং কপালি, চাসাধোপা পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিই বৈশ্য। বাগ্দী, দুলে প্রভৃতিরাই শূদ্র বাচ্য।

আমরা আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। এক্ষণে যে সকল ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা মাত্রেরই উন্নতি করিয়া খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা যদি তৎপরিবর্ত্তে স্বজাতীয় বৃত্তির সমধিক উন্নতি করিতেন তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় দেশের প্রকৃত উন্নতি হইত। অর্থাৎ যদি কেহ শৌর্য্যবীর্য্য, কেহ কাপড় ও লৌহ প্রভৃতির কল কেহ প্রকৃত বাণিজ্য ও কেহ উৎকৃষ্ট কৃষিপদ্ধতি প্রচার করিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত উন্নতি হইত। ধর্ম্মপ্রচার, পুস্তক ও পত্রিকা প্রণয়ন এবং চাকরি

করিয়া যে, তাঁহারা দেশের বিশেষ হিত সাধন করিয়াছেন এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি।

ইংরাজ সমাজের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সে উদ্দেশ্য থাকিলে বোধ হয় চেষ্টা করিলে অনেক বলিতে ও অনেক প্রমাণ দিতে পারা যাইত। আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই যে, আমরা উৎকৃষ্ট বলিয়া যে পাশ্চাত্য রীতি-নীতির একান্ত ভক্ত হইয়াছি তাহা যে প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট নহে তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা মাত্র—মেকলের পদবী অনুসরণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

প্রবন্ধের কোন স্থানেই এমত কথা নাই যে আমাদিগকে অবিকল প্রাচীন রীতিনীতি সম্পন্ন হইতে হইবে, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও হইবে না। বাস্তবিক আমাদের সেরূপ মত নহে, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিও সেরূপ নহে। চিরকালই হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে ও চিরকালই হইবে। উহাই হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার একটী প্রধান কারণ। যুগ বিশেষে ধর্ম্মেরও বিভেদ হয়, এ কথা হিন্দুধর্ম্মেরই বাক্য। আমাদের মূল মত এই যে আমাদের রীতিনীতি হিন্দু প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়া চাই, পাশ্চাত্য অনুকরণ আমাদের যোগ্য নহে।

বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথা। *

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে অনেক দিবস যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে, এই মঙ্গলময় আন্দোলনে অনেক সুফল ফলিয়াছে এবং অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই এই কুপ্রথা দেশ হইতে বিদূরিত হইবে আশা করা যাইতে পারে।

বাল্যবিবাহের ন্যায় অনিষ্টজনক কুপ্রথা কোন সভ্যদেশেই প্রচলিত নাই, আমাদের দেশেও যে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, এমত কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; বরং তৎসময়ে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না এরূপই প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালের লোকেরা প্রথম বয়সে বিদ্যোপার্জ্জন, দ্বিতীয় বয়সে দারপরিগ্রহণ পূর্ব্বক সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন এবং তৃতীয় বয়সে ধর্ম্মকার্য্য সাধনে জীবন সমর্পণ করিতেন। কন্যাগণও পিতৃগৃহে নানা শাস্ত্র ও কলা বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহিতা হইতেন।

বাল্য বিবাহ যদ্যপিও শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই অস্মদ্দেশীয় হিন্দু মাত্রের অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে এবং লোকে চক্ষের উপর শত শত সর্ব্বনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াও শাস্ত্রের আদেশ বলিয়াই এই কুপ্রথা দেশ হইতে দূর করিতেছেন না, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জন কত মুনির বাক্য ভিন্ন কোন শাস্ত্রেই কন্যার বাল্য বিবাহ না দিলে পাপ বলিয়া উক্ত নাই।

জানি না কি কুক্ষণে অঙ্গিরা মুনির মুখ হইতে এই শ্লোকটী—"অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত উর্দ্ধং রজস্বলা।" বাহির হইয়াছিল। এই শ্লোকটির দোহাই দিয়াই জনসমূহ বালিকা কন্যাকে বাল্য বিবাহ রাক্ষসীর মুখে প্রদান করিয়া থাকে। বশিষ্ঠ

---

* সন ১২৮৯ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৪ র্থ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ গুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করাতে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীকে আমাদের প্রতিশ্রুত পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইত্যাদি আরও কয়েকটী মুনি বাল্যবিবাহে মত দিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে বাল্য বিবাহের দৃষ্টান্ত অতি বিরল এবং অন্যত্র দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে মনু বলিয়াছেন, "কামমামরণত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হি চিৎ।" অর্থাৎ কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বরং পিতৃগৃহে বাস করিবে তথাচ গুণহীন পাত্রে সমর্পিত হইবে না।

এই সমস্ত শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করা বৃথা, কেন না আধুনিক হিন্দুগণ শাস্ত্র স্বচ্ছন্দে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু দেশাচারের বন্ধন তাঁহারা কোন প্রকারেই ছিন্ন করিতে সাহসী হয়েন না।

যদি তাঁহারা শাস্ত্রই মান্য করিবেন হলেত দশম বর্ষের ন্যূন বয়সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় কন্যাকে ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমেও বিবাহ দেওয়া হয়, সুতরাং বলিতে হইবে যে তাঁহারা শাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচারের দাস।

দুঃখে ও ঘৃণায় হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শাস্ত্র অমান্য করিয়া স্বচ্ছন্দে গোপনে কুক্কুট এবং গোমাংস সেবন করিতে পারেন; দেশের অনেক সুনিয়মও যাঁহারা নিজ সুখার্থে কুনিয়ম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাও এই মহাপাপ-শৃঙ্খলে আপনাদিগের শিশুসন্তানদিগকে বন্ধন করেন।

পূর্ব্বকালে যদি বাল্য-বিবাহ প্রচলিত এবং বর্ত্তমান কালের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় থাকিত, তবে কখনই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী শকুন্তলা ইত্যাদি রমণীগণ যোগ্য বয়সে মনোমত বরে পরিণীতা হইতে পারিতেন না, অবশ্যই তাঁহাদিগকেও দশম বর্ষের মধ্যেই বিবাহিতা হইতে হইত। এইরূপ রাজকন্যাগণের উপযুক্ত বয়সে বিবাহের বহুতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বিবেক দ্বারা যাহা একেবারে অসঙ্গত এবং চিকিৎসা শাস্ত্র দ্বারা যাহা বারংবার মহা অনিষ্টকারী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেই কু-প্রথাকে কি অমূলক দেশাচারের ভয়ে দেশে রাখা উচিত? চিকিৎসাশাস্ত্র বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কি বলেন আমাদিগের সে দিকে কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য। সুশ্রুত বলিয়াছেন যে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা বালিকার যদ্যপি পঞ্চবিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের ঔরসে গর্ভ সঞ্চার হয়, তবে সেই সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইবে, যদি তাহা

না হয় তবে দুর্ব্বল ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে এবং জন্ম মাত্র মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইবে, যদি দৈবাৎ তাহা না হয়, তবে সেই সন্তানের দীর্ঘায়ু লাভের আশা করা যাইতে পারে না। আধুনিক সুবিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসক-গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বাল্যবিবাহ স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির শারীরিক অনিষ্ঠকারক; তবে কিনা পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীদিগের শারীরিক অনিষ্ট কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে হইতে দেখা যায়।

বাল্যবিবাহ দ্বারা বিদ্যাশিক্ষার অতিশয় অনিষ্ট সাধিত হয়। স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সে বিবাহিতা হইয়া সাংসারিক কার্য্যে আবদ্ধা এবং চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই সন্তান সন্ততি লইয়া ঘোরতর কাজের লোক হইয়া পড়েন। যে বয়সে তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া ধূলা খেলা করিয়া সরলভাবে দিন কাটাইবে, সেই সুকুমার বয়সেই তাহাদিগকে ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, সংসার, পুত্র কন্যা ইত্যাদি লইয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। শরীর পূর্ণ বিকসিত হইবার পূর্ব্বে সন্তান হইয়া যৌবনেই বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হয়; কোনমতে দুর্ব্বল দেহটী লইয়া তাহারা ম্রিয়মাণ হইয়া দিন কাটায়।

অনেক স্থলে দেখা যায় একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার সন্তান হইয়া তাহার প্রফুল্ল কুসুমের মত সুন্দর মুখ বৃন্তভাঙ্গা ফুলের ন্যায়, শুষ্ক করিয়া ফেলে—সুকুমার হাস্যময়ী বালিকা-মূর্ত্তিকে নিদারুণ পুত্রশোকে বিষাদের প্রতিমা গড়িয়া ফেলে। বিংশতি বর্ষ বয়সের মধ্যে কত দুর্ভাগিনী পতিপুত্র-বিহীনা হইয়া হাহাকার করিয়া সমস্ত জীবনটি গত করে। একজন বালিকা যে, কন্যা, স্ত্রী, মাতা, এই ত্রিবিধ ব্রত সুচারুরূপে পালন করিয়া উঠিবে এরূপ আশা করা বৃথা, সে কোন কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে না পারিয়া নানা প্রকার বিপদগ্রস্ত হয়। উত্তমরূপ লালন পালন না করাতে শিশু সন্তান নষ্ট হইয়া যায়; স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করাতে স্বামী দুর্ব্বি-নীত এবং পাপপথাবলম্বী হইয়া উঠে; সাংসারিক কার্য্যে অপটুতা নিবন্ধন সংসার নানারূপ দুঃখের আগার হইয়া উঠে, অভাগিনী দুঃখপূর্ণ জীবনটী কাঁদিয়া যাপন করে। পিতৃহীন শিশুর মলিন বদন, স্বামিহীনা বালবিধবার নিদাঘনিপীড়িতা লতার ন্যায় বিশুষ্ক রূপমাধুরির মধ্যে কি বাল্যবিবাহ রাক্ষ-সীর বিষদন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না? ঐ যে দ্বাদশবর্ষীয়া অবোধ বালিকা

পতিপুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া আর্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে, অন্নাভাবে শীর্ণা হইয়া পথের ভিখারিণী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করত পরিশেষে আশ্রয় না পাইয়া নীচ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে জীবন কলঙ্কিত করিয়াছে, উহার এসমস্ত দুর্দ্দশার কারণ কে? নিদারুণ বাল্যবিবাহই কি এই অভাগিনীর সমস্ত সুখ হরণ করিয়া পরিশেষে উহাকে পাপসাগরে নিমজ্জিত করে নাই? হিন্দু-রমণীগণ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই এবং বাল্যবিবাহের প্রাবল্য নিবন্ধন কত বালবিধবা যে পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইয়া শত শত ভ্রূণহত্যা দ্বারা দেশ রসাতলে দিতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

বর্ষে বর্ষে কত শিশু সন্তান যে অপরিণতবয়স্ক পিতা মাতার দোষে জন্ম মাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করে, গর্ভস্রাব হইয়া যায়, অন্বেষণ করিলে তাহা বঙ্গের গৃহে গৃহে দৃষ্ট হইবে। অল্প বয়সে বিবাহিতা হওয়াতে আমাদের দেশীয়া মহিলারা স্বামী মনোনীত করিতে পারেন না, তদ্রূপ অল্পবয়স্ক বালকেরাও স্ত্রী মনোনীত করিতে অক্ষম হয়. পিতা মাতা যেরূপ একটা বিবাহ দেন, তাহাতেই রাজি হইতে হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে দু চারি জনের ভাগ্যে প্রণয় সুখ ঘটিয়া উঠে, আবার কত শত জন দাম্পত্য বিরোধানলে নিরন্তর দগ্ধ হয়। বিবাহের একটী প্রধান উদ্দেশ্য বাল্যবিবাহ দ্বারা সংসিদ্ধ হইতে পারে না—স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের ভার গ্রহণ করিয়া একে অন্যকে অসংপথ হইতে সংপথে আনয়ন করিবে; স্বামী যদি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হন তবে স্ত্রী তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া পাপ হইতে বিরত করিবে এবং স্ত্রী কুসংস্কারাপন্না অশিক্ষিতা এবং কলহপ্রিয়া হইলে স্বামী তাঁহাকে সংশিক্ষা দ্বারা সংশোধন করিবে; বিবাহের এই সমস্ত সুমহৎ উদ্দেশ্য কখনই বালক বালিকা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। এক অন্ধ কি অন্য অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়? যে বয়সে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অধীনে, গৃহে পিতা মাতার অধীনে থাকিয়া আপন চরিত্র গঠন করিতে হয়, তখন আর অন্যের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা কিরূপে হইতে পারে?

স্ত্রীলোক হইতে বাল্যবিবাহ দ্বারা পুরুষগণের সমধিক অনিষ্ট সাধিত হয়। কথায় বলে "যার মাথা নাই, তার আবার মাথাব্যথা কি?" আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষাই বা কোথায়, তাহার আর অনিষ্টই বা কি হইবে? কিন্তু

পুরুষদের ত তাহা নয়, স্কুল আছে, কলেজ আছে, পিতা মাতার বিদ্যা শিক্ষা করাইবার যত্ন আছে, সুতরাং বাল্যবিবাহে বিদ্যাশিক্ষার অনিষ্টের ভাগটা তাহাদেরই অধিক। সাধনায় সিদ্ধি ফলে। পৃথিবীতে কোন মহৎ কার্য্যই বিনা সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষাও একটা গুরুতর সাধনা, সম্পূর্ণ মনোনিবেশ ব্যতীত বিদ্যাশিক্ষা হয় না, তাহাতে তৎসময়ে বিবাহ করিয়া সংসারের ভার-গ্রস্ত হইলে যে বিদ্যার ব্যাঘাত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যোপার্জ্জন কালে কেবল বিদ্যরসাস্বাদনেই মত্ত থাকা উচিত; এক সময়ে বিদ্যা ও প্রণয় দুই রস আস্বাদন করিতে গেলে কোনটীই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা দায়।

বিবাহিত অনেক যুবকও ত বহু দূর দেশে বাস করিয়া গভীর জ্ঞানার্জ্জন করিতেছেন দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল তাহার সন্দেহ নাই। আর সেই সকল অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ভারতের সুযোগ্য সন্তানগণ যদি বিবাহিত হইয়া ভারগ্রস্ত না হইতেন, তবে আরও যে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অপরন্তু অল্প লোকের অনিষ্ট ঘটনা হয় না বলিয়াই যদ্দ্বারা বহু লোকের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে তাহা কি পরিত্যাগ করা উচিত নহে? অধিকাংশ বঙ্গযুবক অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রী, পুত্র কন্যাদি লইয়া এরূপ ভারগ্রস্ত হইয়া পড়েন যে বিদ্যাশিক্ষার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও তাহাদিগকে বিষয় কার্য্যে রত হইতে হয়; কিন্তু তাহাতেও সংসারের সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিয়া আজীবন দরিদ্রতা-অনলে দগ্ধ হন। আমাদের দেশের দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ। আমার বিবেচনায় ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে এরূপ নিয়ম সংস্থাপিত হওয়া উচিত যে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান না করিয়া কোন ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারিবে না।

ভারতের হাড়ে হাড়ে যে দরিদ্রতার অনল বিদ্যমান, ভারতযুবা যে ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রমেই পুত্র কন্যাদি লইয়া ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে—দরিদ্রতার ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া নিরাশ্রয় শিশু সন্তান ও সহায়হীনা পত্নীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া যায়, এরূপ দৃষ্টান্ত কি অন্বেষণ করিতে হইবে? ভারতের ঘরে ঘরেই যে সর্ব্বদা এরূপ ঘটনা সজ্ঘটিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের লোক যে দুর্ব্বল, নির্ধন ও অল্পায়ু বাল্যবিবাহ তাহার প্রধান কারন সন্দেহ নাই। এখন বিবেচ্য এই যে কিরূপ বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত—আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান বলিয়া অন্যান্য শীত প্রধান দেশাপেক্ষা আমাদের দেশের বালকবালিকাগণ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বাল্যবিবাহও অকাল-পক্কতার একটী প্রধান কারণ সন্দেহ নাই।

শীতপ্রধান দেশীয়া মহিলাগণ বিংশতিবর্ষ বয়সে যেরূপ যৌবন সীমায় উপস্থিত হন, আমাদের দেশীয়া বালিকাগণ ১৪ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বসেন; এজন্য আমাদের দেশীয়া রমণীগণের চতুর্দ্দশ এবং পুরষগণের পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পরে বিবাহ হওয়া উচিত। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় বটে যে শীঘ্র শীঘ্র পুত্রকন্যা বিবাহ করাইলেই বধূটীর দ্বারা সাংসারিক অনেক কার্য্যের সুবিধা হয়, এবং সর্ব্বাংশে পুত্রের ন্যায় একটী জামতা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হওয়া যায়, কিন্তু এই একটু অকিঞ্চিৎকর উপকারের তুলনায় সর্ব্বনাশের ভাগ যে কত অধিক তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যেমন শীঘ্র বধূটি আনিয়া গৃহকার্য্যের সুবিধা-বিধান হয়, তেমন আবার নিজ কন্যাকে ও শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিতে হয়। একদিকে অভাব ঘটাইয়া অন্যদিক দিয়া তাহা পূর্ণ করা হয়, অতএব বাল্য-বিবাহ না দিলে কন্যা দ্বারাই অধিক দিন গৃহকার্য্যের সহায়তা চলিতে পারে।

মহাপাপ বাল্যবিবাহ যাহাতে শীঘ্র দেশ হইতে দূর হয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এজন্য বিশেষ কোন গ্রন্থ রচনা কিম্বা বৃহৎ বৃহৎ বক্তৃতা প্রদানের কোন প্রয়োজন করে না, কেবল নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা লোকদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট কার্য্য সাধন করা হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি এরূপ সঙ্কল্প করেন যে অল্প বয়সে কখনই পুত্র কন্যার বিবাহ দিব না, তবেই এই কুপ্রথা চলিয়া গিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ-প্রথা দেশে সংস্থাপিত হইতে পারে; এবং উপযুক্ত বয়ঃক্রমে বিবাহের সুফল দৃষ্টি করিয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের তৎপ্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।

যদিও বাল্যবিবাহ প্রথার কুফল ভিন্ন সুফল কিছুই দৃষ্ট হয় না, তথাপি

বাল্যবিবাহের স্বপক্ষগণকে কখন কখন এরূপ বলিতে শ্রুত হওয়া যায় যে বাল্যবিবাহ দ্বারা দেশে ব্যভিচার পাপ অনেক নিবারিত হইতেছে, বাল্যকালে বিবাহ না হইলে অবিবাহিতা যুবক যুবতীর চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে করিতে পারে। এটী অতি ভ্রমপূর্ণ বাক্য, কেননা বিবাহিত ব্যক্তিগণেরই বরং কখন কখন চরিত্রের দোষ ঘটিতে অধিক দৃষ্ট হয়, অবিবাহিত অল্পবয়স্ক বিদ্যা শিক্ষারত যুবকগণ কখনই কুচরিত্রান্বিত হইয়া উঠিতে দেখা যায় না। তবে সৎশিক্ষার অভাব হইলে সকল অবস্থাতেই লোকের চরিত্রে দোষ ঘটিতে পারে। রমণীগণও যদি অধিক বয়স পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরে বিবাহিতা হন তবে তাদের চরিত্র মন্দ হওয়া দূরে থাকুক বরং অনেক উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

অন্তঃপুরমধ্যে রুদ্ধ থাকার নামই অবরোধ প্রথা। অবরোধবাসিনী-দিগের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে, যেমন পুরুষ জাতির সম্পূর্ণরূপে নিশ্রিত না হওয়া, পুরুষের মত স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা, পুরুষের মনোরঞ্জনানুরূপ গুণমাত্র শিক্ষা করিয়া পুতুল সাজিয়া পুরুষের ক্রীড়াদাসী হইয়া থাকা, পুরুষের ইচ্ছার নিকট নিজ বিবেক বলিদান দেওয়া ইত্যাদি। আর লজ্জাশীলতা, গৃহকার্য্যে সুপটুতা ও ধর্ম্মশীলা হওয়া ইত্যাদি কতকগুলি সুগুণ সমূহেও অবরোধবাসিনীদিগের সজ্জিত হওয়া উচিত।

ভারতে যবনাধিকার অবরোধ-প্রথার সৃষ্টি না করিলেও যে অবরোধকে শত গুণে ভীষণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাকালে ভারতে অবরোধ প্রথা একেবারে প্রচলিত ছিল না একথা বলা যাইতে পারে না, কেননা রামায়ণ মহাভারতে অবরোধ প্রথার যথেষ্ট বর্ণনা দৃষ্ট হয়; কৌশল্যা মন্দোদরী ইত্যাদি রমণীগণের অন্তঃপুরে যে চন্দ্র সূর্য্যেরও প্রবেশপথ ছিল না, তাহা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। রামের কৌশল্যার অন্তঃপুরে গমন সময়ে অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যথা, "সোহপশ্যৎ পুরুষংতত্র বৃদ্ধং পরম-পূজিতং. উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতশ্চাপরান বহূন্। প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ, ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজ্ঞাভিসং-কৃতান্, প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধান্, তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ, স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বার-রক্ষণ-তৎপরাঃ।" অর্থাৎ তিনি গৃহদ্বারে পরম পূজনীয় বৃদ্ধকে উপবিষ্ট

এবং অন্যান্য অনেককে অবস্থিত দেখিলেন। প্রথম কক্ষায় প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কক্ষাতে বেদসম্পন্ন রাজকর্তৃক সম্বর্দ্ধিত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় কক্ষাতে বাল বৃদ্ধা স্ত্রীগণ দ্বার রক্ষণকার্য্যে তৎপর রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন তিনি সুরক্ষিতা তদ্ভিন্ন কেবল অন্তঃপুরে রুদ্ধ রাখিলে স্ত্রীলোক সুরক্ষিতা হয় না, এই সারবান্ বাক্যটী প্রাচীন কালোক্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র এই বাক্যটী প্রাচীনকালেও প্রতিপালিত হইত না। তবে অধিকস্থলে অনুরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সীতা রামের সহিত, দময়ন্তী নলের সহিত এবং দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের সহিত অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইলেন, কিন্তু সমাজ তাহাতে কিছু মাত্র দূষিল না। অধুনাতন ইউরোপীয়া মহিলাগণের ন্যায় পূর্ব্বকালে রাজমহিষীগণ যে স্বামিসমভিব্যাহারে রথারোহণে প্রকাশ্যরূপে গমন করিতেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; রঘুবংশে দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রম গমন নামক সর্গে কালিদাস লিখিয়াছেন যে রাজাঙ্গনা সুদক্ষিণা মহারাজ দিলীপের সহিত একরথারোহণে অরণ্যের শোভা দর্শন করিতেছেন; রথচক্রোত্থিত ধূলিজালে তদীয় কেশ জাল জড়িত হইয়া এক অপূর্ব্ব মলিন শ্রী সম্পাদিত হইয়াছে, ইত্যাদি। সাবিত্রী বন ভ্রমণে বহির্গতা হইয়া সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থলে অবরোধ-প্রথা কোথায় লুক্কায়িত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অনেকে এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে কেবল রাজমহিষী এবং রাজকন্যাগণই কখন কখন অবরোধ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেন; স্বামীর সহিত রাজসভায় উপবেশন করিতে পারিতেন, অন্যান্য সমস্ত মহিলাগণ ঠিক্ বর্ত্তমান কালের মহিলাগণের ন্যায় পোষাপাখীটির মত অন্তঃপুর-পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া থাকিতেন, বাস্তবিক তাহা নয়। ঋষিপত্নী এবং ঋষিকন্যাগণও অবরোধবদ্ধা ছিলেন না। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে বনদেবীর ন্যায় বিরাজ করিতেন, পুরুষের ন্যায় শাস্ত্রালোচনা, অতিথি সংকার এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন করিতেন। শকুন্তলা ইত্যাদি ঋষিকন্যাগণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধবে কামন্দকী নাম্নী একটী স্ত্রী-চরিত্র বর্ণিত

আছে; তিনি ভূরিবসু নামক রাজমন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী ছিলেন। তিনি এরূপ জ্ঞানবতী ছিলেন যে রাজাও তাঁহাকে সম্মান করিতেন।

রামায়ণে উক্ত আছে মৈত্রেয়ী নাম্নী (যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী নয়) একটী যুবতী প্রত্যহ বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শাস্ত্রপাঠার্থ সমাগতা হইতেন; পুরাণে এরূপ সংদৃষ্টান্তের অপ্রতুলতা নাই।

অতি প্রাচীন কালের কথা পরিত্যাগ করিয়া যবনাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালের প্রতি দৃষ্টি করিলে দুর্গাবতী, লক্ষ্মী বাই ইত্যাদি বীর রমণীগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে দেখিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহাতে তৎকালে নিন্দা না হইয়া বরং প্রশংসাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যবনাধিকার হইতেই অবরোধ প্রথা কঠিনরূপে গঠিত হইয়াছে প্রতীয়মান হয়। ইহার কারণ দুইটী, প্রথম এই যে যবনগণ অতিশয় অত্যাচারী ছিল, সুন্দরী ও গুণবতী রমণীগণের প্রতি তাহারা সময় সময় অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে; তজ্জন্য তৎসময়ে স্ত্রীলোকদিগকে গুণজ্ঞান-বিহীনা করিয়া ধনবৎ অন্তঃপুরে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, রাজা কিম্বা প্রধান লোকের দৃষ্টান্তানুসারেই সাধারণ লোকদিগকে চলিতে দেখা যায়; সুতরাং মুসলমান জাতির কঠিনতর অবরোধ-প্রথার দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়াই দেশীয়গণ কঠিনতর অবরোধ গঠন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এখন দেশ ইংরাজাধিকৃত হওয়াতে, ইংরাজ মহিলাগণের স্বাধীন ভাব বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদি সংদৃষ্টান্ত দেখিয়া যেরূপ আমাদের দেশেও স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার ধুম পড়িয়াছে, তদ্রূপ মুসলমান রাজগণের দৃষ্টান্তেই অবরোধ-প্রথা সংস্থাপিত হইয়াছিল। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই অবরোধ প্রথা দ্বারা তৎসময়ে রমণীগণের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা হইয়াছে, কিন্তু অন্যদিকে সেইরূপ স্ত্রীলোকগণ সঙ্কীর্ণমনা, অশিক্ষিতা এবং পুরুষের দাসী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বোম্বাইয়ের পারসিক ও মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোক-দিগের অবরোধ-শৃঙ্খল অতি শিথিল, তদ্দ্বারা তাহাদের বিদ্যা জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের শুভ ফলই দৃষ্ট হইতেছে। অবরোধ-প্রথা যে সমস্ত সভ্যদেশে নাই, তথায় স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকে, সামাজিক প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণ অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং অনেক কার্য্যে পুরুষের

সহায়তা করিয়া সংসারের কল্যাণ সাধন করে। সেই সমস্ত দেশে চিকিৎসা এবং শিক্ষাকার্য্য স্ত্রীগণ দ্বারা অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সমাজে মিশিলে জ্ঞানী লোকদের সহবাসে মুখে মুখেও অনেক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, বিনা কষ্টে ও অলক্ষিত ভাবে মনের সংশিক্ষা হইতে থাকে, অন্তঃপুর প্রাচীরে আজীবন আবদ্ধ থাকিলে অনবরত হীনলোকের সহবাসে মন অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, কোন বিষয়ে একটু মতামত প্রকাশ করিতে হইলে হাবুডুবু খাইতে হয়।

যে সকল জাতি মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব এবং অবরোধ প্রথার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব সেই সমস্ত সমাজের স্ত্রীগণ সমধিক হীনচরিত্রা দৃষ্ট হয়, মুসলমান রমণীগণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। মুসলমান জাতি স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত অনাদর এবং অবিশ্বাস করিয়া থাকে; চীন দেশের মুসলমান-দিগের এরূপ বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকের আত্মা নাই, তাহাদের প্রতি আর কি সম্মান করিবে?

যে সহোদর সহোদরা এক জননীর পবিত্র অঙ্কে বসিয়া স্তন্যপান করিয়াছে, তাহাদের সমাজে সেই ভ্রাতা ভগিনীরও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একত্র সহবাস ও আলাপাদি করা নিষিদ্ধ, এ রূপ হীন প্রথাকে শত শত ধিক্। অত্রত্য একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার ঘটনা-ক্রমে পরিচয় হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের অন্তঃপুরে পুরুষ মাত্র ভৃত্য কখনও থাকিতে পারে না; পাঁচজন পুরুষ মাত্র আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে—পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র এবং মাতুল (মাতার সহোদর ভাই হওয়া আবশ্যক)। অথচ ব্যভিচার স্রোত সেরূপ স্থলেও অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত আছে। বর্ত্তমান স্ত্রীস্বাধীনতার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, অতএব স্ত্রীস্বাধীনতার আঘাতে অবরোধ-প্রথা অনেক ভঙ্গ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে কিয়ৎ পরিমাণে অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিবার প্রয়োজনও উপস্থিত হইয়াছে, কেন না অবরোধ-বন্ধন শিথিল না হইলে উচ্চাঙ্গের স্ত্রী-শিক্ষা কোন রূপেই সংসাধিত হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া অদ্য পর্য্যন্তও একেবারে অবরোধ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই।

দেশ এখন পর্য্যন্তও এতদূর উন্নত হয় নাই যে কোথাও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইবার আশঙ্কা নাই। সভ্য দেশে এক জন যুবতী স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে স্থানান্তর গমনাগমন করিতেছে, ভদ্র ব্যবহার ভিন্ন কোথাও তাহাদের প্রতি অত্যাচারের আশঙ্কা নাই, কিন্তু আমাদের দেশে ওরূপ স্থলে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা কাহারই অবিদিত নাই। তীর্থ-যাত্রীদের মুখে যুবতী স্ত্রীগণের অপমানিতা হইবার কথা অনেক শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়। অতএব এ সময়ে অল্পে অল্পে অবরোধ-বন্ধন শিথিল করিয়া আত্মীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সমভিব্যাহারে প্রকাশ্যে গমনাগমন করিলেও হানি নাই, কিন্তু সাধারণ রমণীগণের পক্ষে একাকিনী অবরোধ বহির্গতা হওয়া উচিত নয়। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী কোনরূপে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহির হইলে যেরূপ দুর্ব্বলপক্ষ বশতঃ উপযুক্তরূপ উড্ডীন হইতে না পারিয়া দুষ্ট মার্জ্জার দ্বারা প্রাণে বিনষ্ট হয়, তাহাদেরও দুষ্ট লোক দ্বারা তদ্রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া বড় অসম্ভব নয়। ইংরাজ জাতি অতিশয় সভ্য বটেন, কিন্তু সেই সভ্য জাতির অনেক অসভ্য পশুতুল্য ব্যক্তি ভারতের একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের দ্বারা রেলগাড়ি ইত্যাদিতে বঙ্গ রমণীগণের প্রতি অনেক অত্যাচারের সংবাদ সময় সময় শ্রবণ করা যায়। কত কত উচ্চপদস্থ ইংরাজ সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতি যে সময় সময় ভীষণ অত্যাচার করিয়া গিয়াছে তাহা শুনিলে ভয়ে হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠে। যখন কত কত নীচাশয় ইংরাজ বাঙ্গালিকে খুন করিয়া স্বচ্ছন্দে পার পাইয়া যাইতেছে, তখন কি তাহারা একজন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে ভয় পাইবে? তেমন এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর মেয়েও যদি বিলাতের ধোপা নাপিতের ছেলের হাতে অপমানিতা হইয়া বিচার-প্রার্থিনী হন তবে কি হইবে? সেই অত্যাচারীই শ্বেত চর্ম্মের গুণে স্বজাতি কিম্বা সম্পূর্ণ ইংরাজমুখাপেক্ষী বিচারপতির ন্যায় বিচারের গুণে অবাধে মুক্তি পাইবেন, মিথ্যা অভিযোগাপরাধে বাদিনীর শাস্তি হওয়াও বড় অসম্ভব নয়। এই সমস্ত দেশ কাল বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্ট হইতেছে আজও অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিবার সম্পূর্ণ সময় উপস্থিত হয় নাই; যাঁহাদের অবস্থা ভাল, সহায় সম্পদ অধিক, তাঁহারা অনায়াসেই স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন সাধারণ

রমণীগণের এখনও বাহির হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। অমূল্য কুলমান বিনিময় করিয়া কোন্ রমণী স্বাধীনতা ক্রয় করিতে বাসনা করিতে পারেন? উপসংহারে বলা যাইতেছে যে, বঙ্গবামাগণ অবরোধ ভঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া যতদূর সাধ্য আপনাপন অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করুন, দয়া ধর্ম্ম বিদ্যা জ্ঞান পবিত্রতা ইত্যাদি বিবিধ সদ্‌গুণ সমূহে ভূষিতা হইয়া এক একটী দেবী হউন, কেহই আপনাদিগের ন্যায্যাধিকারে বঞ্চিত রাখিতে পারিবে না। ভারতসন্তানগণ দিন দিন যেরূপ উন্নতি এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে ভারতরমণীর প্রতি কোন নীচাশয় আর অধিক দিন অত্যাচার করিয়া সারিয়া যাইতে পারিবে না। ঈশ্বর সমীপে মনে প্রাণে এই কামনা করি যে ভারতের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন হউক; দেশীয়গণ উচ্চ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হউন, দেশের শাসনভার প্রচুর পরিমাণে দেশীয়দের প্রতি সমর্পিত হউক, দেখিবে অরুণোদয়ে অন্ধকার যেরূপ পলায়ন করে, সেইরূপ আপনা আপনিই অবরোধ-প্রথা শিথিল হইয়া যাইবে। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া যাহাতে সেই শুভদিন শীঘ্র সমাগত হয়, তদ্বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি, এস, বদ্ধপরিকর হইয়া চেষ্টা করি। "সাধনায় সিদ্ধি ফলে"—দেখি ভারতের এই দুর্ব্বল অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন হয় কি না। রমণীগণ সমাজের অর্দ্ধাঙ্গতুল্য; দেশ এক পায়ে কখনই দাঁড়াইতে পারিবে না। সমস্ত স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিলে অবশ্যই দেশের এবং সমস্ত রমণীসমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে। এখন অন্তঃপুরটী যাহাতে কলহ পরনিন্দা অসদালাপ এবং তাসক্রীড়ার প্রিয় নিকেতন না হইয়া সদালাপ ধর্ম্মালোচনা এবং পরোপকারের আগার হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হওয়া প্রত্যেক বঙ্গরমণীর একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে অন্তঃপুরে বাস করিয়াও যথার্থ আত্মার স্বাধীনতা জন্মিতে পারে, বিদ্যাশিক্ষা সুচারুরূপে সাধিত হয়, তদনুরূপ চেষ্টা করিতে শিক্ষিতা বঙ্গরমণী মাত্রেরই অধিকার আছে।

প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ। *

প্রাচীন ভারতের স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর সহিত বর্ত্তমান কালের স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী তুলনা করায় অনেক উপকার আছে; কিন্তু এ বিষয় আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা সম্যক বুঝা আবশ্যক। প্রাচীন ইতিহাস ভিন্ন এ বিষয় জানিবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসই বা প্রকৃত রূপ কোথায় মিলিবে? রামায়ণ মহাভারত আদিকে সম্পূর্ণ ইতিহাস বলিতে পারি না,—কুমার, শকুন্তলা ইত্যাদি নাটক ও খণ্ডকাব্যাদিকে ইতিহাস বলিতে পারি না; তবে প্রাচীন স্ত্রীশিক্ষার স্পষ্ট-বিবরণ কোথায় পাইব? তৎসাময়িক কাব্য ও নাটকাদিতে এবং রামায়ণ মহাভারতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই একআধটুকু জানি মাত্র। কিন্তু ভাবান্তরিত গ্রন্থে অধিক জানিবার আশা বৃথা; সংস্কৃতানুশীলন ব্যতীত সম্যক অবগতি কখনই সম্ভবে না। যাহা হউক, ছেলেবেলা যখন উপকথা শুনিবার জন্য বৃদ্ধা ঠাকুরাণীদিদিদের চরকা ঘুরান ও মালা জপার বিঘ্ন হইয়া তাহাদের নিকট উপকথা শুনিতে বসিয়াছি, তখন দুচারিটি গল্প শুনিয়াছি। সেই উপকথা গুলির মধ্যে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী খনা ইত্যাদি ভারতললাম রমণীগণের বিষয় ছিল, তাই মনের সেই কাচা ছাঁচে তাহা রহিয়া গিয়াছে, আর ভুলা যায় না।

প্রথমতঃ প্রাচীনকাল কি, তদ্বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি বৈদিক ও পুরাণকাল এবং বর্ত্তমান সময়ের (স্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রচলন হওয়ার) পূর্ব্ববর্ত্তী কালকেই প্রাচীন নামে নির্দ্দেশ করিলাম। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষা কাহাকে বলে দেখা উচিত। আমার মতে কেবল বিদ্যা শিক্ষাকেই স্ত্রীশিক্ষা

---

* সন ১২৯০ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৫ম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ গুলির মধ্যে এবারেও শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী-লিখিত এই প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে আমাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

বলা যাইতে পারে না। বিদ্যা, শিল্প, গৃহকার্য্য, সন্তানপালন, পিতা, মাতা, শ্বশ্রু, স্বামী ইত্যাদির সেবা; অতিথিসৎকার ইত্যাদি স্ত্রীলোকের সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়কেই স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে। অতএব প্রাচীনকালে এসমস্ত বিষয়ে স্ত্রীগণ কিরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন, তাহাই এস্থলে উল্লেখযোগ্য মনে করি।

অনেকের মনে এই প্রকার সংস্কার আছে যে, ইংরেজদের দৃষ্টান্তানুসারেই স্ত্রীশিক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; পূর্ব্বকালে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভ্রম। প্রাচীন ঋষিবচনে লেখা আছে "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। এই বচনটির ভাব অনেকে হয়ত কল্পনা করিতে পারেন যে, শিক্ষাশব্দে বিদ্যাশিক্ষা বুঝাইল তাহার প্রমাণ কি? বাস্তবিক তাহার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু বাক্যের প্রমাণ তাহাদের কার্য্য।

উল্লিখিত আছে, দুরূহ শাস্ত্র—বেদ ভিন্ন স্ত্রীগণ সমুদয় শাস্ত্রেই অধিকারিণী; কিন্তু অন্যত্র দেখা যাইতেছে যে, গার্গি প্রভৃতি কতিপয় ঋষিপত্নী বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অনেক সময় স্ত্রীলোকদিগকে বেদে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভবভূতি-প্রণীত উত্তরচরিত নাটকে দেখা যায়, একজন তাপসী বেদ অধ্যয়ন জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিতেছেন; তাঁহারই কৃত মালতী মাধব নাটকে কামন্দকী নাম্নী একটি অসাধারণ স্ত্রীলোকের চরিত্র বর্ণিত আছে, তিনি ভূরিবসু নামক রাজমন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী ছিলেন; এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কামন্দকী বৌদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তখন বৌদ্ধা ছিলেন না।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে একটি বিদুষী রমণীর উল্লেখ আছে, তাহাকে লোকে পণ্ডিত-কৌশিকী বলিত।

অতি প্রাচীন সময়ে স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই সমানরূপ বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। পার্ব্বতী বাল্যকালেই বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীদেবী প্রণীত মিতাক্ষর টীকা আজিও প্রচলিত আছে।

লীলাবতী ও খনা অসামান্য বিদ্যাবতী ছিলেন, তাঁহাদের নাম চিরকাল থাকিবে সন্দেহ নাই। খনার বচন সকল সর্ব্ব দেশে প্রচলিত আছে; লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে কিরূপ অসাধারণ ব্যুৎপত্তিশালিনী ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন।

বল্লালসেনের পুত্রবধূ লক্ষ্মণসেনের মহিষী কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এরূপ প্রবাদ আছে; তিনি একদা স্বামীবিরহে কাতর হইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল ধৌত করিতে করিতে মাটিতে লিখিয়াছিলেন—

"পতত্যবিরতং বারির্নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্ত কৃতান্তোবা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি ॥"

বল্লালসেন তাহা দেখিতে পাইয়া পুত্রকে বাড়ী আনাইয়াছিলেন।

শঙ্করবিজয়গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মিশ্রপত্নী সারসবাণী তাঁহাদের বিচারের মধ্যস্থা হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কর্ণাটদেশের রাজমহিষী কবিত্ব বিষয়ে মহাকবি কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন।

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রৌপদী অসাধারণ জ্ঞানবতী রমণী ছিলেন; তিনি বনমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি বিষয়ে সর্ব্বদা পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারই পরামর্শে অর্জ্জুন ইন্দ্রালয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অদ্বিতীয় বীর বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে রমণীগণ গার্হস্থ্য বিষয়ে কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয় পুরাণাদি আলোচনা করিলে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়, স্ত্রীলোকের পক্ষে সমস্ত গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ছিল, বহ্নি পুরাণে তাহার একটি সুন্দর সংগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

"সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং গুরুং,
প্রাঙ্গণেমণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা।
গৃহকৃত্যং চ কৃত্বাচ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী,
গুরুং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্ গৃহদেবতাং।
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী,
অতিথিন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী।"

এই সমস্ত ব্যতীতও স্ত্রীলোকের অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়ে নিষ্পাপ হইবে; শ্বশ্রূ শ্বশুর পিতা মাতার সেবা, দেবরাদির প্রতিপালন করিবে ইত্যাদি, এবং সমস্ত গৃহকার্য্যাদি যাহাতে সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন তদনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত।

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রৌপদী রাজমহিষী হইয়াও গৃহকার্য্য বিষয়ে বিলক্ষণ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালীন রমণীগণের প্রধান শিক্ষণীয় ও কর্ত্তব্য বিষয় ছিল, পতি-সেবা, দ্বিতীয় গৃহকার্য্যাদি। সন্তানপালন রূপ কঠিন কার্য্য সম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে হইত, মনু বচনে আছে—

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং॥"

কবিদিগের সময়ে স্ত্রীগণের আরও একটি বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাম কলা-বিদ্যা; সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকেই এই বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত।

ঋষিদিগের সময়ে এই সকল বিলাসিতা ছিল না, কিন্তু কবিদিগের সময়ে যখন আর্য্যগণ পূর্ব্বস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছিলেন, তখনই নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা রমণীগণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি ব্যাস একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥"

কিন্তু কালিদাসের রঘুবংশের অজবিলাপ প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে অজরাজ স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী ইন্দুমতীর শোকে বিলাপ করিয়া বলিতেছেন

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতং॥"

এই দুইটি শ্লোকের মধ্যে প্রথমটিতে ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা, দ্বিতীয়টিতে ললিতে কলাবিধৌ এই বিশেষণটি অধিক আছে, ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে ঋষিদিগের সময়ে নৃত্য গীতাদি শিক্ষা চলিত ছিল না। আবার ছায়েবা-

অনুগতা এই বাক্যটিতে দেখা যাইতেছে তৎসময়ে নারীগণ স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিতেন।

প্রচীন ভারতীয় অঙ্গনাগণ যেরূপ অতিথিসেবা, স্বামীসেবা, গৃহকার্য্যাদি শিক্ষা করিতেন, সেই প্রকার তাঁহারা তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কেন না, সে কালের নিয়মই এই ছিল যে, রাজ-পত্নী হইলেও তিনি স্বামীসেবা ও গৃহকার্য্যাদির ভার দাসদাসীদের হাতে দিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

পূর্ব্বেই দ্রৌপদীর নামোল্লেখ করা গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, তিনি বনমধ্যে দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে স্বহস্তে পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ভ্রম। কেন না, তিনি অরণ্যে যেরূপ, রাজভবনেও সেরূপ এসমস্ত কর্ত্তব্য পালনে যত্নবতী ছিলেন, পাকবিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। ভোজদুহিতা কুন্তীও বালিকাকালে রাজকন্যা হইয়াও অতিথি সেবায় নিরন্তর নিযুক্তা থাকিতেন।

এমন কি, এই বর্ত্তমান কালের একশত-বর্ষ পূর্ব্বকালবর্ত্তিনী রমণীগণই স্বহস্তে গৃহকার্য্যাদি ও অতিথিসেবাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, স্বামী, স্বামীর বন্ধু ও পরিবারবর্গ এবং অমাত্যবর্গকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া তার পর নিজে আহার করিতেন। পুরাণ চর্চ্চা করিলে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে, পৌরাণিক সময়ে নারীগণ পতির সাংসারিক আয় ব্যয় বিষয়েও চিন্তা করিতেন। স্মৃতি-সংহিতায় বর্ণিত আছে যে, সাধ্বী স্ত্রী সমস্ত দিন প্রফুল্লমনে পরিষ্কৃতা থাকিয়া সাংসারিক এই সমস্ত কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় বিষয়ে চিন্তা করিবেন।

স্বামীর ধন রক্ষা বিষয়েও তাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, সভ্যতার নবীনালোকে আলোকিত চক্ষে এই চিত্রটি অতি কদর্য্য দেখাইবে সন্দেহ নাই, কেন না, স্ত্রীগণ সমস্ত দিন বই কাগজ কলম লইয়া না থাকিয়া সারাদিন ঘরকন্না করিবে, এটি আজি কালি সকলেরই ক্লেশজনক সন্দেহ নাই ; কিন্তু তৎকালে এরূপ শিক্ষাই প্রচলিত ছিল ; এলে, বিএ, পাশ করাই সে কালকার রীতি ছিল না।

স্বামী, গুরুজন, দেবতা, দ্বিজ, অতিথি, বিপন্নজীবাদি, এমন কি গৃহপালিত

বিড়াল কুকুরের তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত স্ত্রীবেচারীর করিতে হইত; অথচ তাহার মধ্যে ২।৪ জন আবার প্রচুর জ্ঞানবতী ছিলেন; ইহা প্রাচীন ললনাগণের অল্প গৌরবের বিষয় নয়।

শাস্ত্রে আছে যে, "সাধ্বী স্ত্রী হেতুকী স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয় রাখিবেন না।" এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, আজি কালিকার সভ্যদেশবাসী অনেকানেক পণ্ডিতের হেতুবাদ তৎকালে ২।৪ জন রমণীতেও ছিল, এই নাস্তিকতার আমি প্রশংসা করিতেছি এরূপ যেন কাহারও ভ্রম না হয়, স্ত্রীগণ কতদূর চিন্তা করিতে সমর্থ হইতেন তাহাই প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ সম্পন্ন হইতেছে, এবং তাহা প্রাচীন কালের তুলনায় ভাল কি মন্দ, তৎসম্বন্ধে দুচারি কথা বলিতেছি। এখনকার স্ত্রীশিক্ষার কোন স্থিরতা দেখিতেছি না। সকলেই আপন আপন রুচি অনুসারে স্ত্রী কন্যার শিক্ষা বিধান করিতেছেন; আমি দেখিতেছি রমণীগণ ময়দা ছানা হইতেছেন; কাহার হাতে কিরূপ গড়ন প্রাপ্ত হইবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। এক একজন এক এক ছাঁচে গড়া যাইতেছেন। পূর্ব্ব কালীন নারীগণের ন্যায় ইঁহারা বালিকা কাল হইতে গার্হস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন না; সুতরাং সময়ে সময়ে ইঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে নিতান্ত অপটু দৃষ্ট হয়, বালিকাগণ ভাল ভাল গহনা বস্ত্র পরিয়া যথারীতি বালিকা বিদ্যালয়ে আসে যায়, লেখা পড়া যত শিক্ষা হউক না হউক গৃহ কার্য্যাদি কিছুই শিক্ষা হইয়া উঠে না, দশম একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে আবার স্কুল ছাড়িয়া বিবাহিতা হইতে হয় এবং সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া তখন হাবু ডুবু খাওয়া সার হয় মাত্র।

আজ কালি যদিও কতিপয় বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারিণী রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি দ্বারা ভূষিতা হইয়া বঙ্গ রমণীর গৌরবস্থল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কয় জনের পিতা মাতার অবস্থা তাঁহাদের পিতা মাতার ন্যায়, এবং কয় জনের অভিভাবকের মত তাঁহাদের অভিভাবকের মতের ন্যায় স্থির। কিন্তু ওরূপ শিক্ষা সচরাচর হউক না হউক, গৃহ কার্য্যে অপটু, অতিথি ও গুরুজন সেবায় অধৈর্য্যা, রোগীর সেবায় পরাঙ্মুখা কন্যারত্ন প্রস্তুত করিতে অনেক পিতা মাতাই বিলক্ষণ পারগ

হইতেছেন। অনেকে মনে করেন কন্যা একটুকু বাঙ্গালা, আধটুকু ইংরেজী ছুচারিটি কার্পেটের পেটন তোলা ও একটু আলাপাদি করিতে পারিলেই শিক্ষা দানের একশেষ হইল। নারীজীবনের গুরুতর দায়িত্ব বুঝাইয়া কয়জন পিতা মাতা ও কয়জন স্বামী আপন আপন স্ত্রী কন্যাকে শিক্ষা দিয়া আসেন? প্রাচীন কালীন্ আর্য্য মহিলাদিগের মন যেমন অবিচলিত ছিল, তাহা নবীনা-গণের শিক্ষণীয় সন্দেহ নাই। সাবিত্রী স্থির জানিতেন যে এক বৎসর মধ্যে তাঁহার ভাবী পতি সত্যবান মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইবেন, তথাপি তাঁহার সঙ্কল্প ঠিক—বৈধব্য স্বীকার তথাপি অন্য বরে আত্ম সমর্পণ করিলেন না, অধুনা এ প্রকার সৎদৃষ্টান্ত বিরল। অতি পূর্ব্বকালে রমণীগণ বিলক্ষণ সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। এরূপ বহুতর প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তীকাল হইতে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান বাজগণের রাজত্বই সর্ব্ব প্রকারে ভারত রমণীর দুরবস্থার কারণ সন্দেহ নাই। "লেখা পড়া শিক্ষা দিলে স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী হইবে, বিধবা হইবে" ইত্যাদি নানা প্রকার কুসংস্কার পূর্ণ বাক্য তৎসময়েই প্রচলিত ছিল। কিন্তু গৃহকার্য্যাদি বিষয়ে সেই সময়েও শিক্ষা দেওয়া হইত।

পূর্ব্বকালে রাজকন্যাগণ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিয়া বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, এবং উপযুক্ত বয়সে মনোনীত বরে আত্ম সমর্পণ করিতেন। ঋষিকন্যাগণও প্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত পিতৃ-কুটীরে বাস করিয়া অতিথি সেবাদি কার্য্য ও নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন, স্বামী এবং অন্যান্য পরিজন প্রতি কর্ত্তব্য ও সাংসারিক কার্য্যাদি তাঁহারা কুমারী কালেই উত্তম-রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। শকুন্তলা যখন স্বামী সদনে গমন করেন তখন মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে যেসকল সুন্দর সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন।

মহর্ষি অগস্ত্য একটি দুই বৎসরের বালিকাকে কোথা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া এক রাজবাটীতে শিক্ষা জন্য রাখিয়াছিলেন, পরে সেই কন্যা নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইয়া যৌবন প্রাপ্তা হইলে, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই নাম সুধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা ছিল, তিনি রমণী-কুললাম

ছিলেন। পূর্ব্বকালেও বর্ত্তমান কালের ন্যায় রমণীগণ যুদ্ধ এবং রাজকার্য্য বিষয়ে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছেন এরূপ বড় দৃষ্ট হয় না, তবে পূর্ব্ব-কালীন দুই চারি জন রমণীও বর্ত্তমান কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তিকালের দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাই ইত্যাদি কতিপয় রমণী যুদ্ধ কার্য্যে এবং রাণী ভবানী অহল্যাবাই ইত্যাদি কতিপয় রমণী রাজকার্য্যে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করিয়া স্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন।

দেখা যায়, আর্য্যাদের মনে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে সংসার-ধর্ম্মের প্রধান সহায় রমণীগণ, অন্যান্য শিক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ না হইতে পারিলেও বিশেষ হানি নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে নির্ম্মলচরিত্রা ও ধর্ম্মশীলা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তদনুসারে তাঁহারা রমণীগণকে যথাসাধ্য ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করি-তেন। স্ত্রীর নাম ছিল সহধর্ম্মিণী। স্বামীর সহিত তাঁহাকে প্রত্যেক ধর্ম্ম কার্য্যে যোগ দান করিতে হইত। অধিক কি বালিকাগণকেও খেলার ছলে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা হইত। প্রাচীন রমণীগণই বোধ করি সেই সমস্ত ব্রতের রচয়িত্রী ছিলেন।

'মাঘ মণ্ডল' 'পুণি পুকুর' 'যম পুকুর' ইত্যাদি ব্রতগুলি খেলাচ্ছলে ধর্ম্মোপ-দেশপূর্ণ; বালিকা কাল হইতেই এ প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রমণীগণ দেবীর ন্যায় সংসারে বিরাজ করিতেন। খেলার মধ্যেও নানা প্রকার সুনীতি-পূর্ণ স্ত্রী কবিতা ছিল; যথা "পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই, সীতার মত সতী হই, গঙ্গার মত শীতলা হই" ইত্যাদি; এই প্রকার শিক্ষায় যে এক সময় বিলক্ষণ সুফল ফলিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি কালি বালিকাগণ যে ইংরেজী রীতির অনুকরণ করিয়া জন্মদিনে সঙ্গিনীগণ সহ ভোজন ও আমোদ করেন তাহা কি উল্লিখিত ব্রতাদির ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়ে হিতকরী? ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কি অর্থশূন্য আমোদ শ্রেষ্ঠ? যদ্দ্বারা খেলাচ্ছলে আমোদের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজনীতি শিক্ষা হইত তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিব না কেবল লুকোচুরি দৌড়া-দৌড়ি ও তাস পাশা চৌপাড়কেই শ্রেষ্ঠ বলিব?

পূর্ব্বকালের রমণীগণ যে বিবিধ শিল্পনৈপুণ্যও শিক্ষা করিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, যদিও তাঁহাদের উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন শিল্পের নাম করিতে পারিব না বটে, সাধারণ বহুতর শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যখন দেবীর ন্যায় পবিত্রা হইয়াও দাসী হইতে দাসীভাবে স্বামীর চরণ সেবা করিব, পিতার চরণ পূজা করিব, সমস্ত পুরুষ জাতিকে সম্মান করিব, তখন প্রফুল্ল মনে হাসিতে থাকিব। ভারতরমণীর সে দিন দেখিলে হাসিব, না হইলে এ পোড়া মুখে শুধু সাম্যভাবে হাসি আসিবে না।

এখন আপনারা আমাদিগকে অনেক স্থলে বিবিয়ানা শিক্ষা দিয়া থাকেন, দেশীয় অনেক সুরীতি পরিত্যাগ করাইয়া বিলাতি বহুতর কুরীতি যত্নসহকারে শিখাইয়া থাকেন; এ কি সুলক্ষণ? বিলাতি ভালরীতি স্বচ্ছন্দে শিক্ষা প্রদান করুন; তাহা বলিয়া দেশীয় সুরীতি কেন পরিত্যাগ করাইবেন? সীতা রাজ-কন্যা রাজবধূ হইয়া স্বচ্ছন্দে স্বামী সমভিব্যাহারে বনগামিনী হইলেন, কত সুখ—কত প্রলোভন স্বামীর প্রতিজ্ঞা পালন জন্য পরিত্যাগ করিলেন, আর আমরা বিবিরা কি না স্বামী যদি 'পিতার পরিবার' বৃদ্ধ মাতাকে দশটি টাকা দিয়া গঙ্গাবাসের সহায়তা করেন, আর তাহাতে আমাদের বাবুগিরির যদি কিঞ্চিৎ ত্রুটি হয়, তবে আমরা সৃষ্টি-প্রলয় আরম্ভ করি, দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া স্বামীরূপ মহাদেবের মহা আতঙ্কের কারণ হই!

তাই বলিতেছি, আধুনিক শিক্ষা প্রাচীন শিক্ষার ন্যায় আমাদের দেশোপযোগী হইতেছে না। সাহেবি ধরণে শিক্ষা হইতেছে, পুরুষগণ সাহেব ও রমণীগণ বিবি সাজিতেছেন। কিন্তু হায়!

"সোণা দিয়ে বাঁধা কাকটার ডানা
মাণিকে জড়াণো হোক তার পা দুখানা
এক এক পক্ষে তার গজ মুক্তা থাক
রাজহংস নয় কভু তবুও সে কাক।"

ইংরাজেরা তবুও আমাদিগকে সম্পূর্ণ নেটিভ বলিয়া ঘৃণা করে—এত করিয়াও পোড়া নেটিভ নাম ঘুচিল না। তবে আর আর্য্য নামে কলঙ্ক দিয়া কাজ কি? ভারত কোন বিষয়ে কোন কালে হীন ছিলেন না, আজিই ভারতপুত্র ও ভারতকন্যাগণ কিসে কম? স্ত্রী শিক্ষা বিষয়েও ভারতএমেরিকার তুল্য না হউক, কিন্তু অনেক দেশাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল সন্দেহ নাই। যখন এখনকার সভ্য দেশ সকলের মনুষ্যগণ তরু-কোটরে অবস্থিতি করিতেন, তখনই ভারতমহিলা শস্ত্রানুশীলন করিতেন। তবে

আর্য্য রমণীগণের শিক্ষা আদর্শ রাখিয়া স্ত্রী শিক্ষা দিলে কি চলিতে পারে না? মেয়ে কি সাহেবের নিকট বিয়ে দিবে যে বিবি না হইলে চলিবে না? বাছা সকল, সীতা হও, সাবিত্রী হও, খনা হও, লীলাবতী হও, কিন্তু বিবি সাজিও না। মিস কার্পেন্টারাদি মহামান্যা ইংরেজ রমণীগণের ন্যায় চরিত্রশালিনী হও, সন্তুষ্ট হইব, কিন্তু কেবল বিবিদিগের বিলাসিতার অনুকরণ শিখিলে প্রশংসা হইবে না।

বর্ত্তমান কালে বিলক্ষণ স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইতেছে না। এই শিক্ষা যখন দেশীয় সুরীতি বজায় রাখিয়া ও বিদেশীয় সুরীতি গ্রহণ করিয়া সাধিত হইবে, তখনই ভারতললনার প্রকৃত সুশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে বলা যাইবে।

পূর্ব্বকালবর্ত্তিনী রমণীগণ নৃত্য গীতাদি কলাবিদ্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন এ কথা স্থলান্তরে বলা গিয়াছে। এই নৃত্যগীত শিক্ষা ইংরেজ মহিলাগণের একটি সাধারণ শিক্ষা মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের সকলকেই এ বিদ্যা দুইটি শিক্ষা করিতে হয়। নৃত্য শিক্ষার প্রয়োজন কিছুই দেখা যাইতেছে না; কিন্তু প্রত্যেক রমণী সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করুন, এটি আমার একান্ত বাসনা।

সকলেই জানেন যে পরমেশ্বর নারীকণ্ঠ মধুময় করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সেই সুমধুর কণ্ঠে যদি ঈশ্বরের মধুময় নাম ও সদ্‌ভাবপূর্ণ অন্যান্য সঙ্গীত ঘরে ঘরে গীত হয়, তবে যে কত আনন্দ ও কত পবিত্রতা বৃদ্ধি হইবে বলা যায় না।

কোথাও যদি স্ত্রীলোক রামায়ণ গান করে, কিম্বা যাত্রার দলে যদি স্ত্রীলোক গায়িকা থাকে, তবে অসংখ্য অসংখ্য লোক সেই বার-নারীদিগের কণ্ঠ-নিঃসৃত গরল পান করিতে উপস্থিত হয়. খেমটা ও বাইগণের কদর্য্য অশ্লীল গান শুনিবার জন্যও আমাদের দেশের বড় বড় লোক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে নিজ ভবনে নিয়া নাচ গান করাইয়া থাকেন।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বামা-কণ্ঠ-গীতি শুনিতে লোকে বড় ভালবাসে, কিন্তু গৃহে সেই সুখ চরিতার্থ হয় না বলিয়া বাহিরে তাহা উপভোগ করিতে যায়। অতএব রমণীগণকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

অবকাশ সময় যদি উত্তম উত্তম সঙ্গীত করিয়া যাপন করেন তবে নিজেও অতি বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা অপরকে সুখী করিতে পারেন।

সঙ্গীত-বিদ্যার ন্যায় চিত্রবিদ্যাও বামাগণের একান্ত উপকারী। ভারতে পূর্ব্বকালে যে এই মহোপকারী চিত্র বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না, এ কথা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। যখন দেখিতেছি সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি এই ভগিনী ত্রয়ের কৌতুক নিবারণ জন্য ভূমিতে দশস্কন্ধ রাবণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, যখন দেখিতেছি লক্ষণ সীতা ও রামচন্দ্রকে আলেখ্য প্রদর্শন করাইতেছেন,—তাহা এরূপ যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে যে তাহা মুগ্ধস্বভাবা সীতা যথার্থ মনে করিতেছেন; তখন কিরূপে বলা যাইতে পারে যে এদেশে চিত্রবিদ্যার উন্নতি ছিল না। যখন দেখা যাইতেছে, রামগিরি নির্ব্বাসিত কুবেরানুচর যক্ষ স্বহস্তে পত্নীর বিরহশীর্ণ দেহলতা অঙ্কিত করিয়া আপনাকে তাহার চরণতলে স্থাপন করিতেছেন এবং দুষ্মন্ত স্বহস্তে শকুন্তলার হরিণ শাবক ও মালিনী নদী অঙ্কিত করিতেছেন, তখন স্পষ্ট প্রতীতি হয় ভারতে চিত্র-বিদ্যা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

ইংরেজদের দেশে অনেক অনেক রমণী চিত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয়। কিন্তু ভারত-ললনাদের মধ্যে এখন আর চিত্রের চর্চ্চা নাই এটি বড় দুঃখের বিষয়। চিত্র বিদ্যার ন্যায় পরমোপকারী ও সুকুমার বিদ্যা রমণীগণের অবশ্য শিক্ষা করা উচিত। বর্ত্তমান কালের সুরুচি-সম্পন্না ধনীর গৃহিণীগণ নানা প্রকার বিলাতি ছবিদ্বারা গৃহ-সজ্জা সাধন করিয়া থাকেন। নিজে তদ্রূপ উত্তম উত্তম ছবি অঙ্কিত করিতে পারিলে তাঁহাদিগের গৌরব ও আনন্দ উভয়ই বর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই!

পাক-বিদ্যায় ভারত রমণীগণ পূর্ব্বকালে অদ্বিতীয়া ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালের রমণীগণের বালিকাকাল হইতেই সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা এই

"হাতা বেড়ি ছাড়ি মাগো, পাঁজি পুথি ধরেছি,
মূর্খ নাম ঘুচাইব সার পণ করেছি।"

কেন হাতা বেড়ি ছুঁইলে কি সেই ময়লা হাতে পাঁজি পুথি ছোঁয়া যায় না? সকল কাজেরই নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিলে এত বড় মানব-জন্মটার মধ্যে

অনেক কাজ শিক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের দেশীয়া গৃহিণীগণ পূর্ব্বকালে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন। কিন্তু (দুঃখ ও লজ্জার বিষয়) কি বলিব, এক্ষণে অনেকে সাক্ষাৎ একাদশী হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

পাককার্য্য হীন মনে করিয়া তাহা বেতনভোগী পাচক ঠাকুর কিম্বা রাঁধুনি বামনীর হাতে সমর্পণ করা হয়; তাহারা নানা প্রকার অপরিষ্কার ভাবে আহারীয় জিনিষ প্রস্তুত করিয়া রোগ আনয়ন করিয়া থাকে। বায়ু সেবন, বারিপান ও আহার গ্রহণ এই ত্রিবিধ উপায়ে শরীর রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব পাকবিদ্যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা কদাপি সঙ্গত নহে। এই বিদ্যাটি কেবল উপকারীই নহে, বিলক্ষণ আমোদদায়ী। কোন আত্মীয়কে স্বহস্তে উত্তম উত্তম পাক করিয়া ভোজন করাইলে মনে একটি অনুপম আনন্দ হয় এবং তাহাতে অনেক স্থলে প্রচুর সুখ্যাতিও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বকালের রমণীগণ এই যশের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। বর্ত্তমান কালের রমণীগণ পাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যার জন্য সুখ্যাতি লাভ করিয়া সুখী হইতেছেন বটে, কিন্তু তথাপি পাককার্য্যও জীবন রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রত্যেক স্ত্রীলোকের তাহা সযত্নে শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমি লেখাপড়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাক করিবার পরামর্শ দিতেছি, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। আমার বক্তব্য এই যে এ কাজ ও শিক্ষা করিতে হইবে। যাঁহার অবস্থা ভাল তিনি বেতনভোগী লোকদ্বারা পাক করাইতে পারেন তাহাতে হানি কি? কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে, নিজে না জানিলে তাহাদিগকেও কিছু শিখান যায় না বা বলা যায় না। তাহারা যেরূপ প্রস্তুত করিয়া দিউক্ না কেন, তাহাই মহাপ্রসাদবৎ খাইতে হয়।

শাস্ত্রে লেখা থাকুক বা না থাকুক, পূর্ব্বকার লোকে বলিত যে 'শাস্ত্রে আছে পুরুষ যদি যুদ্ধকার্য্যকে ভয় করে এবং রমণীগণ পাককার্য্যকে ভয় করে তবে তাহাদের নরকগামী হইতে হয়।' আজিকালি ভারত সন্তান তীর ধনুক দেখিলে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েন, অঙ্গনাগণ কেন পাকে ভয় না করিবেন?

যবনাধিকার সময়ে ভারতে স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা প্রথা একেবারে রহিত হইয়াছিল, অধুনা ভারতসন্তানগণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোক-দিগেরও সেই দুর্দ্দিন দূর হইয়া শুভদিন সমাগত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে স্ত্রী শিক্ষার জন্য চেষ্টা হইতেছে, অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার সভা সকলের সাহায্যে রমণীগণ অন্তঃপুরে বসিয়াও নানা বিদ্যা অধ্যয়নে পরীক্ষা প্রদান করতঃ আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। স্বদেশ-হিতৈষী কৃতবিদ্য পুরুষগণ স্ত্রীলোকের হিতের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের যত্নেই বঙ্গরমণীগণ আজি বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায়ও কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া ভারত-ললনার গৌরবস্থল হইয়াছেন। যদি কৃতবিদ্যগণ কোথাও কোন প্রকার ভুল করেন তবে তাহা তাঁহাদের ভ্রম বলিব, কিন্তু কখনই তাঁহাদিগকে স্ত্রীলোকের পরমহিতৈষী বন্ধু বই আর কিছু বলিব না। তাঁহারা না বুঝিয়া যদি কিছু করেন সে ভারত ললনার মন্দ ভাগ্যের দোষ, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই।

অতি প্রাচীন কালের তুলনায় বর্ত্তমান কালে স্ত্রীশিক্ষা কোথাও উত্তম, কোথাও তদপেক্ষা অধম হইতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী-কাল অপেক্ষা আজি কালি যে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতি উত্তম, তদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ নাই।

এখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রকার আন্দোলন চলিতেছে, ইহার ফল অবশ্যই অতি হিতকর হইবে। ক্রমেই স্ত্রীশিক্ষার দোষ সমস্ত সংশোধিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে।

দয়া, সহিষ্ণুতা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, কোমলতা ইত্যাদি স্ত্রীসুলভ গুণে প্রাচীনকালের অঙ্গনাগণ যেরূপ ভূষিতা ছিলেন, বর্ত্তমানকালের রমণীগণ তদপেক্ষা হীন হন নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি;—চরিত্রবিষয়ে ভারতললনা আজিও পৃথিবীর আদর্শস্থানীয়া।

হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না।*

আমার বোধ হয়, বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত হিন্দু সন্তানগণ মুসলমান জাতির মধ্যেই প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন (অতি প্রাচীন কালের বিষয় বলিতেছি না) তৎপরে সভ্য, জ্ঞানবান ও সাম্যবাদি খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষের অধীপতি হইলে পর দেশীয়গণ দেখিলেন যে, ইংরাজ মহিলাগণ এক স্বামীর পরলোক গমনের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া পরমসুখে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন, অধিকন্তু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দু সন্তানগণ এমন অনেকানেক রমণীর বিষয় জানিতে পারিয়াছেন এবং পারিতেছেন যে তাহারা নিতান্ত বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইয়া, ২।৪টী সন্তান সন্ততি সত্বেও বিধবা হইয়া স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।

মুসলমান ও ইংরেজ জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত দেখিয়া এবং আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রেও মধ্যে মধ্যে ২।৪টী বিধবা বিবাহের কিম্বা দেবরাদি দ্বারা পুত্রোৎপাদনের বিষয় পাঠ করিয়া আর বর্ত্তমান কালের বহুতর বিধবাকে সতীত্ব রক্ষণে ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে অক্ষম দেখিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকদিগের মনে বিধবা বিবাহের অনুকূল ভাব জন্মে। তাঁহারা সভা করিয়া বক্তৃতাদি-দ্বারা এবং লেখনী চালনে এ মত সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা কেবল ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ তাঁহারা এ বিষয়ের পোষকতার জন্য বহুল পরিমাণে বিলাতের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সাম্যবাদ প্রয়োগ দ্বারা বিধবা বিবাহ উচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন; আর যাঁহারা ইংরেজী ভাষার ন্যায়, আর্য্য জাতির প্রাচীন উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়া হিন্দু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে

---

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ গুলির মধ্যে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী-লিখিত এই প্রবন্ধটী তৃতীয়বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে প্রতিশ্রুত উপহার প্রদত্ত হয়।

যাইয়া পুরাণাদি হইতেও বিধবা বিবাহের বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন। পর-ছুঃখকাতর বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থ পরদুঃখকাতরতায় বাধ্য হইয়াই বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য কি না তদ্বিষয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্বীয় মত যথেষ্ট প্রমাণিত ও প্রচারিত করিয়াছেন ; বিধবা বিবাহ যে কলিকালের জন্য শাস্ত্রসম্মত তদ্বিষয় তিনি যথাসাধ্য দেখাইয়াছেন; বহুবিবাহের প্রতিবাদ করিয়াও তিনি আপনার সুমহৎ হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন বটে।

অনেক বালবিধবা নানা প্রকার পাপানুষ্ঠান করাতে রাজবিধি দ্বারা সহ-গমন প্রথা রহিত হওয়ায় বহুমান্যাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বিধবা-গণের বিবাহ হওয়া উচিত বোধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই যে বিবাহ করাই বিধবাদিগের সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্ম ; না করিলে কোনরূপ প্রত্যবায় আছে ; এবং ভরসা করি শাস্ত্রেও মহর্ষি পরাশরাদি মুনি ঋষিগণ বিধবাগণের বিবাহাপেক্ষা যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যেরই অধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্যপালনই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। পরাশরোক্ত যে বচনটী কলিতে বিধবা বিবাহের প্রতিপোষক তাহাতেই বা কি বিবাহ, না ব্রহ্মচর্য্য কোনটীর অধিক প্রশংসা আছে দেখা যাউক। সেই বচনটী এই—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ,
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা,
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ।
তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধ কোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

স্বামী অনুদ্দিষ্ট হইলে, মরিলে, ক্লীব হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীগণ অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু যে নারী পতির মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন তিনি পরলোকে স্বর্গগামিনী হয়েন, আর যে নারী পতির সহগামিনী হন তিনি মানুষের শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে তৎসম কাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করেন।

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কেবল স্বামীর মৃত্যু হইলে নয়, আরও চারি স্থলে স্ত্রীগণের অন্য পতি গ্রহণ করিবার অনুমতি আছে; কিন্তু নীচ জাতি ভিন্ন পবিত্র আর্য্যবংশে এই পঞ্চ অবস্থার কোনটী ঘটিলেই আর বিবাহ হইতে দেখা যায় নাই।

নারদ সংহিতায় লিখিত আছে যে স্বামী অনুদ্দিষ্ট হইলে পর, ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী ৮ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিবে; কিন্তু সেই স্ত্রী যদি সন্তানবিহীনা হয়েন তবে মাত্র চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিবেন; এই প্রকার ক্ষত্রিয়া সন্তান না হইলে তিন বৎসর ও সন্তান হইলে ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবে; বৈশ্যা সন্তান হইলে চারি বৎসর নচেৎ দুই বৎসর প্রতীক্ষা করিবে ইত্যাদি।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিবাহ বিষয়ে মুসলমানদের ন্যায় প্রথা অবলম্বন করিলেও ২।১টী হিন্দুশাস্ত্রে নিষেধ নাই। তাই বলিয়া এমন পাপিষ্ঠা স্ত্রী কেহ আছেন কি যে সন্তানাদি হইয়া বিধবা হইলে, কিম্বা সন্তানাদি ত দূরের কথা, স্বামীর প্রতি একবার পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধা হইয়া আবার এই পঞ্চ স্থলে অন্য পুরুষের নিকট বিবাহিতা হইতে পারেন? যে রমণী সেরূপ কার্য্য করিতে পারে তাহাকে কুলবতী না বলিয়া কুলটার শ্রেণীতে গণনা করিলেই উত্তম হয়। সেই পাপিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া যে পাষণ্ড আবার সংসারধর্ম্ম পালনের আশা করে সেও ঘোরতর মূর্খ এবং পবিত্র প্রণয়ের অবমানকারী সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত নষ্টমৃতাদি স্বামীর পাঁচটি অবস্থা ঘটিলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার বিধি পরাশর সুস্পষ্টরূপে প্রদান করিয়াছেন এবং তদীয় মতই কলিতে আচরণীয়, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু এ সমস্ত অনুকূলতা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে নাই। মহাভারতের এক স্থানে এ বিষয়ের একটী উল্লেখ আছে মাত্র,—

"অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।

পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থকামবশানুগাম্।

নাগরাজ ঐরাবতের কন্যাতে ইরাবান নামে অর্জ্জুনের এক পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন, অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এতদ্বারা কলিকালে মহদ্বংশীয় প্রধান লোকের মধ্যেও বিধবা বিবাহের একটী দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু আবার একটু বিবেচনা করিলেই প্রতীত হয় যে তৎসময় অতি অলৌকিক ২।১টী অসভ্য প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের নিকট বিবাহিত হইয়াছিলেন এবং কুন্তী দেবী ধর্ম্মাদি দেবগণ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, এ গুলি অতি নিন্দিত কার্য্য সন্দেহ নাই। এতদপেক্ষা বালবিধবার বিবাহ হওয়া আর মন্দ কি! অর্জ্জুন নাগরাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদীয় গর্ভে যে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন মহাভারতে সেই পুত্র ঔরস নামেই উক্ত হইয়াছে; পর পর যুগে তদ্রূপপুত্র পৌনর্ভব নামে কথিত হইত; মহাভারতে লেখা আছে যে,

"অজানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্
জঘান সমরে শূরান্ রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ।"

অর্জ্জুন সেই ঔরস পুত্রকে হত জানিতে না পারিয়া ভীষ্ম রক্ষক পরাক্রান্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন। এস্থলে অন্যান্য যুগের পৌনর্ভব কলিতে যে ঔরস নামেই অভিহিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একটী সমাজ সুন্দর শৃঙ্খলভাবে গঠিত হইতে অনেক কালসাপেক্ষ। আর্য্য জাতির মধ্যেও আদিমাবস্থাতে নানা প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলাদি বিদ্যমান ছিল, পুরাণাদিতে প্রকাশিত আছে যে অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকদিগের যদিও সাধারণতঃ এক পতিই থাকিত কিন্তু তাহাদের মধ্যে ব্যভিচারিতা তত দূষণীয় ছিল না, আর পুত্র ব্যতিরেকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই এবং সংসারেও পুত্রাভাবে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, আর্য্যগণই এই বিশ্বাসের অধীন হইয়া অনেক সময় ন্যায়-

বিরুদ্ধ উপায়েও পুত্রোৎপাদন করাইয়াছেন মহাভারতে এ সকল দৃষ্টান্তের অপ্রতুলতা নাই। যুধিষ্ঠিরাদির জন্মবৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। ভীষ্ম-বিমাতা সত্যবতী পূর্ব্বে কুমারী কালে পরাশর মুনির সহযোগে অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পরম তেজস্বী এক পুত্র প্রসব করেন, সেই পুত্রই কালে বেদব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎপর আবার তিনি শান্তনু রাজার নিকট বিবাহিতা হইয়া দুই পুত্র প্রসব করেন; তাঁহার পুত্রগণও আবার অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে পর ব্যাসদেব সেই বিধবা ভ্রাতৃবধূগণের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম দেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমাজ এ সমস্ত নিন্দিত কার্য্যে ভ্রূক্ষেপও করিল না! হইতে পারে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় পূর্ব্বেও বড় লোকের ঘরে সকলি শোভা পাইত। আর রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ সমূহকে গল্প ব্যতীত যথার্থ ইতিহাস কখনই বলা যাইতে পারে না, প্রত্যুত তাহা যে অতিবর্ণনা ও গল্প মিশ্রিত তদ্বিষয়ে সন্দেহের অভাব। কিন্তু গল্পমিশ্রিত হইলেও তাহার সকল কথাই যে মিথ্যা এরূপ বলা যাইতে পারে না, এবং অন্ততঃ তৎকালের সমাজের অবস্থা নিশ্চয়ই তাহাতে চিত্রিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যভিচারের উল্লেখ করিয়াছি, আমার ও বর্ত্তমানকালীন লোকদিগের মতে তাহা ব্যভিচার হইলেও তৎসময় বোধ করি তাহা ব্যভিচার নামে উক্ত ও ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃণিত হইত না; আর পুত্রার্থেই সে সমস্ত অন্যায়াচরণ হইত মাত্র, কিন্তু মহাভারতাদিরও পূর্ব্ববর্ত্তীকালে স্পষ্টতঃ ব্যভিচারের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সমাজে আবার তাহাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইত!!

মহর্ষি দীর্ঘতমা এবং উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতু এই কুনিয়ম সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়া হিন্দু সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন; শ্বেতকেতু স্পষ্টতঃ এই ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত বাক্য প্রচার করেন যে "যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবে তাহার ভ্রূণহত্যা সমান মহাপাতক জন্মিবে আর যে পুরুষ স্ত্রীকে অতিক্রম করিবে তাহারও তদ্রূপ পাতকই হইবে।"

অতএব এ সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে আর্য্যদের আদিমাবস্থাতে ব্যভিচার দূষণীয় ছিল না, ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব বিষয়ে সমাজের সুশৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যভিচার-স্রোত নিবারিত ও স্বামী ভিন্ন অন্য দ্বারা

পুত্রোৎপাদন রহিত হওয়ার পরেই কলিকালের জন্য ঔরসাভাবে দত্তক অকৃত্রিম পুত্রের পরাশর ব্যবস্থা দিয়াছেন, ক্ষেত্রজ পুত্রেরও উল্লেখ থাকিলেও হিন্দু সন্তানগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ পুত্রের ন্যায় তাঁহারা কলিতে পরাশর মতে বিধবাদি স্ত্রীর পুনঃপরিণয়ের ব্যবস্থা থাকিলেও অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু-সন্তানগণ বিধবাগণের বিবাহাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের অধিক প্রশংসা দেখিয়া বিধবাগণকে বিবাহ না দিয়া ব্রহ্মচারিণী ও সহগামিনী করিবার জন্যই যত্নবান হইলেন। কিন্তু হায়! সকল ভাল কার্য্যেরই দুষ্টগণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে অপব্যবহার হইয়া থাকে। পরম পবিত্র সহ-গমন প্রথারও মধ্যে মধ্যে ভারি অপব্যবহার হইয়া থাকিত। শ্রবণ করা যায়, নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নাকি কখন কখন কোন কোন বিধবা রমণীকে পতির সহিত জ্বালাইয়া দেওয়া হইত! এবং কোন কোন ব্যভিচারিণী রমণীও নাকি বিধবা হইয়া সকল দুর্নাম দূর করিয়া পরম পবিত্র সতী নামে অভিহিতা হইবার আশায় স্বামীর সহ প্রচণ্ড দাহনে পুড়িয়া মরিত। আমার মতে শেষোক্ত সহমরণটী ত ভাল বই একটুও মন্দ বোধ হয় না; কেন না দুশ্চরিত্রাগণ পতির মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকিয়া ব্যভিচার স্রোতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিত সন্দেহ নাই, এমতাবস্থায় অসতী নাম ঘুচাইয়া সতী নাম ও অনন্ত স্বর্গের প্রলোভনে যে তাহারা মরিয়া উদ্ধার পাইত সে অতি উত্তম সন্দেহ নাই।

পতি-পুত্রহীনা স্ত্রীর জীবন ধারণ করা বড়ই কষ্টকর, তথাপি যাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মবল আছে—জীবিত থাকিয়া যিনি ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন, তাঁহার জীবন দেশের কি তদীয় নিজ জীবনের পক্ষে অনিষ্টকারক নয়। কিন্তু দুশ্চারিণী বিধবার জীবন নিজ ও অপর উভয় পক্ষেই অনিষ্টকারী। অমন বিষলতা জীবিতা থাকায় কাহার কি লাভ আমি ত বুঝিতে পারি না, কেবল কুলটা-আশ্রয়কারী লম্পটগণেরই মনে এরূপ দুশ্চারিণী বিধবাগণের মৃত্যুতে ক্লেশ হইতে পারে। আত্মা নষ্ট হওয়া অপেক্ষা শরীর নষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু অসতী কিম্বা সতী, যাহাকে কেন হউক না, তাহার অনিচ্ছায় বল

পূর্ব্বক সহগামিনী করা ন্যায় ও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ কি। আরও এক প্রকার কারণে বলপূর্ব্বক সতী দাহের বিষয় শুনা যায়—কোন সম্পত্তি-বান্ ব্যক্তি যদি অপুত্রকাবস্থায় স্ত্রী মাত্র রাখিয়া পরলোকগামী হইতেন তবে পাছে সেই বিধবা দত্তক গ্রহণ করিয়া স্বামীর বিত্তের উত্তরাধীকারিণী হয়েন এই আশঙ্কাতে পুত্রাভাবে সম্পত্তির উত্তরাধীকারীগণ পুরোহিত ও অন্যান্য ব্যক্তিকে অর্থাদি দ্বারা বশ করিয়া বিধবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে বল-পূর্ব্বক স্বামীর শবের সহিত চিতায় দাহন করিত। এ সকল জনশ্রুতি সত্য হইলে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অন্যের এরূপ হীন স্বার্থ লোভে এবং অপরের ইচ্ছায় সহগমন বড়ই অন্যায় বটে কিন্তু যে পতিগতপ্রাণা রমণী পতিশোকে পাগলিনী হইয়া হাস্যমুখে পতিশব বক্ষে ধারণ করিয়া জলন্ত চিতায় জ্বলিয়া মরিতেন সে দৃশ্য কি হৃদয়মুগ্ধকর! আহা! যে পবিত্র ক্ষেত্রে এই পবিত্র ব্যাপার সম্পন্ন হইত তাহাইবা কীদৃশ পুণ্য ক্ষেত্র। ধন্য ভারতবর্ষের বিশাল বক্ষ যথায় ধর্ম্মার্থে ও প্রণয়ের অনুরোধে শত শত অবলা প্রচণ্ড হুতাশনে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

সহমরণাপেক্ষা ও প্রণয়াতিশয্যের চরমসীমায় আর একপ্রকার অত্যা-শ্চর্য্য মৃত্যু সংঘটিত হইত তাহার নাম 'অনুমৃতা'। পূর্ব্বকালে মধ্যে মধ্যে দুই একটী পতিগতপ্রাণা রমণী স্বামীর মৃত্যু দর্শন বা শ্রবণ মাত্রই প্রবল শোকাধিক্যবশতঃ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন; তাহাদের কোমল প্রাণে পতি-শোকাস্ত্র প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই শেষ হইয়া যাইত, মরণের জন্য উহাদিগের অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইত না!

বর্ত্তমান কালে রাজশাসন দ্বারা সহগমন-প্রথা নিবারিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও পতিশোক সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকানেক রমণী নানা উপায়ে আত্মঘাতিনী হইয়া থাকেন।

কি পুত্র-শোকাতুরা জননী কিম্বা স্বামী শোক-কাতরা পত্নী সকলেরই হৃদয় বেদনা প্রশমিত করিবার জন্য একটী মহৌষধ রহিয়াছে—ধর্ম্মই মানব হৃদয়ের শোক তাপাদির একমাত্র মহৌষধ, যিনি ধর্ম্মাত্মা তাঁহার মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইতে পারে না, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিধবাগণের হৃদয়ের প্রচণ্ড অগ্নি অবশ্যই শীতল হইতে পারে—অগং স্বামী ভগবানের

চরণে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলে স্বামী শোক অবশ্যই অনেকাংশে নিবারিত হয়।

অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক, সাধারণভাবে বিবেচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে, পুরুষ যখন স্ত্রী বিয়োগে অন্যবার বিবাহ করেন, তখন স্ত্রীলোক কেন পতি বিয়োগে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অনেকস্থলে এমনও দেখা যায় যে পুত্র কন্যা এমন কি পৌত্র ও দৌহিত্রাদি সত্বে শেষ বয়সে, স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও পুরুষ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন. ৮।৯ বর্ষীয়া বালিকা কেন বিধবা হইয়া যাবজ্জীবন অবিবাহিতা থাকিবেন? পুরুষদিগের ঘোরতর পক্ষপাতিতাই এরূপ করিবার কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে নিঃস্বার্থপর ভারতীয় হিন্দু সন্তানগণ যখন পূর্ব্বকাল হইতেই বিধবাবিবাহ-প্রথা সমাজে প্রচলিত হইতে দেন নাই তখন কেবল স্বার্থপরতা-পরিচালিত হইয়াই যে তাঁহারা বিধবাবিবাহ হইতে দেন নাই একথা কোন্ মুখে বলা যায়? তাঁহাদের মনে কোন উচ্চাভিপ্রায় ছিল কিনা দেখা উচিত, প্রাচীন কালের হিন্দু সন্তানগণ মুখে মুখে স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া অনবরত চীৎকার না করিলেও তাঁহারা যে স্ত্রীলোকদিগকে অতি উচ্চ দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন তাহার সহস্র প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। "যে গৃহে স্ত্রীলোক সকল অনাদৃতা হয় সেই গৃহে দেবতাও অপ্রসন্ন থাকেন।"—ইত্যাদি বাক্য প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, কার্য্যেও অনেক দূর করিয়াছেন—তাঁহারা নিজেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও দেবীর ন্যায় পবিত্রা রমণীদিগকে বিধবা হইয়াও আবার বিবাহিতা হওত আজন্ম সংসার কূপে ডুবিয়া থাকা বড় উত্তম মনে করিতেন না; তাঁহারা নিজেরাইত সংসারধর্ম্ম পালনাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যাচরণেই অধিক অনুরক্ত ছিলেন; সুতরাং পরাশরমতে কলিতে বিধবাদি স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ সম্মত হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সহগমন ও ব্রহ্মচর্য্যই প্রচলন করিলেন। একজন ৫০ বর্ষীয় পুত্র-পৌত্রবান হিন্দুকে স্ত্রী বিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিলে এবং হয়ত তদীয় একটি ৮ম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে ব্রহ্মচর্য্য-পালন অথবা স্থলান্তরে ব্রহ্মচর্য্যে অসমর্থা হইয়া ব্যভিচারপঙ্কে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া, নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট স্বার্থপরতা

প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই; বস্তুতও এই প্রকার অভিভাবক স্বার্থপরই বটেন। কিন্তু যাঁহারা প্রথমাবস্থায় হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন নাই, তাঁহাদিগকে স্বার্থপর কোনরূপেই বলা সঙ্গত নয়, তাঁহারা আপনারাও বৃদ্ধ বয়সে কিম্বা পুত্র থাকিলে আর দারপরিগ্রহ করিতেন না।

তাঁহারা যে সর্ব্ববিষয়ে বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ লোক হইতে সহস্রগুণে ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভারতবর্ষ মুসলমান জাতি দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া অবধিই হিন্দুদের নানা প্রকার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম ভাবেরও শিথিলতা ঘটিয়াছে; বোধ হয়, আর্য্যগণ যে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা ধর্ম্মসাধন ও তপোবনাশ্রম অধিক ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাদের মনে যে সংসারাসক্তি হইতে ধর্ম্মাসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই সেই প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক।

তৎকালে বর্ত্তমানকালের ন্যায় সাংসারিক সুখ মাত্র বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল না। অনেক হিন্দুসন্তান শুদ্ধ কার্য্যের সহায়তার জন্যই বিবাহ করিতেন, তজ্জন্যই প্রাচীন কাল হইতে স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী; অপরন্ত পুত্রার্থেও অধিকাংশ হিন্দুসন্তান বিবাহ করিতেন "পুত্র প্রয়োজনে ভার্য্যা," এ প্রাচীন কথা—সকলেই জানেন। পুত্র প্রয়োজনে বিবাহ করিলেও হিন্দু-সন্তানগণ সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই; অনেক তপোধন হিন্দুসন্তান আবার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বাদি দোষ ঘটিলেও পুনর্বিবাহ করিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে দুই চারি জনে ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে চির জীবনে একবারও দারগ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-চর্য্য পালন করত জীবন যাপন করিতেন; ধর্ম্মের নিকট তাঁহারা বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখাদি ও স্ত্রী পুত্র সংসার পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

অতএব বিধবা-বিবাহের কোন্ শাস্ত্রে বিধি, এবং কোথাও বা নিষেধ থাকিলেও হিন্দু সন্তানগণ সেই বিধি নিষেধের বড় একটা ধার না ধারিয়া সাধারণ ভাবে এরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন বোধ হয়, যে, বিধবাগণ যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই পতিহীনা হইয়া সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত

হইলেন, তখন আবার উহাদিগকে অনর্থক সংসারের পাপ হ্রদে ডুবাইয়া কাজ কি? বিশেষতঃ নানা শাস্ত্রে যখন এরূপ কথিত হইয়াছে যে, 'সাধ্বী বিধবা পুত্র ব্যতিরেকে ও স্বর্গে যাইতে পারেন,'' এবং যখন পরাশর মুনির মত লইয়াই কলিতে বিধবাবিবাহের আয়োজন, তাহাতেও বিধবাগণের বিবাহ করা অপেক্ষা সহগমন ও ব্রহ্মচর্য্যেরই অধিক প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্রাদি ছাড়িয়া দিয়া সাধারণভাবে চিন্তা করিলেও উপলব্ধি হয় যে, সংসার করা অপেক্ষা ধর্ম্মাচরণই শ্রেষ্ঠ এবং বিধবা হইয়া আবার অন্য পুরুষকে বিবাহ করিয়া সংসার করা অপেক্ষা মৃত স্বামীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরাধনায় সমস্ত জীবন যাপন করা কিম্বা স্বামী-শোক সহিতে না পারিয়া, স্বর্গকামনায় সহগমন করা প্রণয়ের চরমোৎকর্ষ বটে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এ জন্য হিন্দুসন্তানগণ বিবাহবিধি অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনের পক্ষপাতী হইলেন। কিন্তু আজকালের হিন্দুসন্তানগণের অনেকে যেরূপ জঘন্যাচরণাদি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের বালবিধবা কন্যা ভগিনী পুত্র-বধূ ইত্যাদিকে দেশাচারের ভয়বশতঃ বিবাহ না দিয়া গোপনে গোপনে অনেক স্থানে যেরূপ ব্যভি-চারের প্রশ্রয় দান করিয়া থাকেন, এবং আপনারা পুত্রাদি থাকিলে পত্নী বিয়োগ হইলে অনেক বয়সেও পুনঃ দারপরিগ্রহণ করিয়া থাকেন, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগকে ঘোর স্বার্থপর, মহাপাতকী এবং নিতান্তই দেশাচারের দাস বলিতে হয়।

যে পাষণ্ড পিতা অশীতি বর্ষ বয়সেও নিতান্ত-সাধ্য ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম হইয়া পত্নী বিয়োগে আবার বিবাহ করিয়া থাকে অথবা বিবাহ না করিলেও নানা প্রকার ব্যভিচার কার্য্য করিয়া থাকে, সে নরাধম কেমন করিয়া আপন বিধবা যুবতী কন্যার ব্রহ্মচর্য্য পালনে আশা করিতে পারে? সেই প্রকার ব্যক্তিই নিতান্ত দেশাচারের কৃতদাস এবং ঘোরতর পাপী—সেই প্রকার লোক দ্বারাই হিন্দুসমাজ অধঃপাতে গমন করিয়াছে।

পূর্ব্বকালে হিন্দুসন্তানগণ যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন তৎসময়ে যে, দেশে ব্যভিচারস্রোত বর্ত্তমানকালাপেক্ষা মন্দীভূত ছিল, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; তৎসাময়িক আর্য্যসন্তানগণ ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগী

হইয়া অতি কঠিন তপস্যাচরণ করিতে পারেন এবং ধর্ম্মের জন্য অম্লান বদনে ভোগসুখাদি পরিহার পূর্ব্বক অরণ্য-বাসী হইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; সেই প্রকার পবিত্রতাময় সমাজে বাস করিয়া বালবিধবাগণ যে স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

আবার শাস্ত্রে ও সামাজিক ব্যবহারাদিতে বিধবাদিগের আহার ব্যবহারাদির ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল যে সমস্ত নিয়ম নির্ব্বাচিত ছিল, তৎসমুদয় সর্ব্বতোভাবে পালন করিলে যে অনেক পরিমাণে ইন্দ্রিয়-সংযম হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু হায়! দুঃখের বিষয় কি বলিব, আজি কালি সহরবাসিনী ধনী লোকের বিধবা কন্যাদিকে আহার ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে সেই পবিত্র নিয়মের অনেক অন্যথাচরণ করিতে দেখা যায়! কলিকাতা-অঞ্চলের অনেক হিন্দু বিধবাকে গহনা ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে দেখিয়া অনেক সময় মনে ক্লেশ হয় ও চক্ষু যেন পীড়িত বোধ হয়।

সৎপরিবার মধ্যে বাস করিয়া সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এবং আত্মসুখাপেক্ষা না করিয়া সংসারস্থ সর্ব্বলোকে দয়াবতী হইতে পারিলে, বিবাহে প্রয়োজন থাকে না; মৃত স্বামীকে ভাল বাসিতে পারিলে প্রণয়স্পৃহাও চরিতার্থ হইতে পারে; পতি বিদেশে থাকিলে যেরূপ তাঁহার প্রতি মন অধিক আকৃষ্ট হয় এবং অধিক প্রণয় জন্মে, তদ্রূপ মৃত স্বামীরও প্রতি অধিক প্রণয় হইতে পারে—সংসারে বাস করিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা প্রকারে প্রণয়ে বাধা উপস্থিত হইতে পারে—অদৃষ্টক্রমে অনেকের পতি লম্পট, মদ্যপ ও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগশূন্য হইতে পারেন, তজ্জন্য স্ত্রীরও তাঁহার প্রতি প্রণয়ের অল্পতা ঘটিতে পারে, কিন্তু পরলোকগত স্বামীকে ভাল বাসিতে কোন বাধাই নাই; কেবল মাত্র নিজের মনটি উন্নত করিলেই এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে; স্বামীর স্বর্গীয় পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যানে ও জগৎ স্বামী ভগবানের আরাধনায় জীবন শেষ করা অপেক্ষা পুনঃ পুনঃ বিবাহ করা কি ভাল?

হিন্দু বাল-বিধবার সঙ্গে আমাদের নয়নমুগ্ধকর কুসুমের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ফুল যেমন আপনার মনে আপনি ফুটিয়া থাকে নিজের কোন প্রকার সুখের বাসনা না রাখিয়া চারিদিকে আপন মনোহর

সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে, এবং ধার্ম্মিকের হস্তগত হইলে তদ্দ্বারা দেবারাধনা সাধিত হয়, সেইরূপ পবিত্রা বাল-বিধবাগণও নিজে কিছু মাত্র ভোগ সুখের আশা না করিয়া পরিবারের উপকারে জীবন কাটাইয়া থাকেন, পরের ছেলেকে খাওয়ান, পরের সংসারের কাজ দিবারাত্র নির্ব্বাহ করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে মহৎ-হৃদয় অভিভাবকের নিকট সংশিক্ষা পাইলে সম্পূর্ণরূপে দেবারাধনায় অর্পিত হন।

ফুল যেমন লম্পটের হাতে পড়িলে বারবনিতার কুন্তলভূষণ হইয়া থাকে, হিন্দু বাল-বিধবাগণও মধ্যে মধ্যে সেই রূপ দুরাচারের প্রলোভনে পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত হয়।

আহা! কবে আবার আমাদের সমাজের এমন অবস্থা হইবে যে, নর নারী মিলিয়া সংসারকে কেবল মাত্র ধর্ম্মসাধনার একটি কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করিবেন; ব্যভিচার, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদি কবে হিন্দুসমাজ হইতে বিতাড়িত হইবে; কবে আবার পবিত্র হিন্দু বংশধরগণের মন এত দূর উন্নত হইবে যে, তাঁহারা পতি ও পত্নী বিয়োগে পুনর্ব্বিবাহ না করিয়া ও ব্যভিচার কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া, মৃত পতি পত্নীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরারাধনাতে জীবন শেষ করিবেন, এবং নিজেরা সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া পরহিতকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন। হায়! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ও স্বামী পুত্রাদি লইয়া সংসার করাই কি কেবল সুখের নিদান? এ সমস্ত ব্যতিরেকে পৃথিবীর নর নারীগণের হিত-সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলে এবং ধর্ম্মকার্য্যাদি করিলে কি মনে সুখ হয় না! স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, যে সেই অবস্থাই পরম সুখের মূল। যাঁহার স্বামী কি স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিবেন তিনি অবশ্যই তৎসমভিব্যাহারে সংসার ও ধর্ম্মসাধন করিবেন, কিন্তু যাঁহার ঈশ্বর-ইচ্ছাক্রমে পতি বা পত্নী বিয়োগ ঘটিবে, আমার মতে তাঁহার আর পতি কি পত্নী গ্রহণ করা উচিত নয়।

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই ব্যভিচার কার্য্য সমান দূষণীয়, তাহাতে ইহকাল পরকাল দুই দিকই বিনষ্ট হয়, যদিও আমাদের সামাজিক রীত্যনুসারে ব্যভিচারী পুরুষাপেক্ষা ব্যভিচারিণী রমণীর প্রতি অধিক ঘৃণা করা হয় বটে;

কিন্তু পরম ন্যায়বান্ মহর্ষিগণ হিন্দু শাস্ত্রাদিতে পাপের শাস্তি ভোগ উভয়তঃই তুল্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; আমার সামান্য বিবেচনায় প্রতীত হয় যে, আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের পক্ষে এ বিষয়ে অধিক শাসন থাকাতে স্ত্রীলোকের লাভ ভিন্ন কিছুই ক্ষতি হয় নাই। সাম্যবাদীগণ বলিতে পারেন যে, পুরুষ ব্যভিচার করিতে পারে, স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিতে পারিবে না কেন? কিন্তু এস্থলে বলা যায় যে, অনেক লোক ত বিষ খাইয়া মরে, তবে তোমরাও মর না কেন? পুরুষ পাপ করিতেছে বলিয়া স্ত্রীলোকেরও পাপ না করিলে বড় সর্ব্বনাশ হইল না কি? বরং এজন্য স্ত্রীলোকগণের প্রতি আঁটা আঁটি থাকিয়া ভালই হইয়াছে, সন্দেহ নাই; সংসারে যে জিনিষ যত উৎকৃষ্ট, তাহার মন্দাবস্থাও ততই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে; এ স্থলে আমি বলিতেছি না যে, পুরুষ ব্যভিচারী হইলেও কোন দোষ নাই কিম্বা তিনি পত্নীবিয়োগে আবার বিবাহও করিতে পারিবেন, স্ত্রীলোকই কেবল সেই সুখে (দুঃখে) বঞ্চিতা থাকিবেন; আমি কখনও এরূপ মনে করিতে পারি না। পুরুষের পক্ষেও স্ত্রীবিয়োগে আবার বিবাহ করা উচিত নয়। ব্যভিচারের কথা আর কি বলিব? সেত জলন্ত নরক; ইচ্ছা করিয়া কি জীবিত প্রাণী নরকে ডুবিতে চায়?

তবে যদি পুরুষগণ সুমহৎ নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া থাকেন, তাই বলিয়া কি রমণীগণও সঙ্গে সঙ্গে ডুবিবেন? স্বভাবতঃ রমণীজাতির মনত কোমলও বটে; সেই কোমল হৃদয়েও কি সুকোমল পবিত্র বিশুদ্ধ প্রণয়ের স্থান হইবে না? হায়! প্রণয় কি সংসারে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির নিকটেই পণ্য দ্রব্য হইবে! হিন্দু বিধবাগণ! আপনারা কুসঙ্গ ও কদাচার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগামী পতি ও ভগবানের আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করুন, দেখিবেন সংসার আপনাদিগের নিকট মস্তক অবনত করিবে।

ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সুখের মূল, যদি বল সংসার না করিলে—স্ত্রী পুত্রাদি না হইলে ধর্ম্মসাধন হয় না; কিন্তু কেন হইবে না, আমিত বুঝিতে পারি না। নিজের সংসার না থাকিলেও ত পৃথিবীতে অনেক শিশু আছে; তাহাদের সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে কি সুখ হইতে পারে না? এ স্থলে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তবেত বিবাহ না করিলেও চলিতে

পারে; কিন্তু সে বড় ভ্রান্ত মত, কেননা তদ্রূপ আচরণ সকলে করিলে সৃষ্টি হইতে পারে না; এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রণয়ের অনুশীলন হইতে পারে না। তবে যদি দুই চারি জন ধর্ম্মাত্মা পুরুষ কি ধার্ম্মিকা রমণী লোক হিতার্থে কার্য্য করিবার বিশেষ কোন বিঘ্ন আশঙ্কাতে বিবাহ না করেন, তাহাতে সৃষ্টি রক্ষার অধিক কিছু আসিয়া যায় না; স্বেচ্ছাচারী কিম্বা স্বেচ্ছাচারিণী হইবার লোভে যাঁহারা বিবাহ না করেন, তাঁহারা নিতান্ত পাপিষ্ঠ সন্দেহ নাই; কিন্তু সংসারের হিতের জন্য যদি কোন মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি নিজের সুখেচ্ছা পরিহার করেন, তবে তাঁহাকে দেবতার শ্রেণীতে গণনা করিতে হয়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, অতি বালিকাবস্থায় বিবাহ হইয়া অমনি বিধবা হইলে স্বামীর প্রতি প্রণয় জন্মিতে পারে না। অতএব সেই প্রকার বিধবাগণের সচ্ছন্দেই আবার বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে প্রণয়ের অবমাননা করা হয় না। এ কথা বড় সঙ্গত মনে হয় না? কেন না হিন্দু বালিকাগণ যদি পঞ্চম বর্ষের পরই বিবাহিতা হন, এবং নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই চারি বৎসরের মধ্যেই বিধবা হন, তবেই কি যথাশাস্ত্র যাঁহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া যাইতে পারেন?—তাঁহাদের সুবিমল ও সুকোমল মন হইতে কি পতির মূর্ত্তি অপনীত হইতে পারে? আর যথা শাস্ত্র যে বালিকার পাণি গ্রহণ করিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহ মাত্র সেই বালিকার মৃত্যু হইলেই কি পবিত্র-হৃদয় যুবকের অন্তঃকরণ হইতে সেই মোহিনী বালিকা-মূর্ত্তি তিরোহিত হইতে পারে? যদি মানুষ পশু না হইয়া যথার্থ মানুষই থাকে, তবে বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়। বিবাহ কতদূর গুরুতর বিষয়, তাহা সকলেই ভাবিলে বুঝিতে পারেন, বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কি মৃত্যুতেই পতি ও পত্নীর স্মৃতি লোপ হইতে পারে? আর হিন্দু সমাজে যেরূপ রমণীগণের প্রতি নিয়ম আছে, যে স্বামীর মৃত্যু হইলে আর বিবাহ হইতে পারে না, তেমন পুরুষগণও স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আর বিবাহ করিতে পারিবেন না, যদি এরূপ রীতি হয়, তবে স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে বড় আশ্চর্য্য একটী মহৎ ভাবের সমাবেশ হইবে। কেন না জীবনে মরণে যাহাকে ভিন্ন আর অন্য পতি কি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবার সাধ্য নাই এবং যাহাকে ভিন্ন আর

অন্যকে হৃদয়েও ভাবা উচিত নয়, সেই ব্যক্তি যে কতদূর ভালবাসার পাত্র হইতে পারে, তাহা সকলেই একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারেন। আমাদের সমাজ যদি পূর্ব্বকালের পবিত্র নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া নূতন ন্যায়সঙ্গতঃ নিয়ম আদরের সহিত সমাজে প্রচলন করেন, তবে দেখিবেন দাম্পত্য প্রণয় আরও শত গুণে বৃদ্ধি হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে হিন্দুবিধবাগণের বিবাহ হইতে পারে না; কাজেই মনের ইচ্ছা থাকিলেও বিধবাগণ আর বিবাহ করিতে পারেন না। এতদ্দ্বারা তাঁহাদের মহত্ত্ব কিছুই প্রকাশ পায় না, বিবাহের নিয়ম থাকিলে যে রমণী প্রলোভন দূর করিয়া মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন কাটাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ স্বামীর প্রতি প্রণয়বতী। পুরুষগণ যদি সাধ্যসত্বে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ না করেন, তবে তাঁহাদিগের মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

একথায়ও আমি সম্মতিপ্রদান করিতে পারি না যে, বিবাহ না করিতে পারিলেও ত অনেক বিধবা ব্যভিচারিণী হইতে পারে। যাঁহারা তদ্বিষয়ে বিরতা তাঁহাদিগকেই প্রশংসা করিতে হয়; প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়াও যিনি কোন প্রকারে প্রলোভিতা হয়েন না, তিনিই যথার্থ মহৎ-হৃদয়া, স্বীকার করিলাম। কিন্তু সেতো শিক্ষা-সাপেক্ষ। দশমবর্ষীয়া বালিকার নিকট প্রলোভনের দ্বার খুলিয়া দিয়া কোন্ মূর্খ তাঁহার মহত্ত্ব পরীক্ষা করিতে যায়। হায়! তেমন তেমন জ্ঞানী ব্যক্তিগণও প্রলোভন হইতে দূরে বাস করিতে বাসনা করেন। এরূপ হইলে আর অসৎ সংসর্গের ও সদ্দৃষ্টান্তের আবশ্যক কি? শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে অবশ্যই প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, যে "তোমাদের নেত্র যদি তোমাদিগকে কুপথে লয়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া ফেল, কেন না তোমার চিরকাল অনন্ত নরক ভোগাপেক্ষা বরং চক্ষু নষ্ট হওয়া ভাল।"

মনুষ্যের মনের গতি বারিস্রোতের ন্যায়; একদিকের গতি রোধ কর, জল যেরূপ অন্যদিকে ছুটিবে, মনের বাসনা ও মনুষ্য জীবনের কার্য্য-স্রোতও তেমন অন্য দিকে ছুটিয়া চলিবে। অতএব বিবাহের নিয়ম সমাজে প্রচলন

করিয়া দিলে হিন্দুবিধবাগণ অনেকেই বিবাহিতা হইবেন। পুরুষদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই ত একথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পুরুষের বিবাহের নিয়ম আছে, কয়জন যুবক—যুবক কেন, কয়জন বৃদ্ধ—স্ত্রীবিয়োগ হইলে, বুটিয়া উঠিলে, আবার বিবাহ না করিয়া থাকেন? সেরূপ রমণীগণও পুত্র কন্যা থাকিলেও বিবাহ করিতে থাকিবে। তবেই পবিত্র হিন্দুসমাজ শীঘ্রই যবন-সমাজের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পথে বাঁধ থাকাতে দুচারি জন হিন্দুবিধবার জীবন যেমন পাপকার্য্যে নষ্ট হয়, তেমন আবার সহস্র জনের মন ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে সমাজে বিবাহের নিয়ম থাকিলেও রমণীগণ বিবাহ না করিয়া মৃত স্বামীর আরাধনায় জীবন কাটান, সে তাঁহাদের নিজের মহত্ত্ব, তাঁহাদের সমাজের মহত্ত্ব কি? আমাদের হিন্দু-সমাজ মহৎ বলিয়াই পরাশর-বিধিতে বিবাহ নিয়ম থাকিলেও তাহা প্রচলিত করিলেন না; এমন দুর্ব্বুদ্ধি কে যে সুনিয়ম সমাজ হইতে দূর করিয়া সেই স্থানে কুনিয়ম প্রচলিত করত বিধবাগণের মহত্ত্ব পরীক্ষা করিবে? আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে ত বিধবাবিবাহের বিধি আছেই এবং ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনেরও ত বিধি আছে, হিন্দু সন্তানগণ নিতান্ত বিশুদ্ধ হৃদয় হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

বিধবা-বিবাহ-প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইলে, ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের পরিমাণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সতীত্ব-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাঁহারা ধর্ম্মচারিণী হইয়া চিরকাল পরোপকারসাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক নর নারীর যত্নবান্ হওয়া উচিত; যিনি একটি বিধবার জীবন ও সৎপথে রাখিতে পারিবেন, তিনি হিন্দু সমাজের শত শত ধন্যবাদের পাত্র।

হিন্দুবিধবা-রমণীগণ! আপনাদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন, এই যে, আপনারা বাল্য, যৌবন, কি বৃদ্ধ, যে কালেই বিধবা হউন না কেন, পরম যত্নে ধর্ম্মসাধন রূপ মহাব্রতে ব্রতী হউন; যথা শাস্ত্র যে ব্যক্তির সহিত আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি পাপী থাকুন, আপনাদের প্রতি করুণা-শূন্য থাকুন, যাহাই হউন না কেন, তাঁহার প্রতি

অনুরাগিণী হইয়া সেই মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন যাপন করুন ; মৃত পতিকে বিস্মৃত হইয়া কি অন্য পুরুষে প্রণয়-স্থাপন করিয়া অধিক সুখী হইতে পারিবেন ? কখনই না।

আপনাদের ভাল বসন ভূষণ, উত্তম আহারাদি ও সন্তান সন্ততি হইবে বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য জীবনের সার সুখ ?

পত্নীবিয়োগে পুরুষগণ যেরূপ আবার বিবাহ করিয়া অনেক বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সুবিধা পান, সেরূপ আপনারাও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে আপনাদের কি মহত্ত্ব হইল ? বিবাহ না করিয়াও যখন ধর্ম্ম কার্য্যাদি আপনাদিগের আয়ত্ত রহিল, তখন পুরুষের দাসীত্ব গ্রহণে কি ফল বুঝিতে পারি না।

মৃত পতির ধ্যানে জীবন যাপন করিলে, ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

আহা ! যাহার সহিত একত্র চিরকাল ধর্ম্ম সাধন ও সাংসারিক সুখ ভোগাদি করিবেন বলিয়া, আপনারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন অকালে আপনাদের সেই জীবন সর্ব্বস্ব পতি সকল সাংসারিক সুখ ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আপনারা কোন্ প্রাণে পুনঃ স্বামী গ্রহণ করিয়া অসার সংসার সুখে মত্ত হইবেন ? কোন্ প্রাণেই বা সেই মৃত স্বামীর প্রেম-মুখ বিস্মৃত হইয়া অন্য পতির প্রতি অনুরাগিণী হইবেন ?

সেই মৃত স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া ধর্ম্ম সাধনায় রত হউন, ইহকাল ও পরকালে আপনাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

মৃত পতির পাদ-পদ্ম-ধ্যান-মগ্না ব্রহ্মচারিণী বিধবার মূর্ত্তি কি রমণীয় ! তিনি কি শ্রদ্ধার পাত্রী ! তাঁহাকে দর্শন করিলেও জীবন পবিত্র হয় ; ধর্ম্মারাধনাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ; পশু পক্ষী আদি অন্যান্য প্রাণীও ত ইন্দ্রিয় সুখের অধিকারী ; মানব জীবনের ধর্ম্মারাধনাতেই সম্পূর্ণরূপে সফল হয়। আপনারা অন্যান্য সমস্ত সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মারাধনায় রত হউন। আপনারা লোকের কথায় উতলা না হইয়া, আপনাদের জীবনের যথার্থ সুখের

পথ খুলিয়া লইয়া নিজেরাও সুখী হউন। সমস্ত হিন্দুসমাজকেও পবিত্র করুন। আবার ভারত-রমণীর সতীত্বের মহিমাতে পৃথিবী মোহিত হউক, এই আমাদের এক মাত্র কামনা।

ইতি।